সাহিত্য পত্রিকা

শারদীয়

১৩৯৭

ফুলিয়াতে নির্ভাবনায় যে কোন ডিজাইনের
টাঙ্গাইল শাড়ী কেনার সবচেয়ে
বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

শ্রীবাদল চন্দ্র বসাক

২ নং নতুন ফুলিয়া (বি° ডি° ও অফিসের
পেছনে) ফুলিয়া, নদীয়া।

ফুলিয়া রেল স্টেশন থেকে হাঁটা পথে ৪/৫ মিনিট।
সরাসরি যোগাযোগ করুন।
শোরুম প্রতিদিনই খোলা থাকে।

P 36208

বর্ষ ১০ শারদীয় ১৩৯৭/১৯৯০

সূচিপত্র

কবিতা

হরপ্রসাদ মিত্র/মৃদুল দাশগুপ্ত/সুজিৎ কুমার রায়/গৌরাঙ্গ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়/কবিসুন্দর অমিয় পাল/উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়/মনোহর বসাক/অরূপ চক্রবর্তী/ঈশান চন্দ্র মিশ্র/মুক্তি মুখোপাধ্যায় ৩৪—৪২

প্রবন্ধ

গ্রাম ও জগত : পান্নালাল দাশগুপ্ত ৯

অরোভিল : ত্রিদিব ঘোষ ১৩

নদীয়া জেলার প্রাচীন দুর্গোৎসব : মাধব ভট্টাচার্য ৪৯

গল্প

স্বপ্নের ঘরবাড়ি : শিশির গুহ ৪৩

সীমান্ত : নারায়ণ বসু ৫২

ছোটদের গল্প

মুনিয়ার ডাকাত ধরা : কাকলি ভট্টাচার্য ২১

রূপকথার বাঘ : গৌর বৈরাগী ২৭

নতুন বই

(পুস্তক সমালোচনা) : কান্ত প্রসাদ সিন্‌হা ২৯

সম্পাদকীয় : আমাদের পুজো ৮

প্রচ্ছদ : কাকলি ভট্টাচার্য

Phone : 41-0216
Fulia-32

DHIREN KUMAR BASAK

Our Special Products :
Tangail Chiffon, Daccai Buti & Jamdani.
Retailer & Whole Seller,
Production Centre :
Chatkatalla, Fulia Boyra, Dist. Nadia.
CALCUTTA SHOW ROOM :
64, Southend Park, (1st floor)
Calcutta-700029
(Monday Full Closed)

মণীন্দ্র চন্দ্র দাস

চটকাতলা, পো: ফুলিয়া বয়রা, জিলা-নদীয়া।
পিন-৭৪১৪০২

টাঙ্গাইল সিল্ক, তসর, বুটি' জামদানী, নক্সা পাড় জ্যাকেট, সুতি বার হাত মাঠা শাড়ীর পাইকারী ও খুচরো বিক্রেতা। নিজেদের তাঁতে প্রস্তুত টাঙ্গাইল ধুতিও পাওয়া যায়। কমপক্ষে একশত টাকা থেকে উর্দ্ধে আড়াই হাজার টাকা দামের শাড়ী সর্বদা মজুত থাকে।

● ফুলিয়া বাস স্ট্যাণ্ড থেকে ৫ মিনিটের পথ।

সংক্রামক রোগ প্রতিষেধক

টিকার সময়সূচী

টিকা কাদের জন্য/বয়স	টিকা	সেব্য মাত্রা (ডোজ)	টিকা কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে।
নবজাত ৬ সপ্তাহ থেকে ৯ মাস	ডি পি টি	৩	ইঞ্জেকশন
৬ সপ্তাহ থেকে ৯ মাস	পোলিও	৩	খাওয়াতে হবে
৬ সপ্তাহ থেকে ৯ মাস	বি সি জি	১★	ইঞ্জেকশন
৯ মাস থেকে ১২ মাস	হাম	১	ইঞ্জেকশন
শিশু ১৬ থেকে ২৪ মাস	ডি পি টি	১★★	ইঞ্জেকশন
১৬ থেকে ২৪ মাস	পোলিও	১★★	খাওয়াতে হবে
৫ থেকে ৬ বছর	ডি টি	১£	ইঞ্জেকশন
১০ বছর	টি টি	১£	ইঞ্জেকশন
১৬ বছর	টি টি	১£	ইঞ্জেকশন
গর্ভবতী মহিলা ১৬ থেকে ৩৬ সপ্তাহ (গর্ভাবস্থা)	টি টি	১£	ইঞ্জেকশন

★ যারা হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকেন্দ্র ভিন্নভাবে তাদের জন্মের সময়ই বি সি জি টিকা দেওয়া উচিত। ★★বুষ্টার মাত্রা।
£ আগে থেকে টিকা না দেওয়া থাকলে ২ মাত্রা।

বিঃ দ্রঃ—দুটি মাত্রা (ডোজ) প্রয়োগের মধ্যে কমপক্ষে একমাস সময়ের ব্যবধান রাখতেই হবে। অল্প কাশি, ঠাণ্ডা লাগা বা সামান্য জ্বরে টিকা দিতে কোনো বাধা নেই।

বিজ্ঞাপন সংখ্যা ১০৫/৯০-৯১ মাস মিডিয়া, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পঃ বঃ সরকার।

পত্রিকার গ্রাহক চাঁদার হার

পত্রিকার নাম	প্রতিসংখ্যার দাম (সাধারণ সংখ্যা)	গ্রাহক চাঁদার হার বার্ষিক	যাণ্মাসিক
ওয়েষ্টবেঙ্গল	৫০ পয়সা	১২ টাকা	৬ টাকা
পশ্চিমবঙ্গ	৫০ পয়সা	২৪ টাকা	১২ টাকা
প্রানিসম্পদ	৩ টাকা	১৪ টাকা	৭ টাকা
পঞ্চায়েতীরাজ	২৫ পয়সা	৩ টাকা	
● লোকশ্রুতি	টাকা	১০ টাকা	
● (লোকশ্রুতি বিষয়ক বাংলা যাণ্মাষিক)			

গ্রাহক নিজের নাম, সম্পূর্ণ ঠিকানা ও পত্রিকার নাম পরিষ্কার ভাবে লিখে তথ্য অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর অনুকূলে মানি অর্ডার অথবা ভারতীয় পোষ্টাল অর্ডারে গ্রাহক চাঁদা পাঠাতে পারেন। বছরের যে কোন সময়ে গ্রাহক চাঁদা পাঠানো যায়। মানি অর্ডারে চাঁদা পাঠানোর ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ৬/৭ সপ্তাহ পরে পত্রিকা পাঠানো শুরু হয়। যেকোন যোগাযোগের জন্য গ্রাহক নাম্বার উল্লেখ করতে হবে।

বিশদ বিবরণের জন্য নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

বিজনেস ম্যানেজার, বিতরণ শাখা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৩, আর. এন মুখার্জী রোড, (পাঁচতলা) কলিকাতা-৭০০০০১

ক্রমিক সংখ্যা ১৪ তথ্য (নদীয়া) ১৯৯০-৯১ তাং ৬-৯-৯০

আপনার যে কোন প্রকার স্টেশনারী
দ্রব্যের জন্যে আসুন

রাজা ষ্টোর

ফুলিয়া রেল বাজার, পোঃ বেলেমাঠ,
জিলা নদীয়া। ৭৪১৪০২

প্রোঃ নিরঞ্জন পাল

আমরা অফিস আদালতে স্টেশনারী সামগ্রী অর্ডার
অনুযায়ী সরবরাহ করে থাকি। সমস্ত রকম তাঁতের
সামগ্রী আমাদের এখানে পাওয়া যায়।

সাহিত্য সৈকত। পূজো, ১৯৯০

পুজোয় চাই
এ. টি. জুয়েলার্সের
গয়না

অলংকার শিল্পে ফুলিয়ার
একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

কম সোনায় আধুনিক ডিজাইনের মজবুত গয়না পেতে হলে আসুন আপনাদের সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান **এ টি. জুয়েলার্সে**।

এ. টি. জুয়েলার্সের জড়োয়া এবং রুপোর অলংকার ও শিল্প নৈপুণ্যে আভিজাত্যের চিহ্নবহ।

সকলকে পুজোর নিমন্ত্রণ।

এ. টি. জুয়েলার্স

প্রো: শৈলেন্দ্র কুমার কর্মকার

ফুলিয়া রেলবাজার, বেলেমাঠ, নদীয়া।
(মাছ বাজারের সন্নিকট)
বি. দ্রঃ প্রতি বুধবার সম্পূর্ণ দিন বন্ধ।

সম্পাদকীয়

আমাদের পুজো

পুজো এখন উৎসব। শুধুমাত্র বাঙালীর উৎসবই নয়, এ যেন ভারতবাসীরই জাতীয় উৎসব।

দুর্গাপুজো এখন আর শুধুমাত্র ধর্মীয় পুজোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। রামচন্দ্র দেবতাদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে কেন অকালবোধন করেছিলেন বা সূর্যের উত্তরায়ন বা দক্ষিণায়ন এসব নিয়ে আজকের মানুষের মাথা ব্যথা নেই সুরথ রাজার রাজধানী যে একদিন বোলপুরেই ছিল আর তিনিই যে প্রথম দুর্গাপুজোর সূচনা করেছিলেন কিম্বা তাহিরপুরের রাজা কংস নারায়ণ যিনি প্রথম দেবী দুর্গার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ নিয়ে পুজোর সূত্রপাত ঘটালেন এসব নিয়েও বড় একটা কৌতূহল নেই।

ফি'বছর দুর্গার আগমন ঘটে মন্দিরে মন্দিরে। দেবী কিসে এলেন কিসে গেলেন তা' নিয়ে ভাববার অবকাশ নেই। দেবী আসেন উৎসব মঞ্চ আলোকিত করে। দেবীর আসার প্রস্তুতি এখন বহু পরিকল্পিত। নিরন্তর বয়ে যাওয়া সময়ের স্রোতে স্বাভাবিক ভাবেই বিবর্তন ঘটে গেছে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান এমন কি মানুষের সংস্কৃতিরও। আজকের দিনে তাই পুজো ঢাকা পড়ে গেছে উৎসবের উচ্ছলতার মধ্যে।

গ্রাম ও জগত

পান্নালাল দাশগুপ্ত

অনেক লোকই বলেন যে আমি যে কেবল গ্রাম গ্রাম বলি, গ্রাম স্বরাজের কথা বলি, সেই গ্রামটা আছে কোথায়? কেননা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায় আজকাল গ্রামের লোকদেরও গ্রামভাবনা নেই। গ্রামের লোকেরাও শহরমুখী এবং শহর সভ্যতার ভাবনা নিতে সবাই উদ্‌গ্রীব। যে পারে সেই গ্রাম থেকে পালাবার চেষ্টা করে। গ্রাম থেকে পালাবার জন্যই এখন গ্রামে গ্রামে এতো নানা-ধরণের স্কুল, এমন কি কলেজও স্থাপিত হয়েছে ও হচ্ছে। গ্রাম থেকে পালাবার জন্য সর্বত্র পাকারাস্তা বেড়েছে। বাসরুট হয়েছে। বস্তুতঃ গ্রামের মানুষ তাদের ভাবনা-চিন্তায়, চালচলনে আর গ্রামীণ জীবনে সন্তুষ্ট নয়। গ্রাম থেকে এখন গ্রামের মানুষ মনের দিক থেকে একেবারে উৎপাটিত হয়ে গেছে। 'ফিরে চল, মাটির টানে, গ্রামের পানে'—এই জাতীয় সঙ্গীতের আজ আর কোন তাৎপর্য নেই। অর্থাৎ, স্বনির্ভর গ্রাম কথাটা আজ প্রায় স্ববিরোধী হয়ে উঠেছে।

এই প্রশ্নটির যথার্থ উত্তর দিতে হবে। নইলে গ্রাম-গ্রাম ভাবনা করা বৃথা, আমরা জানি যে আজ গান্ধীজীর গ্রাম স্বরাজের কথার কোন মূল্যই থাকে না। এইভাবে যদি আমরা দেখি, তাহলে ছোট শহর, এমন কি বড় শহরের মানুষেরাও তাদের নাগরিক জীবনে আজ আর সন্তুষ্ট নয়। আমরা স্বনির্ভর গ্রামের কথা ভাবতে পারি, কিন্তু স্বনির্ভর শহরের কথা একেবারেই ভাবা যায় না। স্বনির্ভর কলকাতার

কথা কি কেউ ভাবতে পারি ? কাজেই মূল থেকে উৎপাটনের প্রশ্নটা কেবল গ্রাম সম্পর্কেই প্রযোজ্য, তা নয়। এটা আজকে শহর সম্পর্কেও প্রযোজ্য, এমন কি দেশ সম্বন্ধেও বলতে পারি। আজকে আমাদের দেশে প্রকৃতপক্ষে দেশ-চেতনা বা স্বদেশচেতনাই বা কজনের মধ্যে আছে ? আমাদের খাওয়াপরা, জামাকাপড়, চালচলনের ক্ষেত্রে আজ আমরা সত্যই কতটা ভারতীয় ? আজকে শিল্পবাণিজ্যে আন্তর্জাতিকতা এসেছে, যাকে আমরা বলি, Globilisation of Economy—স্বদেশীচেতনা আজ আর নেই। আমরা যে আবার সত্যিই আন্তর্জাতিক হয়ে গেছি, একথাও কিন্তু বলা যায় না। আমরা আমাদের রাজনীতিতে, সমাজ-চেতনায়, কোনও ক্ষেত্রে, সত্যিই আজ কতটুকু ভারতীয় আছি ? ভারতবর্ষ আছে কোথায় ? যদি কেউ প্রশ্ন করেন, গ্রামটা আছে কোথায় ? আমি পাল্টা প্রশ্ন করবো, ভারতবর্ষ আছে কোথায় ?

যখন রবীন্দ্রনাথ বা গান্ধীজী—গ্রামের কথা বলেন, তখন গ্রামগুলোকে গ্রামের ভৌগোলিক চৌহদ্দি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেননি তাঁরা। গ্রামই হোক আর শহরই হোক এসবের একটা ভৌগোলিক দিক আছে, আরেকটা আছে ভাবগত দিক। ভাবগত দিকে 'ভারতবর্ষ' বলে একটা সত্তা আছে। ভারতীয়তা বলে একটা আদর্শ আছে, ভারতীয় সভ্যতার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। বিশ্বসভাতে ভারতের একটা কিছু বক্তব্য বা বাণী আছে, যাকে স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো ধর্ম-মহাসভাতে উদাত্ত কণ্ঠে বলে এসেছিলেন। পৃথিবীর লোকেরা সেই ধর্মমহাসভাতে তাঁর বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন। ভারতবর্ষ আজকে কয়েক টুকরোতে বিভক্ত হয়ে গেছে। আমরা ভারত-

বাংলাদেশ-পাকিস্তানে বিভক্ত হয়ে গেছি। কিন্তু ভারতবর্ষ আজ কোথায়? আমরা ভারতের লোকেরা মাঝেমধ্যে ভারতবর্ষের কথাটা বলে থাকি, যদিও ভৌগোলিক ভারতবর্ষ নেই। কিন্তু চিন্ময়-ভারতবর্ষ আছে। সতীর মৃতদেহ—খণ্ড খণ্ড করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত হয়েছিল বলে পুরাণে কথিত আছে। সেই কাহিনীতে আছে—সতীর দেহের কোন্ খণ্ড কোথায় কোথায় পড়েছিল। সেই খণ্ডগুলি যেখানে পড়েছে সেই স্থান সতীর তীর্থ হিসেবে বর্তমান আছে। তেমনি ভারতবর্ষ—আরও খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে গেলেও ভারতীয় আদর্শের খণ্ডগুলি এই মহাভারতের নানা স্থানে খুঁজে পাওয়া যাবে। কেননা, সেই ভারতবর্ষের যে ভাবনা ও ধারণা সেটা ভূগোল দিয়ে তৈরী নয়, সেটা মৃন্ময়ী নয়, সেটা চিন্ময়ী। যা কিছু বস্তুতান্ত্রিক যা কিছু মাটির তৈরী, পাথরের তৈরী, তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু যা মানুষের চিত্তের যে চিন্ময়ী সত্তা, তা চূর্ণবিচূর্ণ বা উধাও হয়ে যেতে পারে না। একদা ভারতের তপোবন থেকে মুনিঋষিরা তাঁদের তপস্যালব্ধ সত্যকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের, সর্বকালের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে ডাক দিয়ে বলতেন, 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা'—সেই বিশ্ব ভৌগোলিক ভারতবর্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সেদিন কোনও রাজনৈতিক ভূগোল ভারতবর্ষের মধ্যে ছিলনা। কোন একটি বিশেষ স্থানের লোকেদের উদ্দেশ্য করে তাঁরা এসব বাণী উচ্চারণ করেন নি। এমন কি কোনও বিশেষকালের মানুষকেও নয়। সর্বদেশের, সর্বকালের মানুষকে ডেকে তাঁরা চিরসত্যকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছিলেন। এই যে সর্বদেশের, সর্বকালের মানুষ—তার কেন্দ্রবিন্দুটাই হচ্ছে মানুষ। অর্থাৎ মানুষ কেমন হবে, মানুষের স্থিতি বিশ্বচরাচরের কোথায় হবে, মানুষের ভূমিকা বিশ্বে কি? মনুষ্যত্ব কি? এটাই ছিল তাঁদের সাধনার লক্ষ্য-

বস্তু। ভূগোল তৈরী করা রাজনীতিক ভূগোল তৈরী করা তাঁদের বিচার্য বিষয় ছিল না।

এখন আমি আবার সেই প্রথম প্রশ্নটিতে ফিরে যাই। গ্রাম কোথায়? শহর কোথায়? দেশ কোথায়? গ্রাম বলি, শহর বলি আর দেশই বলি কিংবা পৃথিবীই বলি —এগুলি কোনও আসল বস্তু নয়। আসল বস্তুটা হচ্ছে মানুষ। এই মানুষকে সর্বাঙ্গসুন্দর, মহান ও সম্পূর্ণ করবার উপায় হিসেবে স্থান ও কালের কিছু প্যারামিটার আছে। সেগুলি উপায় মাত্র। উপায়গুলি দেশ ও কাল ও যুগধর্ম অনুযায়ী বদলায়। কিন্তু লক্ষ্যটা একই থাকে। সেটি হচ্ছে মানুষ তৈরী করা। মনুষ্যত্ব সৃষ্টি করা। যে মনুষ্যত্বের উপাদান দেবত্বের চেয়েও মহান। দেবতাদের অপরাধ ক্ষমা করা যায়। মানুষের মনুষ্যত্ব থেকে বিচ্যুতি ক্ষমা করা যায় না। দেবতারা মানুষ বানাননি। মানুষ দেবতাকে তৈরী করেছে। নানাধরনের দেবদেবী মানুষই সৃষ্টি করেছে। মানুষই আসলে চিরকালের এক **God making element**। আদর্শহীন মানুষ, মানুষই নয়। তারা পশুমাত্র।

এই মানুষ গড়া কাজটা সহজ নয়। মানুষ হওয়াও সহজ নয়। তারজন্য যেমন প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা চাই, তেমনিই আশপাশের মানুষের সহযোগিতা ও সাহায্য আবশ্যক। এই সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য দরকার হয় মানুষের সমাজের। এবং এই সমাজটাকে হতে হবে মানবিক। প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা-সহানুভূতি-দায়িত্ববোধ ইত্যাদি হয় সমাজের প্রয়োজনে। ফলে, মানুষকে যেমন আত্মসচেতন হতে হবে তেমনি তাকে সমাজসচেতনও হতে হবে। কিন্তু শহরে কোনো সমাজ নেই। বড় বড় শহরে পাশের ফ্ল্যাটের লোকদেরও নাম-ধাম জানে না। শহরগুলি

 (এরপর ৩১ পৃষ্ঠায় ১২

অরোভিল

ত্রিদিব ঘোষ

ইংরাজী 'Utopia' শব্দটির যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ কি হতে পারে? 'সব পেয়েছির দেশ', 'স্বপ্নপুরী', 'অলকাপুরী' কিংবা আমাদের দেশের ঐতিহ্য অনুসরণ করে বলতে পারি 'নব বৃন্দাবন', প্রকট বৃন্দাবনের পশ্চাতে যে অপ্রকট নিত্য বৃন্দাবন রয়েছে যেখানে ভক্ত-ভগবানের নিত্য লীলা চলছে অপূর্ব পরিবেশে পৃথিবীতে তারই প্রতিচ্ছবি। মর্তে-প্রাণ বিবর্তনের ধারা বেয়ে মানুষের আবির্ভাব, তার সকল মহিমা সকল আনন্দ এবং একই সাথে সকল দুঃখ বেদনার কারণ এই যে সে মনোময়। একটা পূর্ণতার বোধ, স্বপ্ন অনাদন্ত কাল ধরে তার উপলব্ধি, অনুভূতিতে আছে অথচ তার মহাবেদনা এই যে সে জানে সে অপূর্ণ, তার পার্থিব জীবন নানা ত্রুটিতে ভরা এবং মর্তলোকে নয় একমাত্র কোন অপার্থিব উর্দ্ধলোকে উত্তরণই তার মুক্তি ও পূর্ণতা আনবে। মর্ত জীবনে মর্ত মানুষ সীমাবদ্ধ। তার পক্ষে বৃথা প্রচেষ্টা সেখানে আদর্শ জীবন, জগৎ বানানো। ঐটি কিছু পণ্ডিতের মতে ক্লাশিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং একমাত্র রোমান্টিকতা মর্ত জীবনে পূর্ণতার অভাবের জন্য হাহুতাশ কারণ। তথাপি ইউটোপিয়া নিয়ে লেখা হয়েছে। স্বয়ং প্লেটো 'Republic' পুস্তকে তাঁর ধ্যান ধারণা অনুযায়ী এক আদর্শ সমাজের চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন। শব্দটির জনক টমাস মুর (শব্দটির শব্দ এমন দেশ যেটি কুত্রাপি নেই)। পরবর্তীকালে আরও অনেককে (রেনেসা ইতালীতেও লেখা হয়েছিল এবং উনিশ শতকে উইলিয়াম মরিস ইত্যাদিকে দেখতে পাই। এই স্বপ্ন মগ্ন

হয়ে ভাবী আদর্শ সমাজের কল্পনা করতে দেখি। আবার আনতুল হাক্সলির মত লেখক লেখেন 'Brave New World'—ভাবী সম্পূর্ণ বিজ্ঞাননির্ভর সেই সমাজের চিত্র যা স্বপ্ন নগরী নয় মহা দুঃস্বপ্ন নগরী।

ভারতবর্ষে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির সাধনা অন্তর্মুখী। চেতনার অবতরণ জগতের উদ্ভব এবং উত্তরণ। মানসোত্তর চেতনায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে দিব্যমানবে পরিণতি ও দিব্য জীবন যাপন শ্রীঅরবিন্দের 'Life Divine' গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ প্রাণ বিবর্তন ছাড়াও তাঁর 'Human Cycle', Ideal of Human Unity' গ্রন্থদ্বয়ে মানুষের ঐতিহাসিক তার সমাজের ঐতিহাসিক বিবর্তনের ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন কেমন ভাবে মানুষ প্রাথমিক গণ্ডীবদ্ধতা অতিক্রম করে, নানা বাধা বিঘ্নের মধ্য দিয়ে এক সর্বমানবিক ঐক্যের, সর্বমানবতাবোধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ভারতবর্ষকে তিনি এজন্যই স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন যে ভারতবর্ষ তার অধ্যাত্ম সাধনা ঐতিহ্যর প্রাচীন প্রাজ্ঞতা নিয়ে জগৎকে এ ব্যাপারে পথ দেখানোর উপযুক্ত হবে এবং তাঁর পণ্ডিচেরীর তপস্যার গুহায় বাস, গম্ভীরায় প্রবেশ এই চেষ্টারই প্রসারণ। সব কিছু ছেড়ে পলায়ন নয় এবং এপথের আলো পাওয়ার জন্য অধ্যাত্ম সাধনা অপরিহার্য্য। শ্রীঅরবিন্দ মানুষের সমাজ সভ্যতা ও তার বিবর্তন এবং ভবিষ্যৎ জাতির যে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রচলিত য়ুটোপীয় মত তা নয়, কারণ তার ভিত্তি মনগড়া স্বপ্ন নয়, সবকিছুর মধ্য দিয়ে যে দিব্য উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে তার উপলব্ধি। অরোভিলে যে চেষ্টা চলছে তার আদর্শগত পটভূমিকা এটাই। আপনাকে আত্মিক দিক হতে যথার্থভাবে প্রস্তুত না করে লোকহিত করা, মানব-হিতৈষণায় মন আত্মতৃপ্তি, অহংয়ের তৃপ্তির জন্য

তাতে শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীমার আদপেই সায় ছিলনা, আগে নিজের উপকার করে (নিজ আত্মার) পরের উপকার করা স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তিতে তাঁদের বিশ্বাস ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলতেন নিজের ভেতর শিব আছে জেনে সকলের মধ্যে সেই শিব দেখে শিবজ্ঞানে জীব সেবা, পণ্ডিচেরী কিংবা অরোভিলকে কেন্দ্র করে যে বিপুল সুশৃঙ্খল, নীরব কর্মকাণ্ড ও তদ্বারা সাধারণ জনের যে উপকার হচ্ছে তার অন্তর্নীহিত ভাবনাই হচ্ছে এসবের মধ্য দিয়ে যাঁরা কাজ করছেন এবং এর সংস্পর্শে আসছেন তাঁদের সমবেত আত্মিক উন্নতি।

শ্রীমা একটি বাণী আমাদের দিলেন—

"There should be some where upon earth a place that no nation could claim as its sole property. a place where all.....could live freely as citizens of the world.

পৃথিবীর কোন একটি অঞ্চলে এমন একটি জায়গা থাকবে যাকে কোন জাতিই তার একান্ত সম্পত্তি হিসাবে দাবী করতে পারবে না, এমন স্থান সেটি হবে যেখানে সকলেই বিশ্বনাগরিক হিসাবে স্বাধীন ভাবে বাস করতে পারবে।

মা একে স্বপ্নই বললেন। প্রশ্ন উঠতে পারে একি একটি ছোট আদর্শ উপনিবেশ স্থাপনের স্বপ্ন ধরণীর এক কোণে যা দেখে অন্যরা উদ্বুদ্ধ হবে—যেমন করেছিলেন উনিশ শতকের গোড়ার দিকে য়ুটোপীয় সমাজতান্ত্রিক রবার্ট ওয়েন। বিস্তীর্ণ আলোচনা না করেও বলা যায় পূর্ব্বোক্তদের সঙ্গে পার্থক্যটা মৌল, জীবন-দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গীর। যা হোক সাড়া মিলল, বিশেষতঃ তরুণদের কাছ থেকে যাদের অধিকাংশই বিদেশী। এতে বিচলিত হবার কিছু নেই কারণ বর্তমান ভারতবর্ষের যুব সম্প্রদায় অভিরিক্ত রাজনীতির পাল্লায় পড়েছে যে রাজনীতি সে ডান বাম যাই হোক খুবই কলুষিত।

অনেকের মতে এখন আমরা Post industrial যুগে বাস করছি। অভ্যুদয়গত ভোগে আত্মিকভাবে অতৃপ্ত ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে, প্রতিবাদে রাগী ছোকরার দল বনে, পরে ভবঘুরে হিপ্পি বনে, জেনারেশন গ্যাপে ভুগে (অন্নদাশঙ্কর রায় যার বাংলা করেছেন এক পুরুষের ফাঁকে), ফ্লাওয়ার ছেলে মেয়ে বনে পশ্চিমের তরুণরা পথ খুঁজছে। শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটির উদ্যোগে ১৯৬৬ সালে প্রথম ইউনেস্‌কো অরোভিল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীতা ও দায়িত্ব স্বীকার করলেন প্রস্তাব পাশ করে। যে প্রস্তাব ১৯৬৮ ও ১৯৭০ সালেও গৃহীত হয়। ইউনেসকো, ভারত সরকার, পশ্চিম জার্মানী, কানাডা ও আমেরিকার বিভিন্ন ফাউনডেশানসমূহ—অর্থ সাহায্যের দায়িত্ব নিলেন। ভারতে ও বিদেশে ব্যক্তিগত সাহায্য প্রাপ্তিরও বন্দোবস্ত হল।

প্রশ্ন ওঠতে পারে পৃথিবীর এতসব সমৃদ্ধ অঞ্চল থাকা সত্বেও ভারতবর্ষে আরোভিল প্রতিষ্ঠার কথা ভাবা হল কেন? উত্তর একটিই—অরবিন্দ ও মার সাধনার আসন পীঠ পণ্ডিচেরী ভারতেই অবস্থিত।—পণ্ডিচেরী 'অগস্ত মুনির তপস্যাস্থল বলে পরিচিত। নাম ছিল তার প্রাচীনকালে বেদপুরী। তাছাড়া দুজনেই ভারতবর্ষকে জগতের অধ্যাত্ম-পথের পথপ্রদর্শক, গুরুর মর্যাদা চিরকালই দিয়েছেন এবং অরোভিল সর্বকর্মের মধ্যদিয়ে এই অধ্যাত্ম সাধনায় মানুষ যাতে দিব্যরূপান্তরের জীবন পেতে পারে তারই একটা বলা চলে গবেষণা কেন্দ্র। পণ্ডিচেরীও প্রকৃত অর্থে তাই।

পণ্ডিচেরী হতে মাত্র সাত কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ ভারতেব সমুদ্র উপকূলবর্তী মালভূমিতে অবস্থিত রুক্ষ অনুর্বর, পাথুরে এই স্থানটি নির্বাচিত হল। পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম মানবগোষ্ঠী তামিলদের বাসভূমি, তাদের সভ্যতা, ভাষা ইত্যাদি খুব প্রাচীন, মূল ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত। বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী স্থানটির আবহাওয়া ভ্যাপসা গরম,

সমুদ্রের দিক হতে প্রবাহিত বায়ুতে তা কিছুটা সহনীয় হয়। গ্রীষ্মে দারুণ গরম। শীতে একমাসের জন্য উত্তাপ কিছুটা কমে। এবরো থেবড়ো জমি, মাটি বালুকাময়, লোহা মরচে ধরলে যেমন রং হয় জমির রং তেমনই। সবুজ, শ্যামল, শস্য শ্যামলা মোটেই নয়। ঝাপছাড়াভাবে ঝোপঝাড় আছে, ঘন সন্নিবিষ্ট নয়, ছড়ান ছড়ান তালগাছ, নারকেল গাছ এবং তেঁতুলগাছ আছে।

এরকম একটি জায়গায় ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারীর মধ্য-ভাগে ভিনসেনজো নামে তরুণ এক মিসিলিয়ানকে বলা হল যে ২৮শে ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠা দিবসের পূর্বে তাকে শ্বেতপাথর কেটে একটি পদ্মাকৃতির পাত্র বানাতে হবে, যা অনুষ্ঠানের দিন ব্যবহৃত হবে। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে তরুণটি দুইশত টুকরো পাথর জোড়া দিয়ে তাই করল। ২৮শে ফ্রেবুয়ারী পৃথিবীর ১২৪ জাতির এবং ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলের প্রতি-নিধি স্বরূপ একটি শিশুর দল একটি ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে সেই পাত্রে পৃথিবীর সর্বাঞ্চল হতে আনীতে একমুঠো মাটি সে পাত্রে রাখল। সুরু হল অরোভিল। আজ অরোভিলে গেলে চমকে যেতে হয় যে কোথায় গেল সে পাথুরে জায়গা। এমন সবুজ সুন্দর অভিনব স্থাপত্যের নিদর্শন স্বরূপ এসব বাড়িঘর কোথা থেকে এল। সবচেয়ে দর্শনীয়, আকর্ষণীয় হল মাতৃমন্দির নামে যে ধ্যান গৃহটি গড়ে তোলা হচ্ছে যা নাকি—পৃথিবীর স্থাপত্য শিল্পে, প্রযুক্তি-বিদ্যায় এক অভিনব ব্যাপার। গোলাকৃতি, এটি প্রতিদিন ধীরে ধীরে আকাশপানে মাথা তুলে দিচ্ছে, তাতে লাগান হবে এমন একটি দর্পণ যা পৃথিবীর আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আকাশকে প্রতিফলিত করবে। অরোভিল প্রতিষ্ঠার পর তার বৃদ্ধির ইতিহাস আর একটি দীর্ঘ গল্প, যা বাড়াস্তের বলার ইচ্ছা রইল।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা)

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলিকাতা-১৩

"ডব্লু. বি. এস. আই. সি. ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্য করে আর ক্ষুদ্র শিল্পগুলি সাহায্য করে সমগ্র দেশকে"

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংগ্রহ ও বিকাশের ক্ষেত্রে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে।

১) দুষ্প্রাপ্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও এস. এস. আই. ইউনিটগুলিকে বিতরণ।

২) অন্তর/কাঠামোগত সুবিধার ব্যবস্থা।

৩) এস. এস. আই. ইউনিটগুলিকে বিপনণের ব্যবস্থা।

৪) আই. আর. বি. আই-এর ঋণপ্রকল্প অনুসরণে রুগ্ন ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ইউনিটগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রকল্প।

৫) সরকারী ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিল্প প্রকল্প গঠন।

এভাবেই রাজ্যের শিল্পউন্নয়ন আর্থিক অগ্রগতি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিতে এই সংস্থা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ :

জনসংযোগ আধিকারিক

ফোন নং :-২৭ ০৩০৩

সাহিত্য সৈকত ১৮

স্বাধীনতা দিবসে আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার

* ভাষা ও ধর্মের বিভেদের প্রাচীর ভেঙে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা।
* সংকীর্ণ আঞ্চলিকতার অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার
* দেশ ও জাতিকে খণ্ডবিখণ্ড করার ষড়যন্ত্রকে পর্যুদস্ত করতে সংহতি।

ভারত এক ঃ আমরা ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার প্রহরী

Adv. No. 13/90-91 পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নতুন বই

কান্তপ্রসাদ সিনহা

শ্রীমতী কাকলি ভট্টাচার্যের 'এক আঁজলা সুখের খোঁজে' কাব্য পুস্তকের (৪০টি কবিতার সংকলন) কবিতাগুলি প্রকৃতি প্রেম, অতীতের প্রতি কবির প্রীতি, কখনও সুখ, কখনও দুঃখের আলো আঁধারি সংকেত, কখনও বা নিঃসঙ্গতা এবং নির্জনতার প্রতি স্নিগ্ধ অনুভূতির জল ছবি।

"সবুজের লালিমা", "মনটা আমার পালিয়ে বেড়ায়", "অকৃত্রিম হাসি", "কৌশানী তুমি সুন্দর", "পাহাড়ী মেঘে রানীক্ষেত", "বাহারি নৈনিতাল" প্রভৃতি কবিতায় তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে অবগাহন, "গতি চাই জীবনের", "সোনার রাশি", "আগামী দিনের প্রতিজ্ঞা আমার" "মনটা আমার পালিয়ে বেড়ায়" কবিতায় জীবনের প্রতি নির্ভরতা এবং আশার ব্যাপ্তি, নির্জনতার প্রতি কোমল দুর্বলতা (নির্জনে একাকী তুমি শোন নদী) ব্যর্থতা, (মিথ্যে মোহ) ও বিষাদ ও নিঃসঙ্গতার বৈচিত্র্যময় মানুষী অনুভূতি।

অবিমিশ্র সুখ বা নিরন্তর দুঃখ কোনটিই কবির কাম্য নয়। "খুঁজে ফিরি" কবিতায় তিনি একই চক্রে আবর্তিত হতে চান না, বন্ধুর অমসৃণ পথেও তিনি পরিক্রমা চাননা, এক আঁজলা সুখের খোঁজে তাঁর অন্বেষণ লজ্জাবতী'র মতই রূপময়ী। তাঁর কবিতার প্রকৃতি চেতনা, আত্মকৃতির বিশ্লেষণ কান্নাহাসির মধুর মিলনের প্রকাশ।

তবে "সামনে এগোতে চাই" "জীবনের ওপিঠে মৃত্যু" কবিতাগুলিতে স্ববিরোধী বক্তব্য বা ভাবপ্রকাশের দুর্বলতা আছে।

সব মিলিয়ে এই প্রচেষ্টা কবিকে বিশিষ্টতা দান করবে।

এক আঁজলা সুখের খোঁজে/কাকলি ভট্টাচার্য
সাহিত্য সৈকত/সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া। ৭৪১১৪০১
দাম: পাঁচ টাকা

মুনিয়ার ডাকাত ধরা

কাকলি ভট্টাচার্য

চার বছরের ছোট্ট মেয়ে মুনিয়া বড় বেশি চঞ্চল যেমন মেজাজীও তেমনি। মাঝে মাঝে মুনিয়ার মা অভিযোগ করেন এই মেজাজী স্বভাবটা নাকি সে তার বাবার কাছ থেকে পেয়েছে।

মুনিয়ার বাবা একজন মহকুমা শাসক। বিশাল বাংলোর মধ্যেই একটা ঘরে তাঁর অফিস। সারাদিন সেখানে প্রচুর লোকজন আসছে। ভাল মন্দ নানারকম মানুষ নিয়েই তিনি ব্যস্ত থাকেন সকাল সন্ধ্যে। কখনও কখনও কাজের চাপে সময়মত নাওয়া খাওয়াই তাঁর হয়না। তবু বড় আদরের মেয়ে রাজেশ্বরীর দিকে তাঁর নজর সারাক্ষণ। মুনিয়াকে তিনি আদর করে রাজেশ্বরী বলে ডাকেন।

P 36208

মুনিয়া একটু মেজাজী হলেই বা তার গুণেরও অন্ত নেই। পড়াশুনোয় তো ভালই, তা ছাড়া আবৃত্তি করা, ছবি আঁকা আর বাগান করায় তার খুব শখ। বিকেলে স্কুল থেকে ফিরেই মুনিয়া ছুটে যায় বাংলোর পেছনের বাগানে। তার নিজের হাতে লাগানো টবের বাহারি পাতা ও ক্যাকটাসের গা ছুঁয়ে ছুঁয়ে আদর করে সে। মালির সঙ্গে সে ও প্রতিদিন বাগানের তদারকী করে। ঝারি দিয়ে জল দেয়, ঘাস তুলে, সার দেয়।

মুনিয়ার সকালের স্কুল। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে এসে প্রায় সারাক্ষণই সে তার বাবার অফিস চেম্বারে ঘুর ঘুর করে অথবা বাবার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকে সতর্ক প্রহরীর মত।

সারাদিন কত লোকজন আসে। তাদের নানা সমস্যা

বাবাকে শুনতে হয়, সমাধান করতে হয়। মুনিয়া সব দেখে শোনে। সে সব তার বোধগম্য হয়না তেমন। তবে কাজের চাপে বা অন্য কোন কারণে বাবা যখন বেশ অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন মুনিয়া তা বুঝতে পারে। সেই মুহূর্তে সে বাবার হাত টেনে ধরে প্রায় শাসনের ভঙ্গিমায়। সবার সামনেই বলে ওঠে, 'বাবা, শীগগির উঠ তো! তোমার এখনও নাওয়া খাওয়া হয়নি। পরে এসে কাজ করো।'

বাবাও তার কথা ফেলতে পারেন না। একমাত্র এই ছোট্ট মেয়েটির বেলাতেই দাপুটে শাসকের যত দুর্বলতা। সামান্য সময়ের জন্যে হলেও তিনি মেয়ের সঙ্গে উঠে যান আবার ফিরে আসেন নিজের অফিস চেম্বারে।

বাবার অফিস ঘরে গোটা পাঁচেক ফোন। প্রায় সারাক্ষণই একটা না একটা বাজছে। বাইরে থেকে নানা-রকম খবর আসছে সারাক্ষণ। কখনও মারদাঙ্গার খবর, কখনও চুরি ডাকাতি কখনও বা কোথাও রাস্তা অবরোধ আবার কখনও বা কোন মন্ত্রীর আগমন, কোন উৎসব অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ এমনি সব।

মুনিয়া লক্ষ্য করে সারাদিন একটার পর একটা ফোন বেজেই চলেছে। কখনও ফোনে কথাবার্তার পরই বাবা হয়তো অফিসের কাজ ফেলে গাড়ী নিয়ে খুব চটপট কোথাও বেরিয়ে পড়েন। বাবার ওপর যে সারাক্ষণের জন্যে কাজের একটা গুরুদায়িত্ব রয়েছে মুনিয়া ছোট হলেও তা বোঝে। আর সেও নিজেকে এখনই বাবার মত একজন দায়িত্বশীল মানুষ হিসাবে ভাবতে চেষ্টা করে।

সেদিন ছিল রোববার। রোববার হলেই বা কী বাবার কাজের শেষ আছে নাকি! সন্ধ্যেবেলা বাবা সবে বাইরে

থেকে ফিরে মুনিয়াকে নিয়ে বসার ঘরে বসে জমিয়ে একটা মজার গল্প শুরু করেছেন আর অমনি ফোন বেজে ওঠলো ক্রিং ক্রিং ক্রিং।

বাবা ফোন ধরলেন। থানার দারোগাবাবুর টেলিফোন। চারজন পুরনো দাগী আসামীর সন্ধান পাওয়া গেছে পানিহাটির এক পুরনো বাড়িতে দারোগাবাবু জানালেন।

কি করতে হবে না হবে টেলিফোনে দারোগাবাবুকে নির্দেশ দিয়ে মুনিয়ার বাবা চটপট ড্রেস চেঞ্জ করে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। সঙ্গে রিভলবার নিয়ে বডিগার্ড।

মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন-তুমি একটু মায়ের কাছে থাক আমি এক্ষুণি ফিরে আসবো।

মুনিয়া ভালমতই জানে এই সব চোর ডাকাতের খবর পেয়ে বাবা একবার বেরিয়ে গেলে সহজে ফেরেন না। কত দিন যে কত রাতে ফেরেন মুনিয়া টেরই পায় না।

বাবার গাড়ীটা লন পেরিয়ে গেট দিয়ে হুস করে বেরিয়ে যেতেই মুনিয়ার মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে আর মায়ের কাছে না গিয়ে বাবার অফিস্ ঘরেই ঢুকলো।

বাবার অবর্তমানে মুনিয়ার খেলার সাথী বাবার আর্দালি, পিওন ও সিংজি। অফিস ঘরে পিওনকে কাছে পেয়ে মুনিয়া একরাশ বিরক্তি নিয়ে জিজ্ঞেস করলো — আচ্ছা পিওন কাকু বলতে পারো ডাকাতগুলো কেন ডাকাতি করে? কি বিশ্রি লোকগুলো সব! এই জন্যেই তো বাবাকে এখন বেরুতে হলো। ধুৎ, আমার কিচ্ছু ভাল্লাগ্ ছেনা।

ঠিক তখুনি আর্দালি এসে মেম সাহেবকে ডেকে খবর দিল কারা যেন এসেছেন।

মুনিয়া শুনতে পেয়ে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে ফুলপিসি, পিসেমশাই, রিম্পা আর বুম্বা গাড়ী থেকে নামছে। মনটা ওর খুশিতে ভরে ওঠলো। রিম্পা বুম্বাকে হাত ধরে ভেতরে নিয়ে গিয়ে মাকে ডাক দিলো মুনিয়া—মা, দেখ কে এসেছে।

মা ঘর থেকে বেরিয়েই ফুল পিসিদের দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে তাদের ভেতর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

মুহূর্তে পরিবেশ পাল্টে গেল। দু'টো ঘরে দুই দলের জমাটি আসর বসে গেল। একটা ঘরে মা, ফুলপিসি ও পিসেমশাই, আর একটা ঘরে মুনিয়া, রিম্পা ও বুম্বা। রিম্পা বুম্বা মুনিয়ার সমবয়েসী।

ওদের গল্প চললো অনেক সময় ধরে। গল্পের মাঝেই ওরা ওঠে এসে পেছন বারান্দায় বসলো।

বিশাল বারান্দা। পর পর চেয়ার পাতা। বারান্দা লাগোয়া বাগান। বাগান শেষ হতেই গঙ্গা। মুনিয়ার এখানটায় বসতে খুব ভাল লাগে। কি সুন্দর গঙ্গা। ছোট ছোট ঢেউ ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে জল কেমন সুন্দর তির তির বেগে চলে যায়। দিন রাত কত নৌকো কত লঞ্চ যায় আসে, এপারের মানুষ ওপারে যাচ্ছে ওপারের মানুষ এপারে আসছে এসব দেখতে মুনিয়ার খুব ভাল লাগে। মুনিয়ার বাবারও এ জায়গাটা খুব পছন্দ। অবসর পেলেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে তিনি এখানে বসেন। রিম্পা বুম্বারও এ জায়গাটা খুব পছন্দ হয়ে গেল। ছোট আলো জ্বেলে লঞ্চের পারাপার দেখে ওদের খুব মজা লেগে গেল।

খানিক বাদে রিম্পা আর বুম্বাকে মুনিয়া বলল—চল, ওপাশের বাগানে যাই। রিম্পা বুম্বাও এককথায় রাজি।

রাগানে এসে মুনিয়ার মাথায় ভূত চাপলো। রিম্পা বুম্বাকে বলল – এই শোন্ আজ আমরা তিনজন মিলে ডাকাত ধরা খেলা খেলব। খেলবি তোরা?

ওরা ভাইবোন সঙ্গে সঙ্গে রাজী। মুনিয়া ছুটে ঘরে গিয়ে বন্দুকটা নিয়ে এল। তারপর চুপিচুপি পা টিপে টিপে এগোতে লাগল গঙ্গার ধারের পাইন গাছটার দিকে। পেছনে দুই সঙ্গী রিম্পা আর বুম্বা।

গঙ্গার পারে এই নির্জন বাংলোয় থাকতে থাকতে মুনিয়ার বেশ সাহস হয়েছে। পাঁচিল ঘেরা বাংলোর চারপাশে আলো জ্বলছে। কম্পাউণ্ডের মধ্যে বেশ কয়েকটা পুরনো বড় বড় গাছ আর সামনে পেছনে ফুলের বাগান।

মুনিয়া রিম্পা আর বুম্বাকে ফিস্ ফিস্ করে বলল— ডাকাতগুলো ঐ পাইন গাছের আড়ালেই লুকিয়ে আছে। আমরা আজ ওদের ধরবোই। চল্ আরও এগোই।

বন্দুকটা বাগিয়ে মুনিয়া এক পা এক পা করে এগোতে লাগলো। পেছনে তার দুই সাগরেদ। হঠাৎ মুনিয়ার নজরে পড়লো গাছের আড়ালে কি যেন একটা নড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক উঁচিয়ে ট্রিগারে আঙ্গুল চাপতেই লিও বন্দুকটা বার কয়েক খ্যাট খ্যাট খ্যাট খ্যাট করে আওয়াজ করলো। মুনিয়া দেখলো বিশাল আকারের কালো মতন কি একটা যেন ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ভয়ে মুনিয়ার বুক কেঁপে উঠলো। রিম্পা আর বুম্বা তো একে অন্যকে ধরে কাঁপতে লাগলো। মুনিয়া চিৎকার করে বলল—চল্ পালাই। বলার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়! আর দৌড়তে গিয়ে পা পিছলে মুনিয়া কাদার গর্তে একেবারে ধপাস। রিম্পা আর বুম্বা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল কোন ভাবে। ঠিক সেই মুহূর্তেই আলোগুলোও গেল নিবে। চারপাশ অন্ধকারে ডুবে গেল।

মুনিয়ার বুক ফাটানো কান্না শুনে বাংলো থেকে টর্চ জ্বেলে সবাই ছুটে এলো। সিংজি গর্তে নেমে মুনিয়াকে কোলে তুলে নিয়ে এলো। মা বেরিয়ে এসে ধমক লাগালেন। তুমি ওখানে এই রা ত কি করতে গিয়েছিলে?

মুনিয়া কান্না ভেজা গলায় বলল—ডাকাত ধরতে গিয়েছিলাম।

মা বিস্ময় চোখে তাকালেন—ডাকাত!

মুনিয়া চোখ মুছতে মুছতে বলল—হ্যাঁ। অন্ধকারে আঙুল তুলে পাইন গাছটার দিকে দেখিয়ে বলল—ওইখানে। সিংজি টর্চ জ্বেলে গাছটার দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখে মস্ত একটা কালো ষাঁড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে। মা শুনে বললেন এরকম সাহস নিয়ে ডাকাত ধরতে বেরিয়েছিলে তুমি ছি!

মুনিয়া কাঁদো কাঁদো গলায় বলল—ওটা যে ভূতের মত দেখতে আমি কি পারি ওর সঙ্গে!

'সাহিত্য সৈকত' এর
দু'টি সংখ্যায়
পরিবেশিত হয়েছে

ফুলিয়ার ইতিহাস

পৃষ্ঠা সংখ্যা আনুমানিক ২১০
দাম দশ টাকা

রূপকথার বাঘ

গৌর বৈরাগী

প্রথমে দেখেছিল সুধাপিসি। খুব ভোর ভোর ঘুম ভাঙে পিসির। হুড়মুড়িয়ে কাজ সারে। একটু আলো ফুটতেই উনুন পরিষ্কার করে ছাই ফেলতে গেছল বাগানে। বাঁ দিকে ঝাপুর ঝুপুর পাতি লেবুর গাছ। সেই গাছের গোড়ায়—দেখেই হাঁউ মাঁউ করে সুধাপিসি সোজা দোতলায়। নন্দ রান্নাঘরে ষ্টোভে চা বসিয়েছিল। অমন বিদঘুটে আওয়াজ কানে যেতে পড়িমরি করে একসঙ্গে তিনখানা করে সিঁড়ি টপকে ওপরে। দেখতে দেখতে একতলা ফাঁকা। ততক্ষণে ওপরেও সাড়া পড়ে গেছে। এ ঘর থেকে বড় মামা। ও ঘর থেকে মেজ মামা। সে ঘর থেকে সেজ মামা। কি হয়েছে! ব্যাপারখানা কি!

ব্যাপার হল একটা বাঘ। আহা কি সুন্দর দেখতে। অর্দ্ধেক সবুজ আর অর্দ্ধেক সাদা। গা ভর্তি আদুরে লোম। নাদুস নুদুস চেহারা। দুটো নীল চোখ। তাতে রাগ নেই এতটুকু। ঢুলু ঢুলু চোখ দুটো কি মিষ্টি কি মিষ্টি। তাকালেই মনে হয় টুলুক টালুক করে সে চোখে ঘুম এল বলে। সারা গায়ে শুধু কালো ডোরাকাটা চিহ্নটি না থাকলে বাঘ বলে মনেই হত না।

কিন্তু বাঘ তো বটে। তাহলে ভাবনার কথাই। এরকম হয়। টাটুদের মামার বাড়িটা না হয় গাঁয়েই। না হয় বাড়ির লাগোয়া পাঁচিল ঘেরা বড়সর একটা বাগানই আছে। তাবলে এই বাগানে বাঘ এসে বসবে।

ওদিকে দোতলা থেকে গলা তুলে, শরীর ঝুঁকিয়ে,

পায়ের বুড়ো আঙুলের টিপে লম্বা হয়ে যে যার তখন বাঘ দেখছে বাগানে। বাগান তো নয় যেন বন বন। বড় গাছ। মেজ গাছ। ছোট গাছ। লতাপাতা। ঝোপঝাড়। দিনের বেলাতেই অন্ধকার কুটরী। ঝিঁ ঝিঁ ডাকে। আর ডাকে ডালে ডালে পাতায় পাতায় পাখিরা। হাওয়া দিলে বন থেকে ঝিরি ঝিরি ঝুমুর ঝুমুর শব্দ ওঠে। আশ্চর্য এর ভেতব কিনা একটা বাঘ! কিন্তু এল কোথা থেকে!

-আচ্ছা চিড়িযাখানা থেকে আসেনি তো! বড় মামা বলল। মা বলল তা কি করে হবে। গেল মাসে টাট্টুদের নিয়ে আমরা চিড়িয়াখানা ঘুরে এলুম। অমন বাঘ তো দেখিনি।

—তাহলে আশপাশের কোন সার্কাস পার্টিফার্টি—

—না তাও আসে নি।

—তাহলে! তাহলে!

বড় ভাবনার কথা। কেউ নিচে নামতে পারছে না। কাজকর্ম সব বন্ধ। মামার বাড়িতে ফোন নেই যে পুলিশকে ডাকা হবে। চিৎকার চেঁচামেচি যে করা হবে তারও উপায় নেই। সারারাত শিকার ধরে এখন গাছের নীচে শুয়ে আরাম করছে বাঘটা। চিৎকার শুনে যদি রেগে গিয়ে ওখান থেকে সোজা একটা লাফ মারে দোতলায়।

—ও টুলু তোরা একটা ব্যবস্থা করবি কিনা। দিদিমার কথা শেষ হল না। মেজ মামা বলল হুম এবার একটা ব্যবস্থা করতে হচ্ছে।

ব্যবস্থাটা দেখছিল টাট্টু ছোট মামাব ঘরের ভেতর বসে। বিপদের গন্ধ পেয়ে তাদের এই ঘরে আটকে রাখা হয়েছে। তবে চোখ তো খোলা, তাই জানলায় বসে দেখল। মেজ মামার হাতে দো-নলা বন্দুক। বড় মামার হাতে তেল

চুকচুকে পালোয়ানী লাঠি। সেজ মামার হাতে ফাঁস লাগানো দড়ি। যদি কোনরকমে বাঘটার গলায় পরিয়ে দেওয়া যায়। তাহলে বাছাধনকে জ্যান্ত পাকড়াও করা যাবে।

ঘরের ভেতর আটকে রাখলে কি হয়। চোখের মত কান আর মনটাও যে খোলা টাট্টুর। কান দিয়ে সব শুনছিল। আর মনে মনে ভাবছিল সে। খুব চেনা চেনা লাগছিল বাঘটাকে। খুব কাছ থেকে দেখা। কোথায় যেন দেখেছে! নাঃ মনে পড়ছে না। এরকম ভাবনার ভেতরেই ছোটমামা দরজা খুলে ঘরে ঢুকল। সবায়ের হাতেই বাঘ ধরার কিছু না কিছু সরঞ্জাম। ছোট মামাই বা বাদ থাকে কেন। হয়ত তেমন ভাবেই হানটান করে কিছু খুঁজতে শুরু করল ছোটমামা। এটা সরাচ্ছে। ওটা সরাচ্ছে।

এটা ছোট মামার ঘর। ঘর বলতেই ঘর। একপাশে একটা খাট। অপর দিকে রঙ তুলি আর ডাঁই ডাঁই কাগজ। দিনরাত বসে বসে ছবি আঁকাই শুধু কাজ। সেই ছবি সরিয়ে নড়িয়ে হানটান করে কিছু খুঁজছে ছোট মামা। খুঁজতে গিয়ে মেঝেতেও পড়ছে কিছু। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চমকে উঠল টাট্টু।

—মনে পড়েছে! মনে পড়েছে! বলতে বলতে মেঝে থেকে একটা ছবি তুলে নিয়ে ভোঁ দৌড়।

—কি মনে পড়ল! ব্যাপারটা কি!

এসব প্রশ্ন টাট্টুর কাছে পৌঁছবার আগেই তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে সে নীচে। হৈ হৈ করে উঠল সবাই। রে রে করে বাঘের ভয়ডর ভুলে নীচে নামতে লাগল বড় মামা মেজ মামা সেজ মামা।

মেজ মামা বন্দুক বাগিয়ে বলল—সামাল সামাল।

বড় মামা মাথার ওপর পালোয়ানী লাঠি ঘুরিয়ে বলল—সরে যাও, সরে যাও।

সেজ মামা দড়ির ফাঁস বনবনিয়ে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল পাকড়ো। পাকড়ো।

কিন্তু না। কিছুই করতে হল না। যেমন হুড়মুড়িয়ে নীচে গেছল সবাই তেমনি কবেই আবার ওপরে উঠে এল। সোজা দলটা গিয়ে ঢুকল ছোটমামার ঘরে। ছবিপত্তর ঘরময় ছড়াছড়ি। ছোটমামা তখন খুঁজছে।

—থাক আর খুঁজতে হবে না।

—হবে না! ছোটমামা অবাক।

—না, সুলুক সন্ধান পাওয়া গেছে এবার।

—তাই নাকি! তাই নাকি! তা কোথা থেকে এল ওটা।

—এই যে এই ছবিটা থেকে। টাট্টু হাতে ধরা কাগজটা বাড়িয়ে দিল। কাগজের ছবি থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাগানে বসে ছিল চুপটি করে।

—তাইত! তাইত! ঝিলিক করে হাসল ছোটমামা। তাইত বলি বাঘটাকে যে চেনা চেনা মনে হয়। এ যে আমারই আঁকা বাঘ। বলে আবার হাসতে লাগল।

তার আগেই দিদিমা বলল—তুই হাসছিস কি বলে নতু।

—কেন! কেন!

—কেন আবার! ধমকে উঠল দিদিমা। এমন বাহারি একটা বাঘ এঁকেছিস বেশ করেছিস। রেখেছিসও খাঁচার ভেতর। কিন্তু তুই তো জানিস এ বাড়িতে কচিকাচা ভর্ত্তি। তা জেনেও বাঘের খাঁচার দরজাটা খুলে রাখলি কি বলে।

শুনতে শুনতে রাগের বদলে হো হো করে হেসে ফেলল ছোটমামা। —ওহ, এই ব্যাপার। তা কি করতে হবে বলো তোমরা।

খাঁচার দরজায় বেশ একটা বড়সর তালা দিতে বলি। মেজমামা বলল এবার।

—আমি অবশ্য চেষ্টা করব। মিটি মিটি হাসতে হাসতে ছোটমামা বলল। কিন্তু রূপকথার বাঘকে কি তালা দিয়ে বন্দী করে রাখা যাবে!

(গ্রাম ও জগত/১২ পৃষ্ঠার পর)

একাধারে নৈর্ব্যক্তিক ও অসামাজিক। ছিন্নভিন্ন আত্মকেন্দ্রিক কতগুলি লোকের একটা জনপিণ্ড। কিন্তু গ্রামে আজও মানুষের সঙ্গে মানুষ একটা আত্মীয়তা পাশে বদ্ধ। যদিও আত্মীয়স্বজনের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হয়—তবু তারা আত্মীয়। কিন্তু শহরে যে আমরা থাকি, তাতে কোনও রকম আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে না, বা তৈরী হয় না।

আমি বলে থাকি—একটা গ্রাম, একটা পরিবার এই ভাবনা নিয়ে গ্রামোন্নয়নের কাজ করো। একটা পরিবারের মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক উপসর্গিক কারণেই আমরা পেয়ে থাকি, যেমন জন্মসূত্রেই মাতাপিতা, ভাইবোনের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে তেমনি মানুষ মানুষের জন্য ভাবে, বেদনাবোধ করে। আবার ঝগড়াঝাটি হয় না, তা নয়। কিন্তু প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা আছে বলেই ঝগড়াঝাটিও আছে। কিন্তু যদি প্রেম-প্রীতি না থাকতো তাহলে ঝগড়াঝাটিও থাকত না। একটা পরিবারের মধ্যে যে যা পারে রোজগার করে আনে এবং যার যা দরকার তা নেয়—এটাই আদর্শ সাম্যবাদী অবস্থা। এই আদর্শ আজকে বাইরে থেকে আসা ভোগবাদের আক্রমণে একান্নবর্তী পরিবারগুলিকেও ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। এমনকি তথাকথিত ছোট্ট বা নিউক্লিয়ার পরিবারগুলির মধ্যেও বিবাহবিচ্ছেদ ও নানাজাতীয় সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। এগুলি আসছে কোথা থেকে? বাইবে থেকে তো? এসব উৎসাহিত বা উত্তেজিত হচ্ছে বাইরেব প্ররোচনা থেকেই তো? কাজেই একান্নবর্তী পরিবার থেকে ভেঙ্গে, গ্রাম থেকে পালিয়ে আমরা যাচ্ছি কোথায়? আমরা একটা অমানবিক, প্রেমপ্রীতিহীন মরুভূমির মধ্যে ছুটে যাচ্ছি। এরকম পলায়নী ভাবনা নিয়ে কখনও মনুষ্যত্বের দায় দায়িত্ববোধ সৃষ্টি হতে পারে না। এখানেও

বলতে হবে, Small is beautiful। মানুষকে মানুষের কাছাকাছি আনতে হলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা ক্রমবর্ধমান দূরত্ব দিয়ে কখনও কোনো আদর্শ সমাজ সৃষ্টি হতে পারে না। চিন্তজগতে একটা মরুভূমি সৃষ্ট হবে মাত্র। এই কথাটাই ভারতীয় দর্শনের অতি একান্ত আপন বক্তব্য। এই গ্রামভাবনার যে দর্শন, তা দার্শনিক ঋষিতুল্য লোকেরা দিয়েছিলেন আমাদের। তাঁরা গ্রাম থেকে মানুষকে আপন করে নেবার মত মনোভাব সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিলেন। মধ্যযুগের সাধুসন্তরা, যেমন গুরুনানক, কবীর, শ্রীচৈতন্য, শঙ্করদেব - এঁরা ও পায়ে পায়ে হেঁটে হেঁটে গোটা ভারতবর্ষ, এবং ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে তিব্বত, চীন ঘুরে ঘুরে এই মানবিকতার সহজ সম্পর্কের কথাটা কার্যতঃ দেখিয়ে গেছেন। এসব কথা এখন ভাবতে আশ্চর্য লাগে। কেননা আজকে সারা বিশ্বে মানুষকে বোঝাবার জন্য, বুঝবার জন্য কত ধরনের যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে—টেলিগ্রাম-টেলিফোন-রেডিও-টেলিভিশন-সিনেমা-বিমান রাস্তাঘাট-খবরের কাগজ ইত্যাদি সারা পৃথিবীর মানুষকে অত্যন্ত কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। কিন্তু এইসব অত্যাধুনিক যোগাযোগের সরঞ্জাম দিয়ে মানুষ কি পরস্পরের বেশী আপন হতে পেরেছে? না—এসব আজ মানুষকে মানুষের প্রতি অনির্বাণ বৈরী—সম্পর্ক স্থাপন করে চলেছে। অন্তহীন যুদ্ধাবস্থার সৃষ্টি করছে।

অতএব গ্রাম মানেই কূপমণ্ডুকতা নয়। বরং গ্রামে বসে আমরা অন্ধকার অন্ধকার রাতে মহাবিশ্বের কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্রের অস্তিত্ব দেখতে পাই। কিন্তু শহরে বৈদ্যুতিক আলোতে, ইটকাঠের অট্টালিকায় বসে আমরা দশহাত দূরের মানুষকেই দেখতে পাই না, মহাবিশ্বকে তো কখনই দেখতে পাবো না। মহানগরে এলেই মানুষের দৃষ্টি বড় হয়,

একথা ঠিক নয়। উল্টোটাই বরং ঘটে। এখানে মানুষে মানুষে সুসম্পর্ক হয় না, মানুষে মানুষে ঘর্ষণ সুরু হয়, নানাধরনের তিক্ততার সৃষ্টি হয়। মহানগরগুলির ফুটপাতে লক্ষ লক্ষ লোক রাত্রিযাপন করে, আর বস্তিবাসীদের যে কি দুরবস্থা—তা অবর্ণনীয়। কিন্তু গগনচুম্বি বহুতল বিশিষ্ট ইটের পর ইট সাজানো অট্টালিকাতে যারা বাস করে—তারা কি মানুষ না কীটানুকীট—যাদের মনুষ্যত্ববোধের বিন্দুমাত্র বালাই নেই। সেখানকার মানুষেরা প্রত্যেকে একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে আবদ্ধ হয়ে আছে। এদের হৃদয়ে সৃষ্ট হয়ে আছে এক অন্তহীন মরুভূমি, যেখানে প্রেম নেই ভালবাসা নেই, সহযোগিতা নেই, আছে হিংসা-ঈর্ষা, দ্বেষ প্রতিনিয়ত তাদের দহন করে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভারতবর্ষের আদর্শ গ্রাম থেকেই এসেছে—একথাও ঠিক নয়। ভারতের আদর্শ এসেছে তপোবনের আদর্শ থেকে। তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষে সত্যিই তপোবন ছিল কিনা, কতটা তপোবন ছিল, তপোবন কোথায় কোথায় ছিল - সে কথা তিনি প্রমাণ দিয়ে বলতে পারেন না। তথাপি তপোবনের যে ধারণা, সেই ধারণাটাই গ্রাম-ভারতের অসংখ্য মানুষের চিন্তা ও চেতনাকে প্রভাবিত করে। কাজে কাজেই কেবল গ্রামের কথা বললেই হবেনা, গ্রামভাবনার পিছনে যে তপোবনের স্বপ্ন আছে, তপোবনের আদর্শ আছে সেকথাটাই স্মরণ রাখতে হবে। তপোবন ভাবিত গ্রামভাবনার যে আদর্শ, যে স্বপ্ন, তা দিয়েই আজকের বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মানুষদের মধ্যে আবার ঐক্যচেতনা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। কিন্তু শহরের মানুষদের মধ্যে অতো সহজে ঐক্যবোধ সৃষ্ট হবে না যে বিনোবাভাবে পায়ে হেঁটে হাজার হাজার গ্রাম পদযাত্রা করেছেন ও মানুষকে-গ্রামগুলিকে পরিবার ভাবনায় জাগরিত করবার জন্য উৎসাহিত করেছেন তিনিই আবার বলেছেন, 'জয় জগত'। অর্থাৎ 'জয় হিন্দ শুধু নয়, 'জয় জগত'। "গ্রাম ভারত, জয় জগত"।

আমার দাড়ি কামানো

মৃদুল দাশগুপ্ত

লিখোনা লিখোনা করতালিলঘু ছন্দ
নিজেকে দিচ্ছি আয়নায় পরামর্শ,
ব্লেড সরে গিয়ে রক্তপাতের পূর্বে
চেয়োনা চেয়োনা দ্বিধামাধবীর স্পর্শ।

তাকেও বলেছি নগরে যেওনা, মুগ্ধা।
—শেভিং ক্রিমের ব্রাশ তুলে ধরে হস্তে
দর্পণে মুছি প্রাসাদ বাগিচা শ্রেষ্ঠীর
কতো কীর্তির সূর্য চলেছে অস্তে!

সাবান চলেছে গরম জলের ধর্মে
ভয়ে এলোমেলো সেফটি রেজর যন্ত্র,
লেসার ছুটেছে বাংলা ভাষার স্বার্থে
নিশীথিনী দেয় দর্পণে ষড়যন্ত্র।

আবহাওয়া

হরপ্রসাদ মিত্র

এই দুপুরটা নির্জন নয়,—কিন্তু
কেন-যে উদাস নিশ্চেতনার উঠোনের মতো ছড়ানো,
মন দেখে যায়,—কানে থেকে-থেকে
খুদে চড়ুইয়ের কিচ্‌কিচ্‌
আর, শালিকগুলোর চিক্‌চিক্‌।
কখনো দোয়েল শিস্‌ দিচ্ছেই,
ঘু-ঘু ডাকছেই ঘুঘুটা।
কাদামাখা মোষ গেল শিঙে লতা তুলিয়ে।
স্কুটারও তো গেল রাস্তায়।

কেন-যে গভীর গুমোট,—কতো-যে
বাসনাবিরোধ একই জীবনের মধ্যে!
কেন-যে ব্যক্তিবোধের এমন শুকনো ইঁদারা কেন-যে!

অবসাদ এই দুরারোগ্যতা—
কঠিন আবহাওয়া-সংবাদ।

পুবের জান্‌লা দিয়ে দেখা যায় বাইরে—
ডালপালা নাড়ে ঈষৎ হাওয়াতে
শিমুলগাছটা।
ঠিকে-ঝিরা ছোটে হন্তদন্ত ক্যানিঙের ট্রেন ধরতে।

৩০ জুলাই ১৯৯০

ও-দলে

সুজিৎ কুমার রায়

লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে
যাস্ নাকো মিছিলে
অকালে জীবনটা তোর
যাবে ওরা গিলে।
লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে
ও দলে যাস্‌না ;
বিষাক্ত ঐ হেরোইন
ভুলেও খাসনা।
ও-দলে মিশলে পরে
অস্তিত্ব থাকবে না ;
অমানুষ হলে শেষে
কেউ যে মানবে না।
মন দাও লেখাপড়ায়
স্কুলেতে যাও ;
সবার আগে শ্লেট বই
হাতে তুলে নাও।
লেখাপড়া শেষ করে
যা খুশি তাই করবে,
শুভ কাজে তখন যে
আশীর্ব্বাদ ঝরবে।

পরিচয়

গৌরাঙ্গ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

চাও যদি এসো রাণী, না হয়তো এসো না
স্বপ্নের যাদুকরী মিছে কেন ছলনা।
তুমি মোর ওগো দেবী, প্রমোদের প্রতিমা
মাধবীর মধু যে গো মদনের মহিমা।
লতিকার তুমি ফুল, কোকিলের গানটি,
নিখিলের প্রণয়ের বাঁশরীর তানটি।
সরসের রাঙা আভা কামনার মদিরা,
বাসরের হিয়াখানি দ্বিধাভরা অধীরা।
তটিনীর কলগানে তুমি মধু রাগিনী,
রাঙা-শশী আঁকা বুকে নিদাঘের যামিনী।
ভয় পাওয়া হরিণীর চমকিত শিহরণ
প্রকৃতির পুলকের রাঙা নব আভরণ।
শ্যামলের শ্যামলিমা, কুসুমের সৌরভ,
তরুণের তরুণিমা, বিজয়ের গৌরব।
চপলার চপলতা জোছনার মাধুরী
গোধূলির কপোলের বরণের চাতুরী।
মলয়ের পবনরে রসায়ন তুমি গো—
কবিতার সুষমার জনমের ভূমি গো।
ঊষাকালে তুমি যে গো শুকতারা টিপটি,
তুলসীর মূলে জ্বালা প্রদোষের দীপটি।
বাসনার সাধনার নির্বাণ বাণী গো
আশা-সুখ সব কিছু তোমাতেই মানি গো।
যমুনার পুলিনের তুমি রাধা কিশোরী
কাব্যের ফুল বনে তোমারেই আজ স্মরি।

অনুপম সেন

কবিসুন্দর অমিয় পাল

চলেছেন একাকী শ্রীঅনুপম সেন।
পথে দেখা হয়ে গেল, কেমন আছেন?
শুধায় কুশল বার্তা ঘোষাল রণেন,
প্যাকেটটি বাড়ায়ে দেন 'নাম্বার টেন'।
অনুরোধ করি! আজ একটু যাবেন
কাছেই আমার বাড়ী, দেখতে পাবেন
এখুনি এখান থেকে একেবারে স্পষ্ট।
শ্রীসেন ভাবেন মনে; হবে নাকি নষ্ট?
দিনটা কেমন যাবে? চাপি মনোভাব
হাসিয়া বলেন তিনি, 'সময় অভাব'।
ঘোষাল না ছাড়ি তাঁরে-সঙ্গে নিয়ে যান
শোনেন প্রবেশ পথে কী সুন্দর গান:
কার কণ্ঠে এত মধু? তখনি শুধান।
ঘোষাল হাসিয়া বলে দেখিতে কি চান
সুধাময়ী অনুপমা? আমারি সে বোন,
পাত্র খুঁজি সারাদিন; মনের মতন
কখনো পড়েনা চোখে; নেই সুখ মনে।
আসিয়াছি যথাস্থানে যার আকর্ষণে
মনে মনে বলে যায় অনুপম সেন,
"সুরটি বাজিছে কানে"; সুর মেলাবেন।
তাই বুঝি মনে মনে তারে দেয় মালা
আইবুড়ো নাম ঘুচি জুড়াইবে জ্বালা।

এবার পুজো

ঈশান চন্দ্র মিশ্র

হিমের গুঁড়ি ঝর ঝর ঝর
রাত্তির ভর ঝরলো শুধু
মিটিং ছিল ঘাসের বুকে
বক বক বক জোর বা মৃদু।
সেই সভাতে শিউলি ফুলের
দল নামলো টুপটুপিয়ে
ছত্রী সেনা যেমন করে
প্যারাসুটে পড়ে ঝাঁপিয়ে।
ঝিঁঝিঁ পোকার কান ফাটা সুর
জানান দিল সভার কথা
এক ঠ্যাংগা সব দুব্বো ঘাসের
সভার চাপে গুঁড়োয় মাথা।
বিষয়টা কি উৎসুক তাই
জানা গেল বিষম ব্যাপার
এবার পুজোর জাঁক জমকে
কম করা চাই বাজেট খানার।
লাউড্‌স্পীকার দিনরাত্তির
মাথা ধরায় শব্দ দূষণ
পুজোর নামে সাজের ঘটা
কী-প্রয়োজন ফ্যাসান ফুসন।
দুগ্‌গা মায়ের আরাধনা
কতই মজা হুড় দুড় মুড়
ভক্তি ভরে পুজোর সাথে
ঢাকের বাদ্যি ঢ্যাম্‌ কুড়কুড়।

যদি তেমন করে

মনোহর বসাক

যদি তেমন করে বলতে পারো বলো,
যদি সহজ পথে চলতে পারো চলো ;
চলায় বলায় ছন্দে যদি
না হয় এলোমেলো।

যদি তেমন করে ডাকতে পারো ডাকো,
যদি এপার ওপার ভালোবাসার
বাঁধতে পারো সাঁকো।

যদি তেমন করে করতে পারো করো,
সকল কাজই—ছোট কিংবা বড়ো,
গাইতে যদি পারো ভালো
সুর তুলে গান ধরো।

যদি তেমন করে হাসতে পারো হাসো
যদি হাসি খুশির আলোয় আঁধার
নাশতে পারো নাশো।

নদী ও নারী

উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়

নদীর মতো
নারী যদি শুয়ে থাকে
এঁকে বেঁকে
শরীর মুচড়ে ওঠে যদি,
নদীর কান্না তবু ডুকরে

ওঠে কি কোথাও !
তবে কি নারী ও নদী
নিভৃতে নীরবে কেবলি
চোখের জলে ভাসায় শরীর ?
যতটুকু সুখ
শরীরে জোয়ার আনে
ততটুকু ফুলে ফুলে ওঠা কান্নায়
শরীর নিয়ে
ভাঁটার টানে
কোথায় ভেসে যায় নদী—
কোথায় নারী !

শুধু বুক ভর্তি জমে ওঠে পলি
শুধু পড়ে থাকে শুন্য চড়া।

আকাশমণি

অরূপ চক্রবর্ত্তী

আকাশমণি আকাশমণি
ফুটলো তোমার ফুল কখানি
সবুজ পাতার নাচের তালে
এলো তোমার নতুন বাণী
আকাশ তোমার দেখার নেশা
মনে মনে করলে আশা
তাইতো তোমার ফুলগুলি সব
দেখায় এতো খাসা।
মনে হয় তোমার কাছে
দূরের কোন খবর আছে
মাঝে মাঝে বাতাস লেগে
ফুলগুলি তাই নাচে।

মেলার মজা

মুক্তি মুখোপাধ্যায়

চৈত্র শেষে কাঞ্চি দেশে
বসবে মেলা দিচ্ছে ঠেলা
এই চঞ্চল মনটারে।
মা বাবাকে বলবো ডেকে
মেলায় যাবো সঙ্গে নেবো
ছোট আমার বোনটারে।
ভাই বোনেতে উঠবো মেতে
যা চাইব কিনে নেবো
মেলায় ঘুরে ঘুরে।
মন ভরাব প্রাণ জুড়াব
বাঁশীর সুরে সুরে।

স্বপ্নের ঘরবাড়ি

শিশির গুহ

কুলীক নদীর ধার ঘেঁষে রাজবংশীদের গ্রাম। ভাতঘড়া, শংকরপুর, রূপাহার পেরিয়ে একটা মোচড় মেরে দ'য়ের মত হয়ে কুলীক বয়ে গেছে সোজা দক্ষিণ দিকে। দু'ধারে মাইলের পর মাইল সবুজ ফল-ফসলের ছড়াছড়ি। এপারে বন্দর, শশ্মানঘাট আর বীরনগরের বাজার। মধ্যিখানে পারঘাটা। এপার-ওপার করতে নগদ লাগে দশ পয়সা। মাঝি হারাণ কাকা সারাদিন নৌকো বায়।

প্রায় বিকেল বিকেল দল বেঁধে তিল্‌কারা ঝাঁপাতে গিয়েছিল কুলীকে। এ সময় নদীর ঘাটে পুরুষ মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। তিল্‌কা, কুসুম, রাণীবালা, লক্ষ্মীমনী প্রাণভরে সাঁতার কাটে এ সময়। পাড়ার দু'একটা বখা ছেলে ওদের ভেজা শরীর দেখার জন্য দূর থেকে উঁকি ঝুঁকি মারে বটে, কিন্তু তিল্‌কারা ছোঁড়াদের একদম পাত্তা দেয় না।

একবার নেপলা কদমফুল দেবার নাম করে হাত চেপে ধরেছিল তিল্‌কার। সে মুহূর্তে এক থাপ্পর কষিয়ে দিয়ে বলেছিল—

—ফের এমুন করলি এক ঝাপড়ে তুর দাঁতের গোড়া নইড়ে দিব বুঝলি? সেই থেকে তিল্‌কাকে কেউ ঘাঁটায় না বটে কিন্তু ওর বন্ধুদের প্রায়ই বিরক্ত করে গাঁয়ের ছোঁড়াগুলান।

স্নান করে বাড়িতে ফিরতেই বুড়ি পিসীটা কিট্ কিট্ করে উঠ্‌লো। হাজারো কৈফিয়ৎ। পিসী জন্মকালা।

হাততালি দিয়ে মুখোমুখি হয়ে কথা না বল্লে কিছুই শুনতে পায়না। এই নিয়ে হাসাহাসির শেষ নাই। তিল্কা কোন কথার উত্তর না দিয়ে খেয়ে দেয়ে সোজা বিছানায় গিয়ে সটান শুয়ে পরতেই বুড়ি আবার গজর গজর শুরু করে দিল। তিল্কা শুয়ে শুয়েই শুনতে পেল বুড়ি বিড়বিড় করছে আপনমনে। ই ছুঁড়িটা কেমুন পারা গ, মর্দ্দ বেটা গুলানের মত লদীতে সাঁতার কেইটে ভিনজা শরীর দেখায়ে বেড়াইনছে. ইহার বিহাটা হবেকনি মনে হইছে, ইঁহাকে কে লিবে বটে! —কথাটা শুনেই তড়াক্ করে লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে তিল্কা। বুড়ির সামনে এসে জিভ ভেংচিয়ে বলতে থাকে—কে লিবে গ। ওর ভঙ্গী দেখে বুড়িও রেগে গিয় বলে মরণ নেই তুয়ার, জুয়ানমাগী হইয়ে রঙ্গ কইরছে ছাখো।

তিল্কা আর দাঁড়ায় না, পায়ে পায়ে বাড়র পেছনে জামরুল গাছটার নীচে এসে দাঁড়ায়।

এখন শেষ বিকেল। সূর্যের সোনা রং ছড়িয়ে পড়েছে সর্ব্বত্র। নিজেকে ভারি সুন্দর লাগছে দেখতে। কয়েকটা কাঠবিড়ালি ছুটোছুটি করছে গাছের ওপরে। কখনোবা কুটুর কুটুর করে দু'একটা জামরুল খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। তিল্কা ধীরে ধীরে গাছের ওপরে উঠে একটা ডালে বসে পা দোলাতে দোলাতে জামরুল খাচ্ছিল আর দূরে কুলীকের দিকে যাবার রাস্তাটার দিকে আপন মনে তাকিয়েছিল।

হঠাৎ গাছের তলায় বুড়ি পিসী এসে হাজির। মাথায় মস্ত বড় ঘোমটা টেনে বললো কে যেন এসেছে বাড়িতে, তিল্কা যেন এসে কথা বলে মানুষটার সাথে।

এ সময় সাধারণতঃ কাউরো আসার কথা নয়, তাছাড়া পিসী যখন একহাত ঘোমটা টেনেছে তখন নিশ্চয়ই অচেনা

লোক। তিল্‌কা পায়ে পায়ে বাড়িতে ঢুকতেই দেখে পরাণবাবু এসেছে। দাদার কারখানায় নূতন কাজ নিয়ে এসেছে। কিছুদিন আগে এক ছুটির দিনে দাদার সাথে এসেছিল এই মানুষটা। দাদা পীতাম্বর বলেছিল পরাণ সরকার নাকি এখন ইনচার্জের কাজ নিয়ে এসেছে, খুব ভাল লোক। সেবার ঘরে দুধ-চা ছিল না বলে ভাল করে চাও খাওয়াতে পারেনি মানুষটাকে। আজকে খাওয়ানো দরকার।

তিল্‌কা সামনে এসে দাঁড়াতেই পরাণ বলল—

—দাদা কোথায়? আজকেতো কারখানা বন্ধ।

মাথা দোলায় তিল্‌কা, ধীর কণ্ঠে বলে কুটুমবাড়ি গিছে, আইসতে রাত হবি।

—তাহোলে যাই আজকে

—কেনে? বসেন, চা খায়ি যাবেন

ওর কথায় হেসে ফেলল পরাণ সরকার, বললো—ঠিক আছে বানাও।

উঠোনের এক কোণে দাঁড়িয়েছিল পিসী। পরাণ তার দিকে ইঙ্গিত করে তিল্‌কাকে শুধালো—কে ইনি, তোমার মা?

খিলখিল করে হাসতে হাসতে তিল্‌কা বললো—না, না মর পিসী। হামার এঠিকনা থাকে, পুরুলিয়া থিকি দাদা নি আইছে।

—তাই বল, তোমাদের কথার সাথে ওনার কথার কোন মিল নেই দেখছি।

তিল্‌কা স্টোভে চা বসাতে বসাতে বললো—কানৎ শুইনবা পায়না, ধান কহিলে পান শুনে। কথার শেষে আবার হাসি। সারা শরীরে হাসির জোয়ার, বুকের চাতাল উথাল-পাথাল।

পরাণ অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে তিল্‌কার দিকে।

শ্যামলা বরণ, মাথায় মেঘের মত একঢাল চুল, টানাটানা চোখ যেন পাথরে খোদাই করা শক্ত চেহারার গড়ন। পরাণ ইচ্ছে করেই চায়ে চুমুক দিতে দেরী করে, সময় কাটাতে চায়। তিল্‌কা এতক্ষণ খেয়াল করেনি, হঠাৎ পরাণের চোখে চোখ পরতেই সে এক ছুটে ঘরের ভেতর গিয়ে শাড়ি ঠিকঠাক করে আবার বারান্দায় পরাণ সরকারের কাছে এসে বললো—

—মুড়ি দিম্‌, খাবেন?

পরাণ মিষ্টি করে হেসে মাথা দুলিয়ে আপত্তি জানিয়ে বললো—

—তোমার দাদার সাথে খুব দরকার ছিল। কালকে দেখা হয়েছিল বটে কিন্তু কথা বলার সময় পাইনি।

—থোড়া ঘরি বসি যান্‌না কেনে, এখনে দাদা আইসবে।

পরাণ আয়েস করে পা ছড়িয়ে খেজুর পাতার চাটাইয়ে বসে পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে বললো—দেশলাই আছে?

তিল্‌কা একটা লম্ফ এনে ধরলো ওর মুখের কাছে, পরাণের ঠোঁটের সিগারেট লম্ফকে স্পর্শ করছে না, সে হতবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তিল্‌কার দিকে।

এমনি সময় বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল, পীতাম্বর এসেছে। তিল্‌কা এক ছুটে এগিয়ে গিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে দাদাকে বললো

—ঐ মাইনসটা আইছে, তর তখনে বসি আছে মেলায় খন থাকি।

—চাহা দিছ?

—হ্যাঁ।

নানারকম গল্প শুরু হয়েছে পীতাম্বরের সাথে। কথায় কথায় রাতে খেয়ে যাবার অনুরোধ করতেই উঠে পরলো

পরাণ সরকার, বললো—

আজ থাক, আরেকদিন খাবো।

খানিকটা এগিয়ে দিয়ে বাড়ির উঠোনে পা রেখেই পীতাম্বর পিসীর কানের কাছে মুখ এনে বললো—পিসী, মানসিটাক কেমল দেখলু। পিসী ফোক্‌লা দাঁতে একগাল হেসে বললো -আলু। ভাল-ভাল। পীতাম্বর বিরক্তিতে পিসীর হাত ধরে ঘরে টেনে এনে বললো—তর ভাইবেটির সাথে বেহা দিবু? পসন হয়?

বুড়ি হেসে কুটি-পাটি। তিল্‌কা এসব শুনে এক ছুটে পাশের ঘরে গিয়ে আড়ি পেতে কথা শুনতে থাকে।

পীতাম্বর বলে—পরাণ সরকার নাকি মেলায় বেতন পায়, তার উপর ওভারটেম আছে, বাড়িটো মেলায় দুর, ওর তখনে একটা ঘর ভাড়া করি দিবা হবি, সেই তখনে আসিছিল। মনে হছে তিল্‌কাকে ওর খুবে পসন।

বুড়ি গম্ভীর হয়ে বললো—বসন? বসনতো আইজকা আসেনি।

পীতাম্বর হেসে পিসীর মাথায় ঘোমটা তুলে ইশারায় বিয়ের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতেই বুড়ির আবার খিলখিল হাসি।

রাতে তিল্‌কার ঘুম আসছে না, পাশে বুড়ি পিসী বিয়ের মজার মজার গল্প বলছে। কিছুই কানে যাচ্ছে না তিল্‌কার। তার দু চোখে এখন স্বপ্নের মিছিল সার বেঁধে ছুটো-ছুটি করছে। আগে এসব জানলে মানুষটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতো সে, দাদাটাও যেন কেমন, আগে থেকে কিছু বলেনা। তবু লোকটার কথা ভাবতে ভাল লাগলো তার। বেশ মিষ্টি চেহারা, সুন্দর শার্ট প্যান্ট পরেছে তার ওপর হাতে আবার ঘড়ি, পকেটে কলম। দাদাকে মানুষটার পাশে কেমন ম্যাড়ম্যাড়া দেখায়। দাদাকে তো এসব কথা জিজ্ঞেস

করা যাবনা, তা নাহোলে মানুষটার সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জেনে নিতে পারতো সে।

রাত কত বোঝা যাচ্ছে না। পায়ে শুয়ে থাকা পিসীর ফোকলা মুখ থেকে বিচিত্র শব্দ বেরুচ্ছে। কিছুতেই ঘুম আসছে না তিল্কার চোখে। সে চোখে-মুখে জল দেবার জন্য পায়ে পায়ে উঠোনে এসে দাঁড়াল। আকাশে মস্ত চাঁদ, চারপাশে ছুটে চলেছে মেঘের সারি। বাড়ির পেছনের জামরুল গাছের ওপর থেকে পতঙ্গের বিচিত্র ধ্বনি ভেসে আসছে। তিল্কার ইচ্ছে হোল সারারাত সে এখানে দাঁড়িয়ে চাঁদের শোভা দেখে। উঠোনের একপাশে কামিনী ফুলের ঝাড়, উগ্র গন্ধ ভেসে আসছে বাতাসে। তিল্কা দু'চোখ বন্ধ করে বারান্দায় এসে একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো খানিকক্ষণ।

হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে চমকে উঠলো সে। দাদা হয়তো বাথরুমে যাবে, তিল্কা অতি দ্রুত ছুট মেরে নিজের বিছানায় গিয়ে পিসীকে জড়িয়ে ধরে ফিসফিস করে বললো—

—ও পিসী, পিসী, বেহার গল্প শুনাবু না?

পপুলার ষ্টীল

মা যশোদা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস

ফুলিয়া পরেশনাথপুর, বুঁইচা, নদীয়া।

(জনরঞ্জন কেন্দ্রের বিপরীত দিকে)

সমস্ত রকম ষ্টীল ফার্নিচার, আলমারী, গেটগ্রীল, সাটার ইত্যাদি সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অতি যত্ন সহকারে প্রস্তুত করা হয়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

সততাই আমাদের একমাত্র মূলধন।

নদীয়া জেলার প্রাচীন দুর্গোৎসব

মাধব ভট্টাচার্য

মহারাজ রুদ্র রায় কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে 'রাজ রাজেশ্বরী' প্রতিমা গড়ে ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে যে পুজোর সূচনা করেছিলেন সম্ভবত নদীয়ার প্রাচীনতম দুর্গোৎসব সেটিই। সেই থেকে রাজরাজেশ্বরী আজও পটে বসে আসছেন। একচালা প্রতিমা। ১০৮ মন গঙ্গামাটি ওজন করে কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত শিল্পীকে প্রাসাদে রেখে মূর্তি গড়িয়েছিলেন রাজা রুদ্র। সেই ধারা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও পালন করে গেছেন তাঁর জীবদ্দশায়। আজ আর গঙ্গামাটি দাড়ি পাল্লায় ওজন করে মায়ের মূর্তি তৈরী হয় কিনা সঠিক জানিনা।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় রাজরাজেশ্বরীর পুজো হতো খুব ধুমধাম করে। ১০৮ মন গঙ্গামাটিতে যেমন দেবী মূর্তি গড়া হতো ১০৮টি পদ্মফুল লাগতো তাঁর সন্ধি পুজোয়। বলি দেওয়া হতো গুনে-গুনে ১০৮টি পাঁঠা। ১০৮টি ঢাকের বাজনায় আরতি হতো। আবার পুজো শেষে বিসর্জনের সময়ও ১০৮ জন লোকই ধরাধরি করে প্রতিমা নিয়ে গিয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দিতো। পুজোর সময় দেবীর সারা শরীর সোনা, হীরে মুক্তোয় ঢেকে দিতেন মহারাজ। কামানে তোপধ্বনি হতো পুজো শুরুর আগে। নীলকণ্ঠ পাখি ওড়ে এসে বসতো রাজরাজেশ্বরীর চূড়ায়।

পুজোর ক'দিন কৃষ্ণনগরবাসীদের নিমন্ত্রণ থাকতো রাজ বাড়িতে। সকলেই প্রসাদ পেতেন। কৃষ্ণনগর পতিতালয়ের পতিতারাও নিমন্ত্রিত হতেন একদিন রাজবাড়িতে। অতিথির

সম্মানে তাদের আহারের ব্যবস্থা হতো। সকলকে নতুন কাপড় উপহার দিতেন রাজা।

রাজরাজেশ্বরীর পুজো এখনও প্রতিবছর হয়। কিন্তু আগের সে জৌলুস আর নেই। এখন সবাই অনাহূত। নীলকণ্ঠ পাখিও বোধ হয় তাই অভিমান করে এখন আর আসে না।

রাজরাজেশ্বরী ছাড়াও কৃষ্ণনগরের আরও একটি উল্লেখ যোগ্য পুজো হলো নাজিরপাড়ার নীলদুর্গার পুজো। ১৯১১ সাল থেকে এই পুজো হয়ে আসলেও এর প্রাচীনত্ব বহুদিনের। অনেকদিন থেকেই এই পরিবারের এই পুজো হতো ওপার বাংলায়।

বাগচী জমশেরপুর গ্রামের বাগচী পরিবারের পুজোও বেশ প্রাচীন। প্রায় দু'শ বছর ধরে এই পুজো হয়ে আসছে।

কোতুয়ালী গ্রামের জমিদার সেন পরিবারের পুজোও প্রাচীন। ১৩৫ বছর ধরে এই বাড়িতে পুজো হচ্ছে এক-নাগাড়ে।

ফুলিয়ার গঙ্গার ধারে মালিপোতা গ্রামের পাঁচুগোপাল মুখার্জী পরিবারের পুজোও সুপ্রাচীন। প্রায় দু'শ বছর ধরে এই পুজো হচ্ছে বলে শোনা যায়।

শান্তিপুরেও পরিবারিক প্রাচীন পুজোর সংখ্যা বেশ কটি। এদের মধ্যে বড় গোস্বামী পরিবারের পুজোই সব থেকে পুরনো বলে শোনা যায়।

বর্তমানে পারিবারিক পুজোর সংখ্যা কমে যাচ্ছে সর্বত্রই। মন্দিরের পুজো এখন রাজপথে নেমে এসেছে। —পুজো এখন সর্বজনীন।

সর্বজনীন পুজোর প্রথা আসে খুব সম্ভবত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। আর এর শুরু নদীয়ার শান্তিপুরেই।

চাঁদা তুলে শান্তিপুর গুপ্তিপাড়া চুঁচুড়া-চন্দননগরে পুজো হতো। পুজোকে ঘিরে প্রতিযোগিতাও চলতো। শান্তিপুরে একবার এত উঁচু প্রতিমা হল যে বিসর্জনের সময় কেটে কেটে ঠাকুর ভাসাতে হলো। পরের বছরই গুপ্তিপাড়ায় দেখা গেল থান পরানো গলায় কাচা দেওয়া গণেশ। কেন, গণেশের এ বেশ কেন? —না, শান্তিপুরে মায়ের অপঘাতে মৃত্যুর জন্যে পুত্র গণেশের অশৌচ। এইসব হতো। এ সব নিয়ে গান বাধা হতো, হতো কবির লড়াই।

নদীয়ার নাকাশিপাড়ার জমিদার বাড়িতে দুর্গাপুজোর সময় আগে পাঁচালি গান গাওয়া হত। পাঁচালিকার একশ টাকা সাম্মানিক পেতেন। শোনা যায় একবার খরচ কমানোর জন্যে একশ টাকার পরিবর্তে পাঁচালিকারকে আশি টাকা দেওয়া হল। সেই দেখে পাঁচালিকার আসরে বসেই গান বাঁধলেন—

"গ্রামের নাম নাকাশী
ডাকলেও আসি, না ডাকলেও আসি,
ছিল একশত হলো আশী
আসছে বার আসি কি না আসি।"

অন্যান্য বহু জায়গায় মত নদীয়া জেলারও বিভিন্ন স্থানে দশমীর দিন 'বিজয়া' উৎসব হয়। আশপাশের প্রতিমা কোন নির্দিষ্ট ফাঁকা মাঠে জড় করানো হয়। প্রতিমার আঙ্গিক সৌষ্ঠব নিয়ে প্রতিযোগিতাও চলে। পারস্পরিক বিনিময় হয়। স্থানীয় লোকদের এক জায়গায় সকল প্রতিমা দেখার সুযোগও ঘটে। কতোয়ালীর কাছে নিমাসরাই নদীর ঘাটে এরকম একটি উৎসব হচ্ছে বহুদিন। ফুলিয়ায় জনরঞ্জন কেন্দ্রের সামনের মাঠে বিজয়া মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে ১৯৫২ সাল থেকে এক নাগাড়ে। নদীয়ার আরও অনেক স্থানেই এরূপ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। তবে আজকের পুজোয় আরাধনার থেকে আড়ম্বর বড় কৃষ্টি থেকে হুল্লোর বড় অনুভূতি থেকে উন্মাদনা বড়।— পুজো এখন অনুষ্ঠান সর্বস্ব।

সীমান্ত

নারায়ণ বসু

শীতের সকালের ঠাণ্ডা বাতাস হুড্ড তীব্র হয়ে বিঁধছে। ঠোঁটের মাঝখানটায় তিড়িক করে উঠলো। নিমাই বুঝলো ওর ঠোঁটটা নির্ঘাৎ ফাটলো। বিশ্রী ভাবে ফাটলো। জিব দিয়ে ঠোঁটের রক্তের নোনা স্বাদ পেয়ে সে নিশ্চিত হয়। বিড়বিড় করে ভবানীবাবুকে বিশ্রী গালাগালি দিলো। দিয়ে যেন একটু আরাম পেলো। আর এই গালাগালি কেউ শুনতে পেলো না। ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে তা উড়ে গেল ঝরাপাতার মতো।

নিমাই বেকার। নিমাই আশি সালের গ্রাজুয়েট। চাল চুলোহীন নিমাই। যেদিন পকেটে পয়সা থাকে না সেদিন তার খাওয়া জোটে না। এ হেন নিমাই আজ ভবানীবাবুর কাছে কৃতজ্ঞ। ভবানীবাবু বয়েকদিনের মতো তাকে একটা কাজ দিয়েছেন। তিনি নদীয়া জেলার সীমান্তের ধারে রাস্তা তৈরীর কাজ নিয়েছেন। পাণ্ডব বর্জিত এই সীমান্ত গ্রামগুলি। দারিদ্রের চাবুকে আগা-পাস্তলা ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া এই গ্রামগুলি। ভবানী-বাবু নিমাইকে সঙ্গে নিয়ে এসে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। এখানকার গ্রামগুলির চেহারা দেখে তার কেমন যেন খটকা লাগে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য গ্রামগুলিতে তো রাস্তা, ঘাট, স্কুল, কলেজ আছে। কিন্তু এখানকার গ্রামগুলির প্রতিটি মানুষ ধুঁকছে। সমস্যা এদের অনেক। বাড়ি নেই, রাস্তা নেই, স্কুল নেই। অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টির ফলে ফসল নেই। নিমাই ভেবে পায় না, কী করে এখানকার ছিন্নমূল মানুষগুলো বেঁচে আছে। পানীয় জলের কোন

ব্যবস্থা নেই। সবে ধন কয়েকটা মজা পুকুর আর বাঁওড়। যাবতীয় কাজকর্ম ওতেই সারতে হয়।

ভবানীবাবু খুবই বুদ্ধিমান। অল্প টাকার বিনিময়ে বেশি কাজ চান তিনি। নিমাই-এর মতো এলেবেলে নন। নিমাইকে তিনি কাজ দিয়েছেন তার জামাইবাবুর সুপারিশে। মজুরদের পেমেন্ট বাবদ দু'হাজার টাকা আর নিমাই-এর মাইনে বাবদ পাঁচশো টাকা এখন তার পকেটে। এক সঙ্গে অতগুলো টাকা। ভাবতেও ভাল লাগছে। ভবানীবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করে সে।

কৃষ্ণনগর থেকে করিমপুরগামী প্রথম বাসে উঠে চাপড়া নেমে গুটিগুটি হাঁটতে লাগলো পুবদিকে। কুয়াশাছন্ন আকাশে সূর্যের ঠাওর নেই। নিমাই-এর মনে পড়ে লক্ষ্মীকে। কতদিন লক্ষ্মীকে দেখেনি সে ঠিক মনে পড়ে না। সম্ভাব্য সে ফল্গুর মতো লক্ষ্মীকেও আলেয়া মনে হয়। স্বপ্ন মনে হয়। লক্ষ্মীর স্বামীর বাড়ি এখন কোথায় তাও জানে না। তার আর লক্ষ্মীর প্রিয় গোবরডাঙ্গা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে সে। গোবরডাঙ্গার কথা ভাবতে ভাবতে কেমন ঠোঁট ছড়িয়ে হেসে ওঠে সে। হাসতেই ফাটা ঠোঁট আবার চিড়চিড় করে ওঠে। আলতো করে কামড়ে ওঠে সে। লক্ষ্মীর নরম ঠোঁটের কাছে নিজের ফাটা ঠোঁট নিয়ে যায়। আর তখনই প্যান্টের পকেটের টাকায় হাত ঠেকে যায়। চমকে উঠে সে। লক্ষ্মীর কথা ভাবতে ভাবতে নিজেকে স্নিগ্ধ রেখেছিল এতক্ষণ। হঠাৎ সারা শরীরে বয়ে যায় উষ্ণতম রক্তস্রোত। এই দারুণ কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের মধ্যে এক গ্রাম্য যুবতী জলের কলসী নিয়ে প্রায় তার গা ঘেঁষে রাস্তা পার হল। সে মনে মনে ঐ যুবতীর কাছে নতজানু হয়। লক্ষ্মী বলে কল্পনা করে। ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

এবড়ো থেবড়ো রাস্তা। বেশ কসরৎ করে নিমাই গ্রামের ভেতর ঢোকে। বর্ষায় মাটি সরে গেছে গরুর গাড়ির চাকায়। বড় বড় গর্ত। একটু অসাবধান হলেই পা ঢুকে যাবে।

কুয়াশা আর নেই। মেঘলা আকাশ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্রায় উলঙ্গ। কী করে যে এরা বেঁচে আছে? অবাক হয় সে। সব হা-ঘরে। দিন আনে দিন খায়। জন মজুর খাটে। বাঙলাদেশে চোরাই মালপত্র পাচারের মজুরী খেটে জীবিকা চালায় অনেকেই। ছেলেমেয়ে বুড়ো-বুড়ি সবাই মিলে সারাদিন আপ্রাণ চেষ্টা করে এরা। অভাব, অভাব তবু লেগেই আছে। এখানকার সবাই খুব খাটে শুধু দু'মুঠোর জন্যে।

বড্ড বেশি সহানুভূতিতে পেয়েছে আজ তাকে। এজন্যই তো একটা কোন কাজে টিকে থাকতে পারে না সে। তার ভেতরটা কেমন অস্থির করে। কাজের তদারকি করার ফাঁকে ফাঁকে এদের খোঁজ-খবর নেয় নিমাই। হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে এদের ভাবনাটাও সমান তালে পা মিলিয়ে চলে। পৌঁছে যায় ছোট্ট মুদী দোকানে। ছোকরা মুদী জানে অনেক। নিমাই অবাক হয় তার জিনিসপত্রের যা ইচ্ছা দাম নেওয়া দেখে। সে অবশ্য এসবের তেমন খোঁজ খবর রাখে না। তার তো চালচুলোই নেই। তা নুন মশলার খবর রাখবে কী? তবু তার কানে দামগুলো কেমন বেখাপ্পা শোনায়।

লক্ষ্মী হেসে বলতো—এত এলেবেলে হলে চলবে কী করে? চলবে কী করে নিমাই নিজেও জানে না। জানার ইচ্ছেটুকে সে কাশ ফুলের মতো সঙ্গে সঙ্গেই ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়। না দিয়ে উপায় থাকে না। আসলে নিমাই

জানে সে বেকার! গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন শুধু নেয় নি সে খেলাধূলাতেও ছিল চৌকস। বাঁচতে হবে। ঘর বাঁধতে হবে। নিমাই হো হো করে হেসে ওঠে। এর নাম বাঁচা? বাঁচার কথায়, ঘর বাঁধার কথায় কেমন যেন লোভ হোত তার। লক্ষ্মীকে নিয়ে অন্যদের মতো সেও ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখতো। তবে কেন লক্ষ্মী আজ অন্যের ঘরনী।

পকেটে টাকা। দু'হাজার পাঁচশো টাকা। নিমাই মনে মনে দেখতে পায় তার পকেট থেকে কেমন একটা গরম ভাপ বেরুচ্ছে। যেন গরম ভাতের থেকে স্বাদু ভাপ। খাওয়ার ইচ্ছেটাকে আরও তীব্র করে দেয়।

ও মশাই। অমন করছেন ক্যান? ছোকড়া মুদী বিড়িতে শেষ টান দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিতে দিতে প্রশ্ন করে। চমকে তাকায় নিমাই।

ভবানীবাবু নিমাইকে পাঠিয়েছেন। টাকার বিনিময়ে কিনেছেন নিমাইকে। মুখে বন্ধু সুলভ বুলি। ক'দিনের মধ্যে কাজ শেষ করতেই হবে। এমনিতেই নাকি অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভবানীবাবু বলেছেন এদের দিয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত কাজটা করিয়ে নিতে হবে।

খুব রেগে যায় নিমাই। গত কয়েকদিন ধরে এরা কাজে খুব ফাঁকি দিচ্ছে। আজও অনেকের পাত্তা নেই। হাঁকডাক করে সবাইকে চাঙ্গা করে তুলতে চায় নিমাই। কাজে একটা গতি এনে দিতে চায়। কিন্তু নিমাই লক্ষ্য করে যে তেমন সাড়া জাগছে না এদের মধ্যে। কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। যে সব লোকেরা তখনও আসেনি তাদের তক্ষুণি ডেকে পাঠিয়ে নিমাই আয়েশ করে একটা চারমিনার ধরায়। নিজের জগতে আবার হারিয়ে যায়।

এক সময় রাখালের ডাকে চমকে ওঠে। যাদের ডাকতে পাঠিয়েছিল রাখাল তাদের একজন। চোরাই মাল পাচারের চেয়ে রাস্তা তৈরির কাজে রোজগার বেশি। পরিশ্রম একটু বেশি। লাল চক্ষুর ভয়ে বাধ্য হয়ে যেতে হয় তাদের প্রাণ হাতে নিয়ে ওদের কাজে। নিমাই ভাবে লোক-গুলোর কী চৈতন্য নেই। নিমাই খুব বকবে সবাইকে। খুব যা' তা' বলবে। কিন্তু পারে না। রাখাল নিমাই এর মনোভাব টের পায়। সে বলে—'শরীলটা ভালো নেই হুজুর তাই দু'দিন কাজে আইতে পারি নাই।' নিমাই জোর ধমক দেয় তাকে। ভবানীবাবুর কথা মনে পড়ে তার। লোকগুলো ভীষণ ফাঁকিবাজ। জোর ধমক লাগাবে।

রাখাল করজোড়ে বলে—না, হুজুর আমরা ফাঁকিবাজ নই। এই ছাখেন, ছাখেন হুজুর, আমার শরীলটার পানে চাঁয়ে ছাখেন। মিছা কথা কইছি নাকি? রাখাল তার গায়ের ময়লা ছেঁড়া কাপড়টা সরিয়ে দেখায়। সারা গায়ে আঘাতের চিহ্ন। টস্ টস্ করছে দাগগুলো। এতক্ষণে নিমাই ভালো করে তাকায়। সত্যিই তো রাখালের চোখ মুখ লাল। দু'দিন আগে বি, এস, এফ, লোকেরা আমাদের ক্যামন হাল কইরা গ্যাছে। যারা দোষী তাদের গায়ে হাত দেওয়ার মুরোদ নাই। আমরা তো টাকার কেনা গোলাম। কী করব? ঘরে যে ছেলেপুলে বউ উপাস করছে। পেট তো কথা শোনে না। যদি দয়া কইরা দশটা টাকা ছান তো.....

নিমাই ভেতরে ভেতরে কেমন কেঁপে ওঠে—রাখালের অবস্থা দেখে। সে তাড়াতাড়ি নোটের বাণ্ডিলটা বের করে তার থেকে দশটাকার একটা নোট বাড়িয়ে দেয় রাখালের

হাতে। নোটটা নিয়ে রাখাল আস্তে আস্তে চলে যায়।

খেয়াল হতেই নিমাই নোটের বাণ্ডিলটা পকেটে রাখতে যায়। তখনই আর একজন এসে যায় নিমাই-এর খুব কাছে। সেও ময়লা ছেঁড়া কাপড় খুলে দেখায়। একই অবস্থা। নিমাই তাকেও দশটাকার একটা নোট দেয়। তারপর আরও একজন। নিমাই অবাক হয়। সেও করুণ মুখ তুলে তাকায় তার দিকে। তাকাতেই দেখতে পায় আরও একজন। আস্তে আস্তে ঘাড় ফেরায়। আরও একজন। আরও একজন। নিমাই একপাক ঘোরে। ঘুরতেই হয়। তাকে ঘিরে অনেক অনেক মারখাওয়া ক্ষুধার্ত হাত। সবাই গায়ের ছেঁড়া ময়লা কাপড় খুলে দেখাতে চায়।

নিমাই চারপাশটা ভালো করে দেখে নেয়। তার হাতে শক্ত করে ধরা টাকার বাণ্ডিল। সে সেটা পকেটে রাখতে পারছে না। ভবানীবাবুর টাকা। তার নিজের টাকা। এদের মজুরীর টাকা। ওরা সবাই হাত বাড়িয়ে। দারিদ্র্য। অভাব। শিক্ষার অভাব। চেতনার অভাব। ভালো-মন্দ বিচারের অভাব। অভাব তো তারও আছে। ছোকরা মুদীটারও আছে। ভবানীবাবু, ছোকরা মুদী, রাখাল, নিমাই, লক্ষ্মী আর এই মানুষগুলো। সবাই কোন না কোনও কারণে নিচে নামছে। কতটা নিচে? নিমাই তল পায় না। চারদিকে ক্ষুধার্ত হাত। চোখের মধ্যে আগুন। এত ঠাণ্ডায়ও সে ঘামতে থাকে। লক্ষ্মীর মুখ ভেসে ওঠে। কপালে সিঁদুর। দৌড়ে পালিয়ে যেতে চায়। তবে কী সে ভয় পেয়েছে। ভয়! সে তো ভয় জানে না। ভয় করবে কার জন্যে? পাগল হয়ে যায় নিমাই। সে হাতের নোটগুলো ওদের দিতে থাকে। একসময় কাশ ফুলের মতো উড়িয়ে দেয়। নিয়ে নাও। সব নিয়ে নাও। নিমাই নিঃস্ব হয়ে যায়। মাথার মধ্যে হাজার বিছের দংশন।

ফুলিয়ার তাঁত সম্পর্কে অভিমত ঃ

আদি নিবাস ছিল বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার নলশোধা গ্রামে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী কর্তৃক সৃষ্ট স্থানীয় রাজাকার বাহিনীর হাতে বাবা মায়ের সামনে নিজের দাদাকে নৃশংসভাবে হত্যার দৃশ্য চোখে দেখে একরকম সহায় সম্বলহীন অবস্থায় ১০/১২ জন লোকের সংসারের দায়িত্ব মাথায় নিয়ে এই ফুলিয়াতে এসে তাঁত বুনতে শুরু করি।

বাড়িটা গ্রামের একদম সামনের দিকে হওয়াতে মাঝে মাঝেই কলকাতা বা বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকজন আসতেন বাড়িতে শাড়ী কেনার জন্য। সুযোগ বুঝে আমিও টুকটাক কিছু কিছু কেনা বেচা শুরু করলাম এভাবেই স্থানীয় লোকজনের ভালবাসা ও সহানুভূতি সর্বোপরি পরম করুণাময় ঈশ্বরের আশীর্বাদে ধীরে ধীরে ব্যবসা শুরু হয়ে গেল। কিন্তু বর্তমানে শাড়ী তৈরীর কাঁচা মালের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যাওয়ার ফলে সরকারের শত আনুকূল্য সত্বেও টাঙ্গাইল শাড়ীর শিল্পীরা আজ গভীর সঙ্কটের মুখে। বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প বা সমবায় গুলির প্রচারের ফলে টাঙ্গাইল শাড়ী আজ ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছলেও এই শাড়ীর শিল্পীদের দিন আজও সেই অনাহারে না হলেও অর্ধ হারেই কাটছে। পুষ্টি বা শিক্ষা এদের কাছে আজও স্বপ্নেরই মত। যদিও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে শিল্পীদের জন্য কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দিচ্ছেন কিন্তু সেই ভর্তুকির টাকা সঠিক ভাবে শিল্পীদের হাতে পৌঁছালো কিনা সেইদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য মাননীয় সরকারকে অনুরোধ করি।

মহাদেব বসাক

প্রসিদ্ধ টাঙ্গাইল, ঢাকাই বুটি, জামদানী
শাড়ী প্রস্তুত কারক ও বিক্রেতা।

২০০ নং ফুলিয়া কলোনী, পোঃ ফুলিয়া কলোনী,
জিলা-নদীয়া, পিন-৭৪১৪০২

এবারকার পুজো স্পেশাল – 'মহাভারত', 'শকুন্তলা',
'কলকাতা ৩০০', 'ইতালিয়া ৯০'

সততাই আমাদের একমাত্র মূলধন।

'শাড়ী কুঠির'-এর
শারদীয় অভিনন্দন গ্রহণ করুন

হাজারটা শাড়ীর মাঝখান থেকে আপনার পছন্দের শাড়ীটা বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবেন এখানেই। সুতি সিল্ক, তসর, জামদানী বুটি, সিফন, মসলিন যা চাইবেন তা-ই আপনার হাতের কাছে।

আসুন আমাদের শো রুমে। ফুলিয়া- বাসস্ট্যাণ্ডের সাগোয়া আর ষ্টেশন থেকে ৪ মিনিটের পথ। জাতীয় সড়কের ধারে।

শাড়ী কুঠির

প্রোঃ ননী গোপাল দাস

চটকাতলা, ফুলিয়া, নদীয়া

ফোন ঃ ফুলিয়া ৩৮, কলকাতা ৪২-৮৩৮৭

যে ফুলিয়া রসগোল্লার জন্মভিটে বলে খ্যাত আমরা তারই উত্তরাধিকার।

এক যুগ ধরে *ইণ্ডিয়ান সুইটস্* পরিবেশন করে আসছে

ফুলিয়ার ঐতিহ্যময় মিষ্টান্ন

উৎসবে অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের তৈরী রসগোল্লা, কাঁচাগোল্লা, কমলাভোগ, চমচম, লেডিকেনি, দই প্রভৃতি কাছে দূরে সর্বত্রই অর্ডার অনুযায়ী সরবরাহ করে থাকি।

ইণ্ডিয়ান সুইটস্

ফুলিয়া রেলবাজার, নদীয়া।

প্রোঃ মনা পাল

জনসেবায় শান্তিপুর পৌরসভা

ান্তিপুর পৌর ক্লিনিকে (ডাঃ বি. সি রায় রোড) সপ্তাহে
িদিন (রবিবার বাদে) একস-রে ও প্যাথলজিক্যাল
ক্ষা এবং বৃহস্পতিবার ও রবিবার চক্ষু পরীক্ষা ও মঙ্গলবার
শনিবার নাক-কান-গলা পরীক্ষা সুলভমূল্যে করা হয়।
নিকে ষ্টেট আয়ুর্বেদিক ডিসপেনসারিতে এবং আর. এন.
কুর রোডে ষ্টেট হোমিও ডিসপেনসারিতে প্রতিদিন
নামূল্যে চিকিৎসা বরা করা হয়। (পৌর ক্লিনিকের
ান নং শান্তি-১৮)

্যাম্বুলেন্স দিনরাত সুলভে ভাড়া পাওয়া যায়।

াগীব প্রয়োজনে সুলভে 'অক্সিজেন সিলিণ্ডার' ভাড়া
াওয়া যায়।

ব বহনের জন্য পৌরসভার শববাহী মোটরযান ও সাইকেল
ান ভাড়া পাওয়া যায়।

ীর নার্সারী (ডাঃ বি. সি. রায় রোড) থেকে বিভিন্ন
কার ফুলের চারা ও কাটিং সুলভে বিক্রয় করা হয়।

ন্তিপুরের ইতিহাস ও সংস্কৃতি জানতে হলে পৌরসভা
কাশিত ও কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত 'শান্তিপুর পরিচয়'
গ্রহ করুন। বর্তমান মূল্য—৩০ টাকা।

দিল্লীর ন্যাশনাল ইমিউনলজিক্যাল ইনষ্টিটিউটের সহ-
গিতায় পৌর এলাকার রাস্তায় বিচরণকারী কুকুরগুলি
র্জীকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

হাট বর্তমানে পৌর পরিচালনাধীন। সাপ্তাহিক হাটের
দৈনিক বাজার বসানোর জন্য এটি পুনর্নির্মাণের কাজ
উদ্যমে এগিয়ে চলেছে।

বিভাগের সহযোগিতায় পৌরসভা কর্তৃক পৌর এলাকায়
সৃজনের কাজ চলছে।

শান্তিপুর পৌরসভা কর্তৃক প্রচারিত

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা হজযাত্রীদের জানানো যাচ্ছে যে হজযাত্রীদের আবেদনপত্র হজ কমিটির অফিস থেকে বিলি করা হচ্ছে। জাহাজে অথবা বিমানে যেতে ইচ্ছুক হজযাত্রীদের আবেদন-পত্র রাজ্য হজ কমিটির অফিসে জমা দেওয়ার শেষ দিন ২৫-১০-৯০ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে।

ক্রমিক নং ১৬ আই. এণ্ড. সি. এ নদীয়া তাং ১৫-৯-৯০

বেলগড়িয়া টাঙ্গাইল তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিমিটেড

(রেজিঃ নং—৩৯ ডি-এইচ-টি এণ্ড এ-ডি-আর ১৯৮৬-৮৭ তাং ১৩-২-৮৭)

ফুলিয়া টাউনশিপ, পোঃ ফুলিয়া কলোনী, নদীয়া। ৭৪১৪০২

আমাদের সমিতির অবস্থান ফুলিয়া উপনগরীর একেবারে কেন্দ্রস্থলে। রেল স্টেশন থেকে মাত্র ৫ মিনিটের দূরত্ব।

টাঙ্গাইলের সুদক্ষ শিল্পীদের হাতে তৈরী আমাদের সূতি, সিল্ক, জামদানী, বুটি, তসর সব শাড়ীতেই শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় পাবেন।

আপনাদের সকলকে সপরিবারে আমন্ত্রণ।

কৃত্তিবাসের ফুলিয়া জানে সর্বজন
টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের ধন

এবার পুজো দেখুন
আমাদের শিল্পীদের হাতে তৈরী

'কলকাতা ৩০০'

শাড়ী গায়ে জড়িয়ে

টাঙ্গাইল শাড়ীর ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান—

ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন [illegible]
সমবায় সমিতি লিঃ

টাঙ্গাইল তন্তুজীবী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

"সমবায় সদন"
ফুলিয়া, নদীয়া। ফোন : ফুলিয়া ২২

SAHITYA SAIKAT
Puja 1990 Rs. 4·00
Regd. No. 42112/81 R.N.I.

কলকাতার জন্মসন তারিখ নিয়ে বিতর্ক আছে। এসব সত্ত্বেও কলকাতার তিনশ' বছর বয়স হয়ে গেল। এই পুরাতন চিত্র ধরা পড়েছে শিল্পী টমাস, উইলিয়াম এবং ডানিয়েল খুড়ো ভাইপোদের আঁকা ছবিতে। তখন কলকাতা নামক গ্রামের ঘরে ঘরে তেল, ঘি-এর প্রদীপ জ্বলত। পরে এল গ্যাসবাতি উন্নয়নের পথ ধরে। এই চিত্র আমূল বদলে গেছে। উনিশ শতকের শেষভাগে দার্জিলিং জেলার সিদ্রাবং পাহাড়ী গ্রামে আমরাই প্রথম বিদ্যুতের আলো জ্বালিয়েছিলাম। এখন বেশীর ভাগ গ্রাম ও শহরের ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলে। চাষবাস, কলকারখানা, বিশ্বকাপ, ওয়ান ডে ক্রিকেট, শারদ উৎসব সব কিছুরই বিরাট চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের প্রয়োজন আপনার একটু সহানুভূতি।

জনজীবনে প্রত্যাশার প্রতীক

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য ● প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য
সার্কুলেশন ম্যানেজার : গণেশ রায়।
প্রকাশ স্থান : সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া : ৭৪১৪০২
মুদ্রণ : মায়া প্রেস কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা (উঃ)

সমিতি বার্তা

বর্ষ ৯০ □ সংখ্যা ৪ □ অক্টোঃ-ডিসেঃ ১৯৯০

এ সংখ্যার সূচি

নদীয়ার দুই শহর
(কৃষ্ণনগর/শান্তিপুর?) ৭/১৩
হোমিওপ্যাথি কি করতে পারে? ২৬
টুকরো খবর ২২

সরকারী ঘোষণা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলীর গ্রাহক সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, রবীন্দ্র রচনাবলী গ্রাহকগণের দেয় তৃতীয় কিস্তির ৮০·০০ (আশি) টাকা ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক, কৃষ্ণনগর নদীয়া শাখায় আগামী ১৫ই ডিসেম্বর '৯০ তারিখের মধ্যে জমা দেওয়ার দিন ধার্য করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ক্রমিক সংখ্যা 9 90-91 Dt. 22-10-90

জন্ম ও মৃত্যু পঞ্জীকরণ

সারা দেশে আইন অনুসারে পরিবারের প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধভুক্ত করা বর্তমানে বাধ্যতামূলক।

জন্ম ও মৃত্যুর প্রমাণপত্র কেন প্রয়োজন :—

বিদ্যালয়ে ভর্তি, চাকরী, ভোটাধিকার অর্জন, সামাজিক নিরাপত্তা, পাসপোর্ট সংগ্রহ, বীমা, পলিসি পাওয়া, পেনশনের নিষ্পত্তি, সম্পত্তি সংক্রান্ত দাবীর নিরসন ইত্যাদি প্রসঙ্গে।

শিশু কল্যাণ ও মাতৃ মঙ্গল :—

কল্যাণকামী রাষ্ট্রে শিশুদের যথাযথ বিকাশ ও মাতৃমঙ্গল সংক্রান্ত পরিষেবার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে নির্ভুল জনসংখ্যা, তার গতি প্রকৃতি ও বিভিন্ন নীতির যথাযথ মূল্যায়ণের জন্য জন্ম-মৃত্যুর পঞ্জীকরণ একান্ত আবশ্যক।

কাকে সংবাদ পৌঁছে দেবেন :—

শহরাঞ্চলে কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি, নোটিফায়েড এরিয়া বা ক্যান্টনমেন্টে ভারপ্রাপ্ত অফিসার এবং গ্রামাঞ্চলে ব্লক স্যানিটারী ইন্সপেক্টরের কাছে জন্ম বা মৃত্যুর সংবাদ দিতে হবে।

কত দিনের মধ্যে :—

শহরাঞ্চলে জন্মের সাতদিন ও মৃত্যুর তিনদিন এবং গ্রামাঞ্চলে জন্মের চৌদ্দদিন ও মৃত্যুর সাতদিনের মধ্যে সংবাদ পৌঁছানো আবশ্যক। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্যাদি পেশ করলে পঞ্জীকরণের প্রমাণপত্র বিনা মূল্যে দেওয়া হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ক্রমিক সংখ্যা ১৮/৯০-৯১ (তথ্য) নঃ তাং ৯-১০-৯০

'শাড়ী কুঠির' এর
শীতকালীন সম্ভার

পুজোর পর শীতের এই শুরুতে আবার নতুন ভ্যারাইটি। হাজারটা শাড়ীর মাঝখান থেকে আপনার পছন্দের শাড়ীটা বেছে নেওয়ার সুযোগ পাবেন আমাদের এখানেই। সুতি, সিল্ক, সিফন, মসলিন, জামদানী, তসর যা চাইবেন তা-ই পাবেন আপনার হাতের কাছে।

শাড়ী কুঠির

প্রোঃ ননী গোপাল দাস

চটকাতলা, ফুলিয়া, নদীয়া,

ফোন ফুলিয়া ৩৮, কলকাতা—৪২-০৫৮৭

● ফুলিয়া স্টেশন থেকে ৫ মিঃ, বাস স্ট্যাণ্ড থেকে ১ মিঃ।

আমাদের প্রতিষ্ঠানে পাবেন উৎকৃষ্ট মানের টাঙ্গাইল সিল্ক, তসর, বুটি, জামদানী, নক্সাপাড় জ্যাকেট, সুতি, বার হাত মাঠা শাড়ী। আমাদের নিজস্ব তাঁতে প্রস্তুত টাঙ্গাইল ধুতিও পাবেন। কমপক্ষে একশত টাকা থেকে উর্দ্ধে আড়াই হাজার টাকা দামের শাড়ী সর্বদা মজুত থাকে।

মণীন্দ্র চন্দ্র দাস

চটকাতলা, পোঃ ফুলিয়া বয়রা,
জিলা ঃ নদীয়া, ৭৪১৪০২

● ফুলিয়া বাস স্ট্যাণ্ড থেকে ৫ মিনিটের পথ।

কুষ্টিয়ার
গহনা শিল্পে
সুপ্রতিষ্ঠিত
একটি নাম

এ. টি. জুয়েলার্স

এ. টি. জুয়েলার্সের

তৈরী গহনা পরুন।

উৎসবে অনুষ্ঠানে প্রিয়জনকে মনের মত গহনা উপহার দিতে হলে আসুন **এ. টি. জুয়েলার্সে**

প্রো: শৈলেন্দ্র কুমার কর্মকার

কুষ্টিয়া রেলবাজার, বেলেমাঠ, নদীয়া

(মাছ বাজারের সন্নিকট)

বি: দ্র: প্রতি বুধবার পূর্ণ দিন বন্ধ।

দশ বছরের

"সাহিত্য সৈকত"

(১৯৮১ ১৯৯০)

দু খণ্ডে পাওয়া যাচ্ছে হাফ রেক্সিন বোর্ড বাঁধাই, পৃষ্ঠা সংখ্যা দু'হাজারের ওপর। দাম একশত কুড়ি টাকা। লাইব্রেরীগুলোর জন্যে একশত টাকায় দেওয়া হবে।

- নদীয়ার বর্তমান ইতিহাস অনিসন্ধিৎ সুপাঠকদের কাছে এই সংকলন অপরিহার্য।

- বিশদ জানতে হলে পত্রিকা অফিসে যোগাযোগ করুন।

সাহিত্য সৈকত

সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া,

৭৪১৪০২

কৃষ্ণনগর

না, গোপিনীরা আর নাচেনা, গোপেদের বাঁশিও আর বাজে না। ময়ুর আসেনা আর কুঞ্জবনে। নেই আর সেই গান নেই সেই সুর। খোড়ে নদী শুধু বয়ে চলে আপন মনে বনচ্ছায়ে।

খোড়ের পোষাকী নাম জলঙ্গী। কৃষ্ণনগরের মানুষের কাছে তার আদুরে ডাক খোড়ে। খোড়ের এমুখ ডুবে আছে গঙ্গায় ওমুখ পদ্মায়। আর বুকের মধ্যিখানে বড় বড় পাথরের চাঁই। পাথরের চাঁইয়ে ভর দিয়ে শুয়ে আছে কংক্রিটের সেতু। তার ওপর দিয়ে কত গাড়ী ঘোড়া দৌড়য় কত মানুষ সকাল সন্ধ্যে হেঁটে যায়। মানুষের এখন কত ব্যস্ততা! নদীর মুখ পানে চেয়ে দেখার সময় কই তার। খোড়ে নদীর বুকে পাথর জমতে জমতে বাসা বেঁধেছে দ্বিজেন্দ্র-সেতু। সেতুর তলা দিয়ে বংশী মাঝি ভাটিয়ালীর সুর তুলে নৌকো বেয়ে যায়। চুলে পাক ধরেছে বংশীর। নদীর পারে তার ঘর, খোড়ে নদীকে ঘিরেই তার জীবন-জীবিকার স্বপ্ন, নৌকোর দাঁড় টানতে টানতে বংশী দুঃখ করছিল-নদীর সেই গতি এখন আর নেই, নেই তার পাগলপারা ভাব। উপচে-পড়া ঢেউ, পার ভাঙ্গার আনন্দ এসব খোড়ে নদী হারিয়ে ফেলেছে অনেক দিন। অথচ আগে এই নদী বর্ষায় কি দাপাদাপিই না করতো! বংশীর ধারণা খোড়ের বুকে পাথর জমানোর ফলেই নদীর এই হাল! বংশী দুঃখ করে বলে-নদীকে আর মানুষ ভালবাসেনা। নদীর পারে এসে কেউ আর দুদণ্ড দাঁড়ায় না এখন। নদীর জলে শরীর ডুবিয়ে চান করে না, নদীর পারে মানুষ আর ঘরও বাঁধতে চায় না। বংশী দাঁড় টানে বিড়ি ফুঁকে আর এসব গল্প করে। যেতে যেতে ঘাড়

বেকিয়ে আঙুল তুলে একটা জায়গা দেখিয়ে বলে-ওই যে দেখা যায় ওইখানে আগে ছিল বন। বনের মধ্যে ময়ুর ছিল। হরিণ ছিল। হরিণেরা সকালে আর সন্ধ্যায় খোড়ে নদীর পারে এসে দাঁড়াতো। জল খেতো। ময়ুর পেখম তুলে নাচতো। বনের মধ্যেই ঘর বানিয়ে থাকতো গোপ গোপিনীরা। গোপিনীরা নাচতো গোপেরা ওদের নাচের সঙ্গে বাঁশী বাজাতো।

এসবের কিছুই বংশী নিজের চোখে দেখেনি সবই তার শোনা। শোনা হলেও বংশীর গল্প বলার ভঙ্গী খুব সুন্দর। এমন ভাবে বলে যেন সবই তার নিজের চোখে দেখা।

এই খোড়ে নদীর ধার ঘেঁষেই এক শহর। শহরই বা বলি কেন—নগর। কলকাতা থেকে একশ' কি.মি. দূরে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় নগর কৃষ্ণনগর। এখনও রেল স্টেশনে, রেলগাড়ীর বোর্ডে লেখা হয় "কৃষ্ণনগর সিটি"।

একথা ঠিক কুঞ্জবনে এখন আর কুঞ্জ নেই, পাখিও নেই। ইট পাথরের উঁচু উঁচু বাড়ি উঠেছে। মাটির ওপর কালো পিচ ঢালা পথ। শহর কৃষ্ণনগরকে ছুঁয়ে খোড়ে নদী বয়ে চলে উত্তরমুখো।

প্রায় চারশ বছর বয়স হতে চলল কৃষ্ণনগরের। 'কৃষ্ণনগর' রাজার দেওয়া নাম। আসল নাম রেউই। জমিদার ভবানন্দর নাতি রাঘব। রাঘব রায় তাঁদের জমিদারীর রাজধানী মাটিয়ারী থেকে রেউই-এ স্থানান্তরিত করেন। রাজা রাঘবের পুত্র রুদ্রের দেওয়া নাম হল এই কৃষ্ণনগর। সে সময় রেউই-এ একচেটিয়া গোপেদের বাস ছিল। গোপেরা গরু পোষত, শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করত সেই জন্যই রাজা রুদ্র এই জায়গার নামকরণ করেন কৃষ্ণনগর। অনেকের একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামানুসারেই কৃষ্ণনগর নামকরণ।

রাজা রাঘব বা রাজা রুদ্রের কোন স্মৃতিই আজ আর নেই কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগর থেকে খানিকটা দূরে দিগনগরে রাজা রাঘবের নির্মিত দু'টো শিবমন্দির ও একটি বিশালাকার দীঘি আছে।

বর্তমান রাজবাড়িটি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে তৈরী। কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই 'নদীয়ার' সমৃদ্ধি ও উন্নতি ঘটে বিভিন্ন দিক থেকে। শহরের দক্ষিণ প্রান্তে রাজবাড়িটি। আজ অবশ্যি রাজবাড়িটির ভগ্নদশা। এক সময় চারপাশ পরিখা বেষ্টিত ছিল। আজ পরিখা জলহীন। বাইরের ফটক পেরিয়ে ঢুকলেই মাটির ওপর সাজানো দু'খানা কামান।

পলাশীর যুদ্ধে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ক্লাইভকে সমর্থন করেন। সিরাজদৌল্লাকে যুদ্ধে হারানর জন্যে উপহার স্বরূপ দিল্লীর সম্রাট কৃষ্ণচন্দ্রকে 'রাজ রাজেন্দ্র বাহাদুর' উপাধিতে সম্মানিত করেন।

রাজবাড়ির একপাশে ঘাট বাঁধানো সুন্দর একটা দীঘি। বর্তমান কৃষ্ণনগর শহরের সবচেয়ে প্রাচীন বাড়ি বলতে এই প্রাসাদ বাড়ি। এখন রাজা নেই। ভেঙ্গে পড়া রাজপ্রাসাদের একাংশ জুড়ে সরকারী অফিস। একপাশে রাজ পরিবারের স্মৃতি সংগ্রহশালা। পঙ্খের কারুকাজ করা রাজবাড়ির নাট মন্দিরে এখনও প্রতিবছর দুর্গোৎসব হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন খুব ধর্মপ্রাণ। জেলার বিভিন্ন জায়গায় তাঁর নির্মিত বেশ কয়েকটি মন্দির রয়েছে। রাজবাড়ির পুজো মণ্ডপে দুর্গাপুজোর অষ্টমীতে কিছুদিন আগে পর্যন্তও দেখা গেছে নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে এসে বসতো। এখন আর আসেনা। চৈত্রমাসে এখানে বারদোলের উৎসব হয়। বসে মেলা।

নদীয়া রাজদের বিভিন্ন বিগ্রহ রয়েছে জেলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মন্দিরে। সেইসব বিগ্রহ বারদোলের সময় নদীয়ার রাজবাড়ির পুজোমণ্ডপে আনা হয়। এটি কৃষ্ণনগরের একটি বড় ঐতিহ্যপূর্ণ উৎসব। দু'শ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই উৎসব অনুষ্ঠান হয়ে আসছে।

নদীয়া জেলার সদর শহর হল এই কৃষ্ণনগর। বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা পশ্চিমবঙ্গের একটি ছোট্ট জেলা নদীয়া। আয়তনে ছোট হলেও এর ইতিহাস ছোট নয় সাধারণও নয়। তা ছাড়া নদীয়ার প্রাচীন ইতিহাস শুধুমাত্র নদীয়ারই ইতিহাস নয় — গোটা বঙ্গদেশের ইতিহাস। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল নদীয়া জেলায় 'নদীয়া' নামে কোন স্থান নেই।

আয়তনের দিক থেকে ছোট হলেও নদীয়ার জনজীবন বহু অভ্যুত্থানের সাক্ষী। সিরাজদৌল্লাকে পরাজিত করে লর্ড ক্লাইভ ইংরেজ রাজত্বের ভিতটা সুদৃঢ় করে নিয়েছিলেন এই জেলারই পলাশীর প্রান্তরে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। একদিন ইংরেজও বিদায় নিল, দেশ স্বাধীন হল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন হলেও নদীয়া ভারতভুক্ত হলো তারও দু'দিন বাদে ১৯৪৭-এর ১৭ আগষ্ট। বর্তমান নদীয়ার আয়তন ৩৯২৩ বঃ কিঃ মিঃ, লোক সংখ্যা ২৯৭৭০১৩ (১৯৮১ লোক গণনা) জন।

শহর কৃষ্ণনগরের আয়তন ৫৯ বঃ কিঃ মিঃ। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে প্রাপ্ত হিসেব অনুযায়ী শহরের লোক সংখ্যা ১,৪০,০০০ জন। মিউনিসিপ্যালিটিতে মোট ওয়ার্ডের সংখ্যা ২৯টি।

কৃষ্ণনগর শহরের উত্তর ছুঁয়ে আছে খোড়ে নদী,

দক্ষিণে রাজবাড়ি, পুবে ঘূর্ণি আর পশ্চিম বরাবর মুর্শিদাবাদের রেল। শহরের ভেতরে প্রায় ১০০ কি. মি. পাকা রাস্তা। জেলার বিভিন্ন প্রান্তেতো রয়েছেই। গোটা রাজ্যের প্রায় সব জেলাতেই বাস যাচ্ছে এখান থেকে। ৪৮টি বিভিন্ন রুটের বাস ছাড়ে এই শহর থেকে।

জেলা প্রশাসনের দিক থেকে নদীয়া কালেকটরী সুপ্রাচীন। কালেকটরের হিসাব করলে বর্তমান সমহর্তা জেলার ৬০তম জেলা শাসক।

নবদ্বীপ-শান্তিপুরের মত না হলেও কৃষ্টি সংস্কৃতির শহর কৃষ্ণনগর। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যেমন ছিলেন ধর্মপ্রাণ তেমনি গুণের সমাদরও করতেন তিনি। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার কবি ছিলেন ভারতচন্দ্র। অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর কাব্য তিনি কৃষ্ণনগরে বসেই লেখেন। শান্তিপুর নিবাসী গোপাল ভাঁড়ও ছিলেন তাঁর রাজসভায়। কৃষ্ণচন্দ্রের পরও এই শহরের বিদ্যাচর্চার ধারা উল্লেখনীয়।

প্রায় ১০০ বিঘা জায়গা জুড়ে কৃষ্ণনগর শহরের বুকে অবস্থিত কৃষ্ণনগর গভর্ণমেণ্ট কলেজটি। প্রায় দেড়শ বছর বয়েস হতে চললো কলেজটির। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ জানুয়ারী কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। রামতনু লাহিড়ী, পণ্ডিত মদন মোহন তর্কালঙ্কার এই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন এক সময়। বহু কৃতি ছাত্র বেরিয়েছে এই কলেজ থেকে, এখনও এই কলেজের সুনাম লোকের মুখে মুখে। এক সময় এই কলেজে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েটদের ক্লাস হতো। কৃষ্ণনগর সি. এম. এস. স্কুলটিও পড়াশুনোর দিক থেকে ভাল। এ ছাড়াও বেশ কয়েকটি স্কুল, উইমেন্স কলেজ টেকনিক্যাল কলেজ রয়েছে।

শহরের মাঝখানে অবস্থিত কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরী।

নদীয়া জেলার প্রাচীনতম এবং পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় প্রাচীন গ্রন্থাগার এটি। মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের আমলে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১ জুলাই এক একর জায়গার ওপর স্থাপিত হয় এই গ্রন্থাগারটি। বহু প্রাচীন আমলের বই রয়েছে গ্রন্থাগার-টিতে বর্তমান বইয়ের সংখ্যা প্রায় ১৯,০০০। বছর বছর সরকারী অনুদান মিলে ১৩৫০ টাকা। এ ছাড়া ঘূর্ণিতে রয়েছে জেলা গ্রন্থাগার।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতি ধন্য কৃষ্ণনগর শহর এক সময় সাহিত্যের আড্ডায় জমজমাট ছিল। এখনও বেশ কয়েক জন কৃতি গবেষক সাহিত্যিক বাস করেন এই শহরে। নদীয়া জেলা থেকে যত পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার সিংহ ভাগই বেরয় এই শহর থেকে। কৃষ্ণনগর থেকে প্রকাশিত বঙ্গরত্ন এই জেলার সুপ্রাচীন পত্রিকা।

জেলা প্রশাসন ভবনের কাছেই নির্মিত হয়েছে রবীন্দ্র-ভবন। রবীন্দ্রভবন শুধুমাত্র কৃষ্ণনগরের সংস্কৃতিপ্রেমীদেরই সংস্কৃতি প্রচারের প্লাটফরম নয় গোটা জেলার সংস্কৃতি-প্রেমীদেরই অংশ গ্রহণ করার সুযোগ রয়েছে এখানে।

মাধব ভট্টাচার্য

শান্তিপুর

বিশাল বাড়িটার দেওয়ালের পলস্তরা খসে পড়েছে। সরু পাতলা ছোট ছোট ইঁট মুখ বার করে আছে। চুন থেকে আলগা হয়ে যাচ্ছে ইঁটগুলো ক্রমশঃ। সংস্কার নেই বাড়িটার বহুদিন। ছাদ ভেঙ্গে পড়ার আশংকায় দিন কাটে এ-বাড়ির বাসিন্দাদের।

চার পুরুষের সহবাস চলছে এ বাড়িতে এখনও। এর আগেও চার পুরুষ বাস করে গেছেন। দুশ' বছর বয়েস হতে চলল বাড়িটার। যিনি তৈরী করেছিলেন তার এখন স্বর্গে বাস। মর্তে তার উত্তরাধিকাররা পলেস্তরার খরচ জোটাতেই হিমশিম খাচ্ছেন। হাঁড়ি একই হোক বা ভিন্নই হোক, ঘরের দেওয়ালে সিমেন্ট বালি পড়ুক বা না পড়ুক, পূর্ব পুরুষের এই ভিটে বাড়িতেই আড়াল টেনে বসবাস করছেন বর্তমান পুরুষেরা।

ভিটেকে আগলে থাকার প্রবণতা আজও শান্তিপুর-বাসীর মনে যথেষ্ট। এই ট্রাডিশন তাদের বহু পুরুষ ধরে চলে আসছে। জন্মভূমির প্রতি তাদের মমত্ববোধ কতটা জানিনা তবে ভিটের টান এখনও রয়েছে।

কত বয়েস হবে শান্তিপুরের? হাজার না হোক ন'শ তো হবেই। নশ' বছর ধরে কত মানুষের জীবনধারা বয়ে চলেছে এই মাটির বুকে। কত পুরুষের বসবাস! কত কৃষ্টি কত সংস্কৃতির ধারক এই শান্তিপুর! দীর্ঘ তার ইতিহাস। শান্তিপুরকে জানতে হলে একটু পেছন ফিরে তাকাতে হবেই।

— একটা সময় গেছে, কলকাতার যখন পত্তন হয়নি, বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতির পীঠস্থান বলতে লোকে বুঝত এই শান্তিপুর আর নবদ্বীপকে। এখন সে ঐতিহ্য নেই ঠিকই তবে অতীত খুঁড়লে সম্পদ উঠে আসবে।

ন'শ বছরের কোন স্মৃতিই এখন আর নেই শান্তিপুর শহরে। ইতিহাসে কিছু কিছু লেখা আছে। পুঁথি, জনশ্রুতির আকারে প্রচারিত হয়ে আসছে জন্ম জন্ম ধরে।

ভাগীরথীর বুকের জল ছাপিয়ে একদিন এক মাটির চর চোখ তুলে চাইল। দ্বীপের মত এই চরায় এক মুনি কুঠি বাঁধলেন। গঙ্গার ধারেই তাঁর আশ্রম কুঠি। তপস্যায় বসেন ঐ শান্তিমুনি। ধীরে ধীরে জনপদ গড়ে উঠতে লাগল। এই মুনির নামানুসারেই জায়গাটার পরিচয়ও হয়ে উঠলো 'শান্তিপুর' বলে।

এই শান্তিমুনির পরেও বহু মহাত্মার বাস হয়েছে এ মাটিতে। অদ্বৈতাচার্য, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও তাঁর বংশধররা তো এ মাটিরই সন্তান। বাস করেছেন শ্রীচৈতন্য, যবন হরিদাস ও আরও অনেকেই।

শাক্ত ও বৈষ্ণবের সহবাস ঘটেছে শান্তিপুরে। মুসলমান খৃষ্টান, ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ বহু সম্প্রদায়ের মানুষেরই বাস এখানে দীর্ঘ দিন ধরে। নবাব ঔরঙ্গজেবের আমলে (১৭০২ খৃঃ) তৈরী তোপখানা মসজিদটি প্রাচীন স্মৃতিকে ধরে রয়েছে। শান্তিপুরের সূত্রাগড়ে শরীবৎ মসজিদটি যদিও অনেককাল পরের তবু তোপখানা মসজিদ থেকে অনেক বড়। শান্তিপুরবাসী গরীব শরীবৎ ছিলেন একজন ঝিনুকের ব্যবসায়ী। ব্যবসা করে তার প্রচুর টাকা হয় সেই টাকায় তিনি ১০ বিঘা জমির ওপর কুড়ি হাজার

টাকা খরচ করে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে এই মসজিদটি তৈরী করেন। শরীবতের অনেক দান ধ্যানের কথাও শোনা যায়।

মন্দির মসজিদ আখড়ায় ভরা শান্তিপুর শহর। শ্যামচাঁদ মন্দির, জলেশ্বর গোকুলচাঁদ, বড় গোস্বামী বাঁশ-বুনিয়া, আতাবুনিয়া, পাগলা গোস্বামীদের বিগ্রহ মন্দির সিদ্ধেশ্বরী কালী, আগমেশ্বরী কালী, বুড়ো শিব ছাড়াও আরও অনেক। একদিনে মন্দির-দেখে শেষ করা যাবেনা।

প্রাচীনকালে বিদ্যালাভের জায়গা ছিল গুরুগৃহ। চৈতন্যদেব শান্তিপুরে গুরু অদ্বৈতাচার্যের কাছে থেকে বিদ্যালাভ করেছেন বেশ কিছুদিন। কত টোল ছিল এখানে এক সময়। কত পণ্ডিতের ছিল বাস। বিদ্যার্জনই ছিল সে সময় মানুষের কাছে সব থেকে বড় সম্পদ। এখন টোল নেই। ছাত্র আর গুরুগৃহে যায়না। গুরুই আসেন ছাত্রের কাছে অর্থের বিনিময়ে। বিদ্যাশিক্ষার ধারাটাও গেছে পাল্টে। শান্তিপুর শহরে প্রাচীন শিক্ষা সংস্কৃতির ধারক হিসাবে রয়েছে এখনও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠানটি। জলেশ্বর মন্দিরের কাছে ১৩১৬ সালে এই প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। বহুজন এখান থেকে সংস্কৃতের পাঠ নিয়েছেন। বহু বিদগ্ধ পণ্ডিতকে এই প্রতিষ্ঠান নানা উপাধি দানে সম্মানিত করেছে। কিছুদিন আগেও বঙ্গীয় পুরাণ পরিষদের কর্ণধার ছিলেন অজিত স্মৃতিরত্ন। এখন অধ্যাপক ধীরানন্দ রায় সহ আরও কয়েকজন মিলে এই প্রতিষ্ঠানকে সজীব রাখার চেষ্টা করছেন। পুরাণ পরিষদের মত আর একটি সংস্কৃতি চর্চার প্রতিষ্ঠান হলো শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদ। প্রভাস রায় একে আগলে ছিলেন দীর্ঘদিন। তাঁর মৃত্যুতে একটা শূন্যতা এসেছে প্রতিষ্ঠানটির। প্রাচীন বেশ কয়েকটা পুঁথি আছে

এই পরিষদে। ইদানীংকালে শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরীটির বইয়ের সংগ্রহ ভাল।

বহু কৃতি সন্তান যেমন জন্মেছেন এই শান্তিপুরে বহু লেখক কবিরও জন্ম দিয়েছে এ মাটি। পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী ছিলেন এখানকারই একটি স্কুলের শিক্ষক। শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে তিনি লিখে রেখে গেছেন চারুগাথা, শৈবলিনী সীতাহরণ প্রভৃতি বই। রামনাথ তর্করত্ন ছিলেন পুঁথি সংগ্রাহক। ২০ বছরের পরিশ্রমে ৪ হাজারেরও বেশি প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। যার অধিকাংশই এখন আছে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে। দামোদর মুখোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি বই শান্তিপুরে বসেই লেখা। আত্মীয়তা সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁর বৈবাহিক। সেই সূত্রে বিদ্যাসাগর মশায়ও শান্তিপুরে এসেছেন তাঁর বাড়িতে। মোজাম্মেল হক, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর বাড়ি শান্তিপুরেই। শান্তিপুরের এক দরিদ্র শালকরের ঘরে স্যার আজিজুল হক জন্মেছিলেন। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শিখে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিছুদিনের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হন। একবার শিক্ষামন্ত্রীও হয়েছিলেন।

কবি করুণানিধানের কথা কে না জানে। এই শান্তিপুরই তাঁর জন্মভিটা। তাঁর লেখা কবিতা পড়েনি স্কুল পড়ুয়া এমন ছাত্র পাওয়া ভার।

এখন এখানকার সাহিত্যচর্চা অতীতের মত উল্লেখ-যোগ্য না হলেও মাসিক সাপ্তাহিক মিলে ২/৩টি কাগজ বেরয়। গান বাজনা নাটক থিয়েটারেরও চর্চা আছে। জমিদার রামচন্দ্রের আমলে শান্তিপুরের সঙ্গীতচর্চা এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে শান্তিপুরকে লোকে বাংলার লক্ষ্ণৌ

বলত। লক্ষ্ণৌ থেকে বড় বড় ওস্তাদ এখানে এসে বাস করতেন এবং সঙ্গীত শিক্ষা দিতেন। এখনও সারারাত্রি ব্যাপী সঙ্গীতের জলসা বসে কখনও কখনও। লক্ষ্ণৌর ওস্তাদ শিল্পী হয়ত আসেননা স্থানীয় গায়করাই গান গেয়ে শোনান শ্রোতাদের। শান্তিপুরে পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্রর অবদান যথেষ্ট। তাঁর তৈরী শান্তিপুর কলেজটিই এখানকার উচ্চ-শিক্ষার একমাত্র শিক্ষালয়। শহরের মধ্যে সব মিলিয়ে হাইস্কুলের সংখ্যাও ৬/৭টি।

শান্তিপুর একসময় মহকুমা শহর ছিল। ১৮৬৭-৬৮ নাগাদ শান্তিপুর থেকে মহকুমা উঠে আসে রানাঘাটে শান্তিপুর এখন মিউনিসিপ্যাল শহর। মিউনিসিপ্যালিটির বয়সও একশ পেরিয়েছে। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুর মিউনি-সিপ্যালিটির জন্ম।

গঙ্গা এখন শান্তিপুর শহর থেকে অনেকটা দূরে সরে গেছে। শহরও এগোচ্ছে গঙ্গাকে পেছন ফেলে রেল স্টেশনের দিকে। বর্তমান শান্তিপুর শহরের আয়তন ১০ বর্গমাইল। ১৯৮১-র গণনা অনুযায়ী লোকসংখ্যা ৮৪,৮৭৬ জন। ১৯৯০ এ এসে তা যে ১ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক এই শহরের একে-বারে বুক চিরে বেরিয়ে গেছে কৃষ্ণনগর হয়ে উত্তরবঙ্গের পথে। শহরের অধিকাংশ রাস্তাই পাকা। মোট ১০৮-৫১৫ কি.মি. রাস্তার মধ্যে ১০৫-১৫৬ কি.মি. রাস্তাই পাকা বাকীটা কাঁচা। পুরনো শহর শান্তিপুর। সরু সরু রাস্তা। গাড়ী চলাচলে বেশ অসুবিধা। বাড়ি ঘরের সঠিক সংখ্যা অফিসেও নেই তা হলেও অনুমান শান্তিপুর শহরে কম করেও ২৫ হাজার ঘরবাড়ি হবে।

সময়ের কল বেয়ে সকাল সন্ধ্যা জল নেমে আসে। যদি বিদ্যুৎ দপ্তর সচল থাকে তো সন্ধ্যায় রাস্তায় আলো জ্বলে। শহর জুড়ে স্যানিটারি পায়খানার সঙ্গে সঙ্গে খাটা পায়খানার সংখ্যাও কম নয়। ড্রেনের ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয় বলেই শহরবাসীর মন্তব্য।

শহরের একলক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ৬০ শতাংশ লোকই তন্তুজীবি। বড় কোন শিল্প নেই। শিল্প বলতে হাতে টানা তাঁত। শান্তিপুরের তাঁতের কাপড়ের সুনাম বহুকালের। ইংরেজ আমলে এখানে মসলীন তৈরী হত স্বদেশী আমলে শাড়ীর পাড়ে ছড়া লেখা হত। দেশ বিদেশে শান্তিপুরের শাড়ী রপ্তানী হত একসময়। এখন বাজার আগের মত নেই তা হলেও শান্তিপুরের অর্থনীতি এই শিল্পটাকে ঘিরেই। এছাড়াও পেশাগত দিক থেকে অন্য ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবি, ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক প্রভৃতি রয়েছেন। শহরবাসীর চিত্ত বিনোদনের বড় মাধ্যম এখন টি ভি। শহরবাসী ৩০ শতাংশ লোকের ঘরে টিভি পৌঁছে গেছে। এ ছাড়া লক্ষাধিক মানুষের জন্যে দুখানা সিনেমা হল ও কিছু ভিডিও হল। খবরের কাগজের বিক্রেতা সাধন অধিকারীর মতে ১ লক্ষ মানুষের শহরে সব মিশিয়ে প্রতিদিন খবরের কাগজ বিকোয় মাত্র বারশ। তুলনামূলক ভাবে পাশের ফুলিয়ায় কাগজের পাঠকসংখ্যা বেশি।

কলকাতা থেকে শান্তিপুরের দূরত্ব রেল পথে ৯২ কিমি। একমাত্র ট্রেন শান্তিপুর লোকাল। শিয়ালদহ শান্তিপুর লাইনের শেষ স্টেশন শান্তিপুর। শান্তিপুর থেকে কৃষ্ণনগর হয়ে নবদ্বীপ ঘাট যাওয়ার ছোট ট্রেন আছে। সারাদিনে ৩ খানা গাড়ি শান্তিপুর-নবদ্বীপ করে। কলকাতার সঙ্গে

যোগাযোগের আগে পরিবহন বলতে ছিল একমাত্র নদীপথ। ১৯২৫ সাল নাগাদ রেল চালু হয়। দার্জিলিং মেল আগে শান্তিপুর হয়ে যেত। এখন শান্তিপুর শিয়ালদহ ১৫ জোড়া ট্রেন দিনে রাতে। বাস চলে ১০-১৫ মিনিট অন্তর অন্তর।

শান্তিপুরবাসী চাকুরীজীবির একটা বড় অংশই কলকাতা যাত্রী। নিত্যযাত্রীর আসা যাওয়ার নির্দিষ্ট রেলগাড়ী আছে। আছে নির্দিষ্ট কমপার্টমেন্টের নির্দিষ্ট সিট। রাতে এলার্ম ঘড়িতে দম আটা হয়। ঘড়ি ঘুম ভাঙ্গায়। কেউ বা ৩টা কেউ বা ৪টা কেউ বা ৫টায় বিছানা ছেড়ে তৈরী হয়েই সাইকেল বাহনটি নিয়ে ছুট। স্টেশনে সাইকেল রাখার বিরাট গ্যারেজ। কোন রকমে সাইকেলটা ফেলেই এক ছুটে প্লাটফরম। শান্তিপুর স্টেশনে অফিস্ ট্রেনগুলোতে এদৃশ্য প্রতিদিনকার।

বটুবাবু তো গাড়ীতে ওঠেন দু'কাধে দুই ঝোলা আর দুই হাতে মাল বোঝাই বিশালাকার দুই ব্যাগ নিয়ে। কাঁধের ব্যাগ দুটোতে থাকে তার চাকরীর যাবতীয়। মান্থলী টিকিট, টিফিন কৌটো জলের বোতল। বিস্কুটের কৌটো, মুড়ির কৌটো, পান, বিড়ি, নস্যি, মুখশুদ্ধি, টর্চ-লাইট, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ প্রভৃতি। বটুবাবু গ্যাসট্রিকের রুগী। বাইরে কিছু খান না। তাই সংসারটাকে বয়ে নিয়ে যেতে হয় সঙ্গে করে।

হাতের দুখানা ব্যাগ বোঝাই থাকে শান্তিপুরের শাড়ীতে। পার্টটাইম বিজনেস গাড়ীতে ও অফিসে। বটুবাবু সরকারী চাকুরে। ক'পয়সা আর মেলে সরকারী চাকুরী করে। বিজনেসটা আছে বলেই না সংসারটা চলছে।

সন্ধ্যা ৬ টায় ডালহৌসিতে যার অফিস শেষ হবার

কথা, তাকে শিয়ালদায় বিকেল ৫-৪৮ মিনিটের শান্তিপুর লোকালের কামরায় প্রতিদিন দেখলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই : চাকরী থাক বা না থাক ঐ ট্রেনে যে তাকে ফিরতেই হবে। ঐ ট্রেনেই যে তার বসার সিট বাঁধা। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, তাস খেলা, খাওয়া-দাওয়া কত কি প্রোগ্রাম সবইতো ট্রেনের কামরায়।

রাত ৩ টায় উঠে যে গাড়ী ধরে আর গভীর রাতে বাড়ি ফিরে থাকে, সংসার স্ত্রী-পুত্র কারো সঙ্গেই তার কোন সম্পর্ক থাকে না প্রায়। শান্তিপুরের ডেলি প্যাসেঞ্জারদের এসোসিয়েশন আছে। গাড়ীর ভালমন্দ যাত্রীদের সুবিধা অসুবিধা দেখার চিন্তাভাবনা করেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিপুরে না এলেও নদীপথে শান্তিপুরের ওপর দিয়ে বার কয়েক গেছেন। শান্তিপুরের কাছেই দিগনগরে ছিল তাঁর দিদি সৌদামিনী দেবীর শ্বশুরবাড়ি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখায় নদী থেকে দেখা শান্তিপুরের সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন। এখন সেই নদীও নেই সেই সৌন্দর্যও নেই।

সাহিত্য পরিষদের এক অনুষ্ঠানে সভাপতি হয়ে শরৎচন্দ্র একবার এসেছিলেন শান্তিপুরে। নট সম্রাট অহীন্দ্র চৌধুরীর বাড়িই তো শান্তিপুর লাগোয়া বাগ আঁচড়ায়। আজকের অভিনয় জগতের স্টার মিঠুন চক্রবর্ত্তী তো শান্তিপুরেরই ছেলে। আকাশবাণীর সংবাদ পাঠক দেব দুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈত্রিক ভিটেও তো এখানেই।

৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে ফুলিয়া পেরিয়ে শান্তিপুর ঢোকার মুখেই ঘোড়ালিয়া। শোনা যায় বখতিয়ার খিলজি তার সৈন্যসামন্ত নিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে এ পথ দিয়েই ঢুকেছিলেন। থানা পেরুলেই রাস্তার পাশে শ্যামচাঁদের মন্দির।

শ্যামচাঁদ পেরিয়ে মতিগঞ্জের মোড়। ডানপাশে ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্ম মন্দির বাঁ পাশে জলেশ্বর মন্দির। জলেশ্বর থেকে রেল স্টেশনের পথে একটু এগোলেই ডাকঘর মোড়। শান্তিপুর শহরের কেন্দ্রস্থল। এখান থেকে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে হরিপুর কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর বাড়ি হয়ে সূত্রাগড়ে। রাস্তার ফাঁকে ফাঁকে সেগুন বাগান। সোজা রাস্তায় এগোলে কবি করুণানিধানের বাড়ি, শান্তিপুর কলেজ হয়ে রেলস্টেশন। বাঁ দিকে স্টেশন রেখে একটা সরু রাস্তা চলে গেছে বাবলায় অদ্বৈত পাটে। মহাপ্রভুর সাধন ক্ষেত্র। দোল পূর্ণিমার দিনে এই ভিটে মুখর হয়ে ওঠে বন্ধু ভক্তের আগমনে।

অদ্বৈতাচার্যের আসল নাম কমলাক্ষ। মাধবেন্দ্রপুরীর কাছে দীক্ষা নিয়ে অদ্বৈতাচার্য নাম গ্রহণ করেন। কমলাক্ষ ফুলিয়ায় নৃসিংহ ভাদুড়ীর দুই মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। একজন সীতাদেবী অন্যজন শ্রীদেবী। সীতাদেবী চৈতন্য দেবের মা শচীদেবীর গুরুপত্নী ছিলেন।

শান্তিপুরকে নিয়ে কীর্তন গাওয়া হয়: প্রেমধন বিলায় গোরা রায় প্রেম কমলে। কমলে ঢালে তবু না ফুরায় চাঁদ নিতাই ভাবেক আয়। আর চাঁদ গৌর ডাকে আয়।' শান্তিপুর ডুবু ডুবু না দে ভেসে যায়।

হ্যাঁ ভাসে। প্রেম রসে ভাসে শান্তিপুর রাসের উৎসবে। শান্তিপুরেব ভাঙ্গা রাসের উৎসব প্রেমেরই উৎসব।

শান্তিপুরের ভাষার সুনাম আছে। বিদ্যাসাগর মশাইও শান্তিপুরের ভাষার প্রশংসা করে গেছেন। আবার লোক মুখে শান্তিপুরী আতিথেয়তার নিন্দাও শোনা যায়। আজ অবশ্য ভাষারও বিবর্তন ঘটেছে অনেকটা, আতিথেয়তারও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিবর্তন, মিশ্রণ যাই ঘটুকনা কেন শান্তিপুরের ভাষা আজও মিষ্টি।

মাধব ভট্টাচার্য

সৌজন্য: কলকাতা, ৪ জুন, ১৯৮৯

টুকরো খবর

সম্প্রীতি পদযাত্রা

জাতীয় ঐক্য সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুন্ন রক্ষায় বুদ্ধিজীবি ও প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আহ্বানে গত ১২ নভেম্বর এক বিশাল বর্ণাঢ্য পদযাত্রা কৃষ্ণনগর শহর পরিক্রমা করে। কৃষ্ণনগর পাবলিক লাইব্রেরীর মাঠ থেকে এই পদযাত্রা বের হয় এবং শেষ হয় জেলা স্টেডিয়ামের সামনে। পদযাত্রায় সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতা বিরোধী বহু বর্ণ রঞ্জিত পোষ্টার, ব্যানার, ফেষ্টুন ও ট্যাবলো ছিল। এ ছাড়া অনেক ডাক্তার, নার্স, উকিল, হোমগার্ড তাদের স্ব স্ব পেশাগত পোষাকে পদযাত্রায় অংশ নেন। খেলোয়াড়, কিশোর বাহিনী এবং কুইন্স স্কুলের ছাত্রীরাও অংশ নেন। পদযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী স্বরাজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়, শিবরাম গুপ্ত, গঠন কর্মী দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, বিধায়ক সাধন চট্টোপাধ্যায়, নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি পরিমল বাগচী, কৃষ্ণনগর-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুনীল কুমার ঘোষ, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা অধ্যাপক রেনুপদ দাস, অধ্যাপক আকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, লেখক মোহিত রায়, বিশিষ্ট আইনজীবি এস. এম. বদরুদ্দিন সহ নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থা, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ১২ জুলাই কমিটির সদস্যগণ। পদযাত্রায় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরাও ছিলেন।

পদযাত্রার শেষে এক সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন অমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায়, শিবরাম গুপ্ত ও এস. এম. বদরুদ্দিন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক আকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। পদযাত্রা পরিক্রমাকালে রাস্তার দুধারে অপেক্ষমান অগণিত মানুষ অভিনন্দন জানায়।

আসাননগরে-রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা

গত ১৪ নভেম্বর '৯০ আসাননগর রণভূমি পত্রিকা, পরিষদ ও নদীয়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের যৌথ উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয় আসাননগর পোষ্ট অফিসের মাঠে।

অনুষ্ঠানের সূচনা করে স্থানীয় কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের (যারা এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন) সম্বর্ধনা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি অধ্যাপক আকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ছেলেদের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করে বক্তব্য রাখেন। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে তিনি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী বলে উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক নারায়ণ চন্দ্র বসু বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে যত বেশি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল আলোচিত হবেন ততই দেশের মঙ্গল। অনুষ্ঠানের সভাপতি স্থানীয় অঞ্চল প্রধান প্রাণরঞ্জন সরকার সকলকে ধন্যবাদ জানান।

পাউরুটির দাম

ময়দা ও অন্যান্য কাঁচা মাল ও আনুসঙ্গিক খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় পাউরুটি প্রস্তুতকারকগণ বেশ কিছুদিন যাবৎ পাউরুটির দাম বাড়াবার জন্য দাবী জানিয়ে আসছিলেন।

রাজ্য সরকার পাউরুটি প্রস্তুতকারকদের বিভিন্ন এ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আলোচনা করে এবং কাঁচা মাল ইত্যাদির দাম বিবেচনা করে ১০ নভেম্বর ১৯৯০ থেকে রাজ্যের সর্বত্র বিভিন্ন প্রকার পাউরুটির সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য যা ধার্য হয়েছে তা নিম্নরূপ :

পাউরুটির ওজন	প্রকার	দাম
৪৮০ গ্রাম	প্লেন	৭০ পয়সা
	স্লাইস্‌ড	৭৫ পয়সা
২০০ গ্রাম	প্লেন	১·২৫ টাকা
	স্লাইস্‌ড	১·৪০ টাকা
৪০০ গ্রাম	প্লেন	২·৬৫ টাকা
	স্লাইস্‌ড	২·৭৫ টাকা

কেরোসিন তেল : মাথা পিছু বরাদ্দ বাড়ল

কলকাতা এবং বিধান নগর এলাকায় ১৯ নভেম্বর '৯০ সোমবার থেকে যে সপ্তাহ শুরু হয়েছে ঐ সপ্তাহে এবং পরিবর্তী সপ্তাহে রেশন কার্ডের মাধ্যমে দেয় কেরোসিন তেলের কোটা মাথা পিছু আধ লিটারের পরিবর্তে এক লিটার করা হয়েছে।

রাজ্য সরকার আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আগামী ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত প্রতি মাসের প্রথম এবং তৃতীয় সপ্তাহেও অনুরূপ ভাবে মাথাপিছু এক লিটার হিসাবে কেরোসিন তেল দেওয়া হবে। মাসের অন্যান্য সপ্তাহগুলিতে মাথা পিছু কেরোসিন তেলের কোটা যথারীতি আধ লিটারই থাকছে।

আনন্দ নিকেতন

গত ১৫ আগষ্ট '৯০ আনন্দ নিকেতন শিশু বিহারের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রীরা, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহযোগিতায় নাচ গানের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ফুলিয়ায় পথ পরিক্রমা করে। শিশুদের এই প্রাণোচ্ছল অনুষ্ঠান দেখতে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বহু লোকের ভিড় হয়।

শিক্ষণ শিবির

ফুলিয়া বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে "শিক্ষণ শিবির" ছবি আঁকার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে গত ১৫ আগষ্ট সকালে। ৪০ জন শিশুশিল্পী অংশ গ্রহণ করে। প্রদর্শিত ছবির মধ্যে প্রশান্ত পাল, দীপক বিশ্বাস, বিপুল পাল, সুলতা প্রামাণিক, কাকলি মজুমদার, দীপালি বসাক, সুব্রত দাস, সুমন ঘোষ প্রমুখর ছবি অনেকেরই ভাল লেগেছে। ফুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী বীণা সোম অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন।

শ্যামা মেলা

ফুলিয়ার উল্লেখযোগ্য শারদ মেলার অনুরূপ কালীপূজা উপলক্ষেও পরেশনাথপুর যুব সংঘের উদ্যোগে পরেশনাথপুরে শ্যামা মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে বেশ কয়েক বছর ধরে।

এবছরও গত ১৯/১০/৯০ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলা কমিটির সম্পাদক স্বপন প্রামাণিক জানাচ্ছেন ফুলিয়া উপনগরী এবং আশপাশ অঞ্চল থেকে প্রায় ৩০টি প্রতিমা মেলায় অংশ গ্রহণ করে। মেলায় লোক সমাগম ক্রমান্বয়েই বাড়ছে বলে উল্লেখ।

ধারাবাহিক রচনা

হোমিওপ্যাথি কি করতে পারে ?

ডাঃ হরিশঙ্কর কুণ্ডু ডি, এম, এস (ক্যাল);
পি ই, টি, এফ, ডব্লু, টি (ক্যাল)

আজ আসা যাক মায়েদের বোনেদের কথায়। যাঁরা আমাদের সমাজের আমাদের প্রজন্মের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, যাঁদের প্রতি ঈশ্বর অথবা কোন অদৃশ্য-শক্তির রয়েছে অসীম করুণা অথবা রয়েছে নিষ্ঠুর বিড়ম্বনা, যাঁদেরা অবদান কখনও সাধু কখনও অসাধু, হয়তো বা উনবিংশ শতাব্দীর স্টলওয়ার্টরা তাঁদেরই দান অথবা বিংশ শতাব্দীর জটিলতা তাঁদেরই অবদান—এই সমস্ত জটিল তত্ত্বের সন্ধান কোথায় ? বক্তব্য হচ্ছে ভগবতীদেবীকে বাদ দিলে তো পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অস্তিত্ব থাকে না।

শোনা যায় সুস্থ শরীর ও মন লাভ করতে হলে নাকি লক্ষ যোনী অতিক্রম করতে হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এর কারণ কি ? তবে বলাটা নিশ্চয় অত্যুক্তি হবে না যে সুস্থ শরীর আর মনের সংজ্ঞা হল যে মনের ষড়রিপু দুর্বল সেই মন আর তার ধারক শরীরটা। "Jelousy is our National Sin", যদি ঈর্ষাই আমাদের উন্নতির প্রতিবন্ধক হয় তাহলে এই ঈর্ষা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্যের উৎস কোথায় ?

আজ যে শিশু জন্মালো, আগামীকাল সে মা। তাহলে যে শিশু এখানে এলো 'Infantile uteress' নিয়ে সে কেমন করে ঐ গুরু-দায়িত্ব সম্পন্ন করবে ? তার কেনই বা এমনটা হলো ?

তা ছাড়া এখানে আসার সময়ও তো প্রচুর বাধা। চিকিৎসাশাস্ত্রের ভাষায় বলতে গেলে উল্লেখ করতে হয় **Breech Presentation, brow Presentation face Presentation** প্রভৃতির কথা।

বলতে হয় **abnormal pelvic, uterine inertia, placenta praevia** প্রভৃতির কথা। এখন প্রশ্ন হল এ সমস্ত স্থূল দৈহিক ঘটনাগুলোর কারণ এবং দূরীকরণের দায়-দায়িত্ব কাকে দেওয়া যায়?

যা হোক অনেক বাধা-বিপত্তি পার হয়ে শিশুটি এলো এখানে, সঙ্গে নিয়ে এলো কতকগুলো অবিকৃত অথবা বিকৃত ক্রোমোজোম, **D.N.A., R.N.A.**, রাইবোজোম, লাইসোজোম প্রভৃতি।

শিশুটি তো ক্রমে ক্রমে বড় হয়ে চললো। হরমোন, এন্‌জাইমগুলো অলস কিংবা নিরলস হয়ে কাজ করে চললো। এগিয়ে এলো কৈশোর, এলো যৌবন।

তাকে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরলো **Amenorrhoea, Mehorrnagia, Dysmenorrhoea, Metrorrhagia, Leueorrhoea** প্রভৃতি।

ধরা যাক আমেনোরিয়ার (**Amenorrhoea**) কথা। 'আ' কথার অর্থ 'না' আর 'মেনোরিয়া' কথার মানে ঋতু বা মাসিক। ঘটনা দু রকম ঘটতে পারে; একটা হচ্ছে রজস্রাব আদৌ হয়নি আর একটা হ'ল মিনার্কি থেকে মেনোপজের মধ্যে হঠাৎ মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় 'মিনার্কি' হ'ল মহিলার জীবনে প্রথম ঋতু দর্শন আর মেনোপজ হ'ল শেষ ঋতু বা মাসিক। এখন খুব স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন হতেই পারে ঋতু এভাবে বন্ধ হওয়ার কারণ কি? অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে সন্তান ধারণের

সময় এবং শিশুকে স্তনদানের সময় Lactation Period) ঋতুস্রাব স্বাভাবিক নিয়মেই বন্ধ থাকে। তাহলে এটা খুবই পরিস্কার যে Amenorrhoea টা পুরোপুরি Pathological অথবা Physiological নয়। এর কারণ প্রমাণ করতে গিয়ে দেখা যায় absence of uteres বা ovaries, uterine atrophy pelvic peritonities atr phy of ovaries, cystic degeneration, chlorosis, phthis, cirrhosis, Bright's disease প্রভৃতি জটিল অসুখগুলোর প্রভাব রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে nervous cause যেমন mental depression এবং এছাড়াও বিভিন্ন contitutional diseases এর কথা বলতেই হয়। 'সু-চিকিৎসা' কথার মূলগত অর্থ হ'ল রোগের কারণগুলোকে দূরীকরণ করা; তাহলেই রোগলক্ষণগুলো অপসারিত হবে এবং রোগীনিরা সুস্থ জীবন যাপন করবেন। হোমিওপ্যাথদের হাতে বেশ কিছু অস্ত্র-শস্ত্র আছে যেগুলোর সঠিক ব্যবহারে ঐ সমস্ত কারণগুলোকে অবশ্যই দূর-করা যায় অবশ্য চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতিটি শাখারই Limitation' আছে।

তবু এ'কথা খুব আস্থার সঙ্গেই বলতে পারা যায় যে হোমিওপ্যাথির কলাকৌশল অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে পারে ঐ সমস্ত মা বোনদের স্বাভাবিক সুস্থ জীবন।

সাহিত্য সৈকত-এর গ্রাহকদের অনুরোধ জানুয়ারী মাসে গ্রাহক চাঁদা পাঠিয়ে গ্রাহক নবীকরণ করুন।

SAHITYA SAIKAT
Oct-Dec 1990 Rs. 2·00
Regd. No. 42112/81 R N.I.

কৃত্তিবাসের ফুলিয়া জানে সর্বজন
টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের ধন

আমাদের গর্ব আমরা কৃত্তিবাস ভিটের মানুষ বলে। এই পরিচয় আমাদের গর্বিত করে।

আমাদের প্রত্যয় আমাদের নিজেদের কাছে। আমাদের আস্থা আমাদের সকল শিল্পী ভাইদের কাছে। আমরা বিশ্বাস করি কোন আন্তরিক আবেদন কোন নিষ্ঠা কোন পরিশ্রমই বৃথা যায়না। আমাদের প্রতিষ্ঠানের আজ যা চেহারা তা' পরিশ্রমেরই ফসল। ফুলিয়ার মানুষ তা নিজেদের চোখেই দেখেছেন।

আমাদের এই নিষ্ঠা আমাদের সব কাজেই। শাড়ীর বুননেও। তাই সত্যিকারের টেকসই টাঙ্গাইল, নতুনত্বে টাঙ্গাইল, প্রত্যাশা মাফিক টাঙ্গাইল শাড়ীটি পেতে হলে আমাদের কাছেই আসুন।—সমবায় সদন-এ

ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ি বয়ন শিল্প
সমবায় সমিতি লিঃ

টাঙ্গাইল তন্তুজীবি উন্নয়ন সমবায়
সমিতি লিঃ

(ফুলিয়া রেল স্টেশনের সন্নিকট)

ফুলিয়া, নদীয়া
দূরভাষ—ফুলিয়া ২২

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য ● প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য
সার্কুলেশন ম্যানেজার : গণেশ রায়
প্রকাশ স্থান : সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া, ৭৪১৪০২
মুদ্রণ : মায়া প্রেস, কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা (উঃ)

সংখ্যা, ২-৭, স্মারণীয়

সাহিত্য সেতু

বর্ষ ১০ □ সংখ্যা ২ □ জানুঃ-মার্চ ১৯৯১

এ সংখ্যার সূচি

সাহিত্য তীর্থ দর্শন	:	নবীনচন্দ্র সেন	৯
রামায়ণী কথা	:	কবিসুন্দর অমিয় পাল	১৩
নদীয়ার নীল বিদ্রোহ	:	রতন কুমার দাস	২২

প্রজাতন্ত্র দিবসের শপথ

স্বাধীনতার তেতাল্লিশ বছর পরেও আমাদের দেশের তেষট্টি শতাংশ মানুষ আজও নিরক্ষর।

এই বিরাট সংখ্যক মানুষকে নিরক্ষরতার অন্ধকারে রেখে আমাদের প্রজাতন্ত্রের স্বপ্ন কখনোই সফল হতে পারে না।

প্রজাতন্ত্র দিবসে আসুন দেশকে নিরক্ষরতা মুক্ত করার শপথ গ্রহণ করি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Advt. No. 27/90-91 D. I. O. Nadia

সাক্ষরতা/সেকত/জানুঃ-মার্চ '৯১ ১/২

নির্মল পরিবেশ
আমাদের জন্মগত অধিকা

Advt. No. 26/90-91 D.I.O.N

সংসদ-প্রকাশিত চিরায়ত গ্রন্থমালা

রমেন ভট্টাচার্যর

বাংলা বানানের নিয়ম ও অনিয়ম ১০·০০

দেবসেনাপতির

অর্থ জানো ২৫·০০

অশোক মুখোপাধ্যায়ের

সংসদ-ব্যাকরণ অভিধান ২৫·০০

সংসদ সমার্থ শব্দকোষ ৬০·০০

ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু সম্পাদিত

সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান ৭৫·০০

ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তর

তোহি মো দিবসাঃ ৪০·০০

হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ঠাকুরবাড়ীর কথা ২৫·০০

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের

বৈষ্ণব পদাবলী ৭৫·০০

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত ৪০·০০

শশিভূষণ দাশগুপ্তর

ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ৪৫·০০

□ **পরিবেশিত বই** □

বাদল সরকারের

নাবালুখ ৫০·০০

মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের

নাট্য সংকলন ৪৫·০০

ড. সুধাংশুবিমল বড়ুয়ার

রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি ২৫·০০

স্নিগ্ধা পালের

নৃত্ত নৃত্য নাট্য ৫০·০০

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলকাতা-৯

কলকাতার জন্মসন তারিখ নিয়ে বিতর্ক আছে। এ সব সত্ত্বেও কলকাতার তিনশ বছর বয়স হয়ে গেল। এই পুরাতন চিত্র ধরা পড়েছে শিল্পী টমাস, উইলিয়াম এবং ডানিয়েল খুড়ো ভাইপোদের আঁকা ছবিতে। তখন কলকাতা নামক গ্রামের ঘরে ঘরে তেল, ঘি এর প্রদীপ জ্বলত। পরে এল গ্যাসবাতি উন্নয়নের পথ ধরে। এই চিত্র আমূল বদলে গেছে। উনিশ শতকের শেষ ভাগে দার্জিলিং জেলার সিদ্রাবং পাহাড়ী গ্রামে আমরাই প্রথম বিদ্যুতের আলো জ্বালিয়েছিলাম। এখন বেশির ভাগ গ্রাম ও শহরের ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলে। চাষবাস, কলকারখানা, বিশ্বকাপ, ওয়ানডে ক্রিকেট, শারদ উৎসব সব কিছুরই বিরাট চাহিদা পূরণের জন্য আমাদের প্রয়োজন আপনার একটু সহানুভূতি।

জন জীবনে প্রত্যাশার প্রতীক

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

দশ বছরের

"সাহিত্য সৈকত"

(১৯৮১—১৯৯০)

হু ংগু পাওয়া যাচ্ছে হাফ রেক্সিন বোর্ড বাঁধাই, সীমিত সংখ্যা হু'হাজারের ওপর। দাম একশত কুড়ি টাকা। লাইব্রেরীগুলোর জন্যে একশত টাকায় দেওয়া হবে।

- নদীয়ার বর্তমান ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের কাছে এই সংকলন অপরিহার্য।

- বিশদ জানতে হলে পত্রিকা অফিসে যোগাযোগ করুন।

সাহিত্য সৈকত

সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া,

৭৪১৪০২

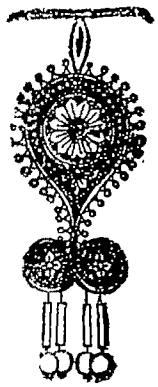

ফুলিয়ার
গহনা শিল্পে
সুপ্রতিষ্ঠিত
একটি নাম

এ. টি. জুয়েলার্স

এ. টি. জুয়েলার্সের

তৈরী গহনা পরুন।

উৎসবে অনুষ্ঠানে প্রিয়জনকে মনের মত গহনা উপহার দিতে হলে আসুন **এ. টি. জুয়েলার্সে**।

প্রো: শৈলেন্দ্র কুমার কর্মকার

ফুলিয়া রেলবাজার, বেলেমাঠ, নদীয়া

(মাছ বাজারের সন্নিকট)

বি: দ্র: প্রতি বুধবার পূর্ণ দিন বন্ধ।

সাহিত্য তীর্থ দর্শন

নবীন চন্দ্র সেন

রানাঘাট থানার অধীন বেলঘড়িয়া গ্রামে শিবিরে থাকিতে শুনিলাম, তাহার নিকটেই বঙ্গের ব্রাহ্মণেতিহাসে বিখ্যাত ফুলিয়া গ্রাম। ফুলিয়ার মুখুটিরা ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রচলিত কবিতায়—

"মুখটি কুলীন বড়, বন্দ্যঘটি সাদা।
সভার মধ্যে ব'সে আছে চট্ট হারামজাদা।"

ব্রাহ্মণদের গৌরবে গৌরবান্বিত সেই তীর্থ ভূমি ফুলিয়া দর্শন করিতে আমি অশ্বপৃষ্ঠে ছুটিলাম। কিন্তু গ্রামে পৌঁছিয়াই আমার মনে হইল—

"এই সে পলাশি ক্ষেত্র! এই সে প্রাঙ্গণ।"

স্থানটি দেখিয়া আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের আদিভূমি ফুলিয়ায় এখন ব্রাহ্মণের গন্ধমাত্র নাই। উহার অধিকাংশ বন ও মুসলমানের বাসস্থান। যেখানে ব্রাহ্মণের শাস্ত্রালাপ হইত, আজ সেখানে শিবাগর্জন। সরস্বতীদেবীর স্থান এখন চামুণ্ডা ম্যালেরিয়াদেবী গ্রহণ করিয়াছেন। হায়! বঙ্গদেশের কি বিপর্য্যয়ই ঘটিয়াছে! কেবল মুখুটদের পিতৃভূমি বলিয়া নহে, ফুলিয়ার 'কীর্ত্তিবাস'ই বাঙ্গালা রামায়ণের 'কীর্ত্তিবাস কৃত্তিবাস'। বাঙ্গালী রামায়ণ যাঁহাকে অমর করিয়াছে, যে রামায়ণ বাঙ্গালীর দ্বিতীয় প্রধান ধর্ম ও কাব্যগ্রন্থ, যাহার অমৃত পান করিয়া এই চারিশত বৎসর যাবৎ বঙ্গদেশের নর-নারী মানুষ হইয়াছে, যাহার অমৃতের স্থান বাঙ্গালার উগ্র 'নভেল' বিষ গ্রহণ করাতে আজ সেই বঙ্গদেশের নর-নারীর অধঃপতন ঘটাইতেছে,

সেই রামায়ণের ও তাহার প্রণেতার জন্মস্থান এই ফুলিয়া। ব্রাহ্মণ বংশের সঙ্গে কৃত্তিবাসের বংশ অন্তর্হিত হইয়াছে। বাঙ্গালা রামায়ণের ও তাহার রচয়িতা কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ভদ্রাসন বাটীর এখন চিহ্নমাত্র নাই। এখনও প্রবাদ এই দীর্ঘকাল পরেও সেই স্থানটির নির্দেশ বিস্মৃতির তামস গর্ভ হইতে রক্ষা করিয়াছে। এখনও যাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে কৃত্তিবাসের বাড়ীর স্থান দেখাইয়া দিবে। উহা এখন একজন দরিদ্র মুসলমান প্রজার বাঁশবন। তাহার কিঞ্চিৎ বাহিরে গঙ্গাতীরে একটা মাটির ঢিপি আছে। লোকেরা এই ঢিপিটিকে কৃত্তিবাসের দোলমঞ্চ বলিয়া এখনও দেখাইয়া দিয়া থাকে। কৃষকেরা তাহার চারিদিক চষিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু ঢিপিটি দেবপ্রসাদ স্বরূপ ভক্তিভরে রক্ষা করিয়াছে। দরিদ্র কৃত্তিবাসের ভদ্রাসন বাড়ীর ও দোলমঞ্চের এই ধ্বংসাবশিষ্ট দেখিয়া আমি ভাগীরথীর দিকে চাহিয়া কাঁদিয়াছিলাম হায়! মা বীণাপানি! সর্বত্রই কি এইরূপ! সর্বত্রই কি তুমি তোমার দরিদ্র পুত্রদের চিহ্নমাত্র রাখ নাই! এই দুইটি স্থান ক্রয় করিয়া এবং চিহ্নিত করিয়া রাখিবার জন্য আমি সহোদরসম বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ও বঙ্গবাসী'র সম্পাদক কার্য্যকুশল যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের কাছে পত্র লিখিলাম। স্মরণ হয়, কৃত্তিবাসের বাড়ীর স্থানে একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করিয়া, তাহাতে রাম সীতার মূর্তি স্থাপন করিতে আমি প্রস্তাব করিয়াছিলাম। তাঁহারা উভয়ে এই প্রস্তাব আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং 'বঙ্গবাসী' লীলাময়ী ভাষায় দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতেছিলেন। তাহার পর আমি বাণাঘাট ছাড়িয়া আসি। কার্য্য কি হইয়াছে জানিনা।

কৃত্তিবাসের গৃহের অদূরে আর একটি তীর্থস্থান আছে।

উহার নাম 'হরিদাসের পাট'। প্রবাদ ২২ বাজারে হরিদাস বেত্রাঘাত সহ্য করিয়া অচেতন অবস্থায় হরিনাম করিতে করিতে গঙ্গায় ভাসিয়া এই স্থানে লাগিয়াছিলেন। স্থানটি গঙ্গার তীরে। তাহার পর এখানে আশ্রম করিয়া বহু বৎসর তপস্যা করেন এবং দিনে লক্ষবার হরিনাম করেন। সাহিত্য সেবীদের অপেক্ষা ধর্মসেবীদের অদৃষ্ট ভাল হইবারই কথা। সাহিত্যানুরাগীদের অপেক্ষা ধর্মানুরাগীরা কৃতজ্ঞ। কৃত্তিবাসের জন্মস্থানে তাঁহার চিহ্নমাত্র নাই, কিন্তু 'হরিদাসের পাট' আজ পর্যন্ত বৈষ্ণবদের একটি পীঠস্থান। তাহা ত ভিখারী বৈরাগীরা একটা মন্দির নির্মাণ করিয়া রাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছে। পার্শ্বে বৈরাগীদের একটা 'আখড়া' কুটীর। তাহাতে বৈরাগীরা বাস করে এবং নিত্য হরিদাসের নাম কীর্ত্তন ও বিগ্রহের পূজা করে। প্রতি বৎসর এই পীঠস্থানে বৈরাগীদের একটা বৃহৎ মেলাও হইয়া থাকে। আমি এই পীঠস্থানও দর্শন করিলাম। এবং হরিদাসের সেই আদর্শ হরিভক্তি স্মরণ করিয়া, তাঁহার আশ্রমে অশ্রুবর্ষণ করিলাম। হরিদাস যেরূপ দরিদ্র ছিলেন, তাঁহার পীঠস্থানও তদ্রূপ দরিদ্র ভিক্ষাজীবি বৈরাগীদের কীর্ত্তি। যাহা কিছু আছে, সকলই দরিদ্র। কোনও ধনবানের কৃপাকটাক্ষ এস্থানের উপর পড়ে নাই। বাঙ্গালার ধনবানেরা এমন অমানুষ নহেন যে, কখনও পড়িবে। দরিদ্রের তপস্যার স্থানটি দরিদ্ররাই এতকাল রক্ষা করিয়াছে। দরিদ্র না হইলে দরিদ্রের দুঃখ, দরিদ্রের গৌরব কে বুঝিবে? খ্রীষ্ট এই জন্যইত বলিয়াছিলেন—"উষ্ট্র সূচিরন্ধ্রে প্রবেশ করিতে পারিবে, তাহাও সম্ভব, তথাপি ধনী স্বর্গে যাইতে পারিবেনা"। ঘোষপাড়ার রামশরণ পালও একজন দরিদ্র বৈরাগী ছিলেন মাত্র। তাহার প্রচারিত ধর্ম মুষ্টিমেয় লোকে গ্রহণ

করিয়াছে মাত্র অথচ তাঁহার জন্মস্থান তাঁহার দরিদ্র ভক্তেরা কি তীর্থস্থানে পরিণত করিয়াছে! আর কৃত্তিবাস! — কত কোটি কোটি লোক, কত শত সহস্র ধনী নরনারী কৃত্তিবাসের বাঙ্গালা রামায়ণ পড়িয়া ধর্মশিক্ষা করিয়াছে ও এখনও করিতেছে, আর তাঁহার জন্ম ও কর্মস্থানের এই দুরবস্থা!

নবীনচন্দ্র রচনাবলী

আমার জীবন (৪র্থ ভাগ) থেকে সংগৃহীত।

সম্পাদকীয় মন্তব্য: নবীনচন্দ্র যখন (১৮৮৪ খৃঃ) রানাঘাটের মহকুমা শাসক তখনই তিনি কৃত্তিবাসের ভিটেমাটি পরিদর্শনে আসেন এবং তার পরপরই এই রচনাটি লিখিত হয়েছিল। হিসেব করলে প্রায় একশ বছর আগের কথা। নবীনচন্দ্রের দেখা কৃত্তিবাস আজও তেমনি দরিদ্র কবি হয়েই আছেন। তবে বৎসরান্তে নিয়মিত কৃত্তিবাস স্মরণোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উদ্যোগ বেড়েছে স্থানীয় অনুরাগী মানুষের তা হলেও বলব স্বতস্ফূর্ততা মেলেনি। হরিদাসের পাট আজও আছে। মঞ্চ পাল্টেছে। কবি ঠিকই বলে গেছেন সাহিত্যানুরাগীর চাইতে ধর্মানুরাগীর আবেদন আজও বড় তাই মনে হয়।

মণীন্দ্র চন্দ্র দাস

চটকাতলা, ফুলিয়া, নদীয়া

উৎকৃষ্ট টাঙ্গাইল শাড়ীর প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

রামায়ণী কথা

কবিসুজন অমিয় পাল

ছেলেবেলা হ'তে আমি শুনি যার কথা—
রামায়ণ আর মহাভারত বারতা।
কত বর্ষ কেটে গেছে, তবু আজ তার
কী প্রবল আকর্ষণ! অমৃত সম্ভার।
আজ শুধু রামায়ণ-কথা উপহার
রামায়ণ কী দিয়েছে? স্মরি একবার।

চল্লিশ হাজার শ্লোক নিয়ে রামায়ণ।
রামের জীবন কথা আদরের ধন
প্রতিটি ভারতবাসীর। কেবা এই রাম?
পাপতাপ ঘুচে যায় লয়ে যাঁর নাম!
যে নামের মাহাত্ম্য চতুর্বেদ সমান
চতুর্বর্গ ফলপ্রদ-মধু অফুরাণ!

মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরাম ধরায়
দশরথ পুত্ররূপে অসীম ক্ষমায়!
ইক্ষবাকু বংশের রাজা দশরথ কাছে
দুর্বাসার পুরাবৃত্ত অজানা কি আছে?
দেবতা, অসুরে যবে করে বিতাড়িত—
ভৃগুপত্নী গৃহে হলো তারাই আশ্রিত।
সুদর্শন চক্র হ'তে ভৃগুজায়া মরে।
ভৃগু ঘরে ফিরে আসি অভিশাপ করে:
"তোমাকেও মানবের জন্ম হবে নিতে
সুদীর্ঘ স্ত্রী-বিরহ জ্বালাটি সহিতে।

দশরথ শব্দভেদী বাণে দক্ষ কত।
অন্ধমুনিপুত্র যবে জল নিতে রত—
এসেছে হরিণ বুঝি পান করিবারে
শব্দভেদী বাণে রাজা বধিল তাহারে।

মৃতপুত্র স্কন্ধে লয়ে মুনির সকাশে
উপনীত দশরথ। অভিশাপ আসে:
"তোমার জীবন যাবে তব পুত্রশোকে।"
পুত্রেষ্টি যজ্ঞটি পূর্ণ যবে মর্তলোকে
ফলশ্রুতি: চারপুত্র পান উপহার।
কৌশল্যার গর্ভে রাম, দুটি সুমিত্রার—
লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন নাম সে পরিচিতির।
ভরত ভূমিষ্ঠ হলো গর্ভে কৈকেয়ীর।

বিধির এমনি লীলা দশরথ সেই
আপন মৃত্যুর বাণ কৈকেয়ীর হাতেই
তুলে দিল। দুটি বর মাগিবে যখন।
রামচন্দ্র অভিষেক-বাঞ্ছিত লগন।
কৈকেয়ী চাহিল বর: রাম বনবাস
চতুর্দশ বর্ষ লাগি। প্রতিশ্রুতি-দাস
রাজা দশরথ: ভরতের সিংহাসনে
প্রাপ্তির বাধাটি দূর প্রতিজ্ঞা পালনে।
মন্থরা কুব্জীদাসীর কুচক্রীর জয়।
দশরথ স্ত্রৈন বলে অপবাদ রয়?
প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ বলে বরদান শেষে
দশরথ পরিত্যক্তা কৈকেয়ী নিমেষে।
ভরতও নাহি পাবে পিণ্ডে অধিকার
সত্যের শৃঙ্খলে লাঞ্ছিত বিবেক-কার?

পিতারে প্রণমি রামবনের পথেই...
একবার "রাম" ব'লে রাজা মূর্ছাতেই।
চেতনা এলনা ফিরে, কভু তাঁর আর!
ক্রৌঞ্চ মিথুনের শোক যেন পুনর্বার।
রামায়ণে ঘটনার অন্তরালে কত!
কথার আড়ালে ব্যথা রয় অবিরত।

সপ্তকাণ্ড রামায়ণ; 'আদি' পর্বপর
'অযোধ্যা' 'অরণ্য' আর রয়েছে 'সুন্দর'
কিষ্কিন্ধ্যা' 'লঙ্কা' 'উত্তর' শেষ-তিন রয়।
আছে মহাভারতে 'যতোধর্মস্ততো জয়া'।
আর রামায়ণে পাইবে 'জয় সত্যের'।
তবে কি ধর্ম ও সত্য পথটি ভিন্নের?
নহে, নহে, কভু নহে; উত্তরকাণ্ডেই
নির্দেশ রয়েছে সেথা প্রাপ্তি সহজেই:
'নাসৌ ধর্মো যত্র ন সত্যমস্তি' শ্লোকের।
রামায়ণ কবে লেখা? তৃতীয় শতের
খ্রীষ্টের জন্মের আগে, সংস্কৃতে রচনা
আদি কবি বাল্মীকির। মথিত বেদনা
শরবিদ্ধ ক্রৌঞ্চ হের সম্মুখে তাঁহার।
ক্রৌঞ্চীবিলাপ করুণ। বাল্মীকি মাথার
উপর হতেই বুঝি! ধনুক ও তীর
লয়ে ছুটে আসে ব্যাধ। গ্রহণে অস্থির
আপন শিকার নিতে। হয় তার প্রতি
"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম: শাশ্বতী:
সমা:" অভিশাপ বাক্য শ্লোকে উদ্গীতম্
"যৎক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকম বধী: কামমোহিম্।"

ব্রহ্মা আবির্ভূত হন সহসা তখন।
নারদ-শ্রীমুখে রাম মাহাত্ম্য শ্রবণ
তোমারি রচিত শ্লোকে জগতে বিদিত
করার দায়িত্ব আজ তোমাতে অর্পিত।
'সেই সত্য যা রচিবে তুমি'। বাল্মীকির
রোমঞ্চিত প্রতি সত্তা। যে-যোগদৃষ্টির
সম্মুখে উদ্ভাসিত শ্রীরাম-জীবন-
তার কিছু, কিছু অংশ করি উত্থাপন
যাচি এই আশীর্বাদ: তাঁহারি কৃপায়
জীবন উঠুক ভরি শ্রীরাম কথায়।
কতনা তপস্যা-ত্যাগ-প্রেম ও দুঃখের।
তারি মাঝে প্রতিষ্ঠিত রূপ কল্যাণের।

ভবনদী পার হতে রাম নাম সার
নামের মহিমা বুঝি অনন্ত অপার!
রামচরিত্র বিশ্লেষণ! বুদ্ধিতে তো নয়।
মন দিয়ে তাঁরে বোঝা অসাধ্য যে হয়।
মানবের রূপে রাম! সে তো সাধারণ।
রামরূপী নারায়ণ! কী অসাধারণ!
লঙ্কা জয়ে নিজ রাজ্যে যবে উপনীত—
কৈকেয়ী চরণে রাম প্রথম প্রণত।
যে-কৈকেয়ী হেয় রয় সকলের কাছে
দশরথ পরিত্যাজ্যা; কিবা গুণ আছে?
গর্ভবতী সতী স্ত্রীকে বনের নির্জনে
রাখার আদেশ দেন শ্রীরাম লক্ষ্মণে,
কী নিষ্ঠুর রাম তাঁর সুনামের তরে?
কী ধর্ম সাধিত হলো সীতা ত্যাগ করে?

লক্ষ্মণের মনে এই প্রশ্ন জেগেছিল
এ-যে ভবিতব্য। সুমন্ত্র উত্তর দিল।

বালীও শম্বুক বধ কলঙ্ক রামের?
বালীও প্রতীক সেই ভোগ জীবনের
অহংকারে মহাস্ফীত রাবণের মত।
ক্ষুদ্র ধর্মকে চাই বৃহতে অবনত
সেই বোধে উজ্জীবিত শ্রীরাম যখন—
অন্যায় অধর্ম তাঁরে স্পর্শে কি কখন?
সাত্ত্বিক চেতনা দিয়ে সমাজকে গড়া
রামের জীবন ব্রত চির আলো করা।
চেতনার ঊর্ধ্বায়ন কাম্য যে সদাই
শম্বুক অনধিকারী, নিহত যে তাই,
তপস্যায় বলবৃদ্ধি নিম্ন প্রকৃতির
আধার অশুদ্ধ হলে সে যোগশক্তির
অপপ্রয়োগই হবে, এ তো ধর্ম নয়।
স্বৈরিনী পশুশক্তির তাই বিপর্যয়।
ভরত চরিত্র হেরি গৌরবেই স্থিত
পরীক্ষাত্তীর্ণ ভরত মর্যাদা মণ্ডিত।
ত্যাগ দীপ্ত হে ভরত! মূর্তি তিতিক্ষার
তুমি আছ ঊর্ধ্বে সব প্রতিকূলতার।
শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের মনের সংশয়
সন্দিগ্ধ পিতার কাছে তব পরিচয়
আত্মসুখ পরায়ণা সে বাক্ চতুর
কৈকেয়ীর পুত্র তুমি। পেয়েছ নিষ্ঠুর
বিদ্রুপের তীক্ষ্ণ বাণ কৌশল্যার কাছে।
বিরূপ মনটি লয়ে প্রজাগণ আছে।

সব যেন বিধিলিপি। সর্বগুণান্বিত
নিজগৃহে পরবাসী ভাগ্য বিড়ম্বিত।
শ্রীরাম পাদুকা দুটি করি আনয়ন
সিংহাসন পরে যবে করিলে স্থাপন
জটাচীর পরি তুমি ফলাহার করি
প্রতীক্ষায় রত ছিলে চোদ্দ বর্ষ ধরি
সার্থক সৃষ্টি তুমি করি রাল্মীকির
তব নাম উচ্চারণে শ্রদ্ধানত শির।

মিথিলার জনক রাজার পণ:
হরধনু ভঙ্গ করা শক্তিটি অর্জন
প্রকাশ্যেই যে দেখাবে শুধু করে তার
বধূরূপে সীতাকেই দেবে উপহার।
অযোনিসম্ভবা সীতা-সীরধ্বজ কন্যা
শ্রীরামের ধর্মপত্নী সত্যই অনন্যা।
মিথি নাম হতে মিথিলা নামকরণ
মিথি—ধর্মাত্মা রাজা নিমিরই নন্দন।
মিথি-পুত্র 'জনক'। তাঁহারি নামেই
জনক বংশধর পরিচিতি পাবেই,
হ্রস্বরোমা—সীরধ্বজ জনকের পিতা।
যজ্ঞভূমির হলকর্ষণে যে-দুহিতা
উত্থিতা, হলের সীতা রেখায়—তাহার
নামটি সীতা রাখার যুক্তি পূর্ণতার।
ভাগ্যলিপি! হেরি জনম দুঃখিনী সীতা।
জনকের ভ্রাতৃকন্যা কেন উপেক্ষিতা
লক্ষ্মণ জায়া হয়ে? মাণ্ডবী ভরতের
কুশধ্বজ কন্যা শ্রুতকীর্তি শত্রুঘ্নের।

সহোদরা তিন বোন। অন্য পরিচয় ?
উর্মিলার গর্ভে লক্ষ্মণের পুত্রদ্বয়।
জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রী'অঙ্গদ' এই পরিচিতি।
কনিষ্ঠের 'শ্বেতকেতু' এই নামে ধৃতি।
'তক্ষ' ও 'পুষ্কল' দুই তনয়—ভরত
'সুবাহু' ও 'শত্রুঘাতী' শত্রুঘ্ন-আত্মজ।
সীতা হন সম্মুখীন তিন পরীক্ষায়
লঙ্কা বিজয়ের পর রামের ইচ্ছায়
অগ্নিতে প্রবেশ করি রাখে পরিচয়
অপাপবিদ্ধা হয়ে সীতা সতীসাধ্বী রয়।
অগ্নিদেব মূর্তি ধরি শ্রীরামে কথন :
চিরশুদ্ধা সীতাদেবী, কলঙ্ক মোচন !

প্রথম পরীক্ষা তাঁর—যখন লঙ্কায়।
দ্বিতীয় পরীক্ষা শুরু হলো অযোধ্যায়।
নিন্দা আর অপবাদ শুনি প্রজাদের
প্রজানুরঞ্জন রাম সীতায় ত্যাগের
আয়োজন পূর্ণ করি সৌমিত্রকে বলে :
তমসার তীরে সীতা রেখে এসো চলে,
নির্জন বনের ধারে কালই প্রভাতে।
সুমন্ত্রও রথ নিয়ে যাবে তব সাথে।
বাল্মীকির আশ্রমের প্রান্তদেশে আসি
লক্ষ্মণ সীতারে রাখি আঁখিজলে ভাসি,
কাতরে জানায় শুধু, 'তাঁর নির্বাসন'।
কেন রাম পরিত্যক্তা যবে মুনিগণ
শুধাবেন আমাকেই, কী দিব উত্তর ?
'রাজবংশের সন্তান রয় গর্ভে মোর।'

নতুবা, জাহ্নবী বক্ষে দিতাম এ-প্রাণ
অকাতরে বিসর্জন। বিধি তা না চান।
কুশলব যমজপুত্র রামচন্দ্রের
গায় শ্রীরাম গীতি। অশ্বমেধ যজ্ঞের
স্থলে রাজ দরবারে—যেথা স্বর্ণ সীতা
সম্মুখে দাঁড়ায়ে আছে। বাল্মীকি বারতাঃ
কুশ ও লবের পিতৃ পরিচয় দান
প্রকাশ্য সভায় আসি বাল্মীকি জানান।
পুনশ্চ শ্রীরামে তাঁর অনুরোধ রয়
সীতারে গ্রহণ করো, অসতী সে নয়।

পরদিন যজ্ঞ শেষে রামের নির্দেশ
সীতা আনয়ন তরে। একটি আদেশ:
জন সমক্ষে—সীতার এ-পরীক্ষা হোক
'এখনো অপাপবিদ্ধা'। প্রত্যয়-আলোক
প্রমাণিত হলে আমি গ্রহণে উন্মুখ।
তপস্বিনী সীতাদেবী হয়ে অধোমুখ
'পতিছাড়া অন্য কারে না করি চিন্তন
এইটুকু মহাসত্যে আমার জীবন
প্রতিষ্ঠিত যদি থাকে, নম্রকণ্ঠ বলে :
"হে ধরিত্রী, দ্বিধা হও, স্থান দাও কোলে।"

আসিল ভূতল হতে দিব্য সিংহাসন
সীতারে বসায়ে সেথা নম্র সম্ভাষণ
মহাব্যোম হতে শুরু পুষ্পবৃষ্টি কত!
শেষ দৃষ্টিটুকু জানকী বল্লভে নত।
ভূমিলক্ষ্মী সীতাদেবী-তিনি বসুন্ধরা
তমসার পারে যিনি ব্রহ্মপরাৎপরা।

পিতৃসত্য রক্ষা তরে রাম যায় বনে
সত্যের পরীক্ষা পুণঃ এবার কেমনে ?
ছদ্মবেশী মহাকাল ঋষিরূপ ধরে
শ্রীরাম সকাশে গুপ্ত কথনের তরে।
তার আগে রামচন্দ্র তাঁরে দেন কথা
তৃতীয় ব্যক্তিটি যদি শোনে সে বারতা—
তাহারে বধিতে হবে। দুয়ারে লক্ষ্মণ
পাহারায় রত থাকে। সহসা তখন
দুর্বাসার আগমন। সেই মুহূর্তেই
সংবাদ পাঠাতে হবে রামানুজকেই।
নতুবা সবংশে ধ্বংস শাপে দুর্বাসার।
তার চেয়ে মৃত্যুদণ্ড হয় হোক তার
এই ভাবি লক্ষ্মণের সেথায় প্রবেশ।
প্রতিজ্ঞার কথা স্মরি শ্রীরামের ক্লেশ।
সত্য রক্ষা করিবারে সৌমিত্র বর্জন
ত্যাগে হয় বধ করা বশিষ্ঠ-বচন।

সীতা রাম ও রাবণ কিসের প্রতীক ?
আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটুকু কতখানি ঠিক
বিচার করার আগে যদি ধরা যায়
দশানন দশেন্দ্রিয় দশদিকে ধায়।
ইন্দ্রিয়ের বশ যবে হয় এই মন
মনই সীতার রূপে বন্দিনী তখন।
তাহারি মুক্তিটি আনি রাখো সহস্রায়
জীবাত্মা মিলিতে চায় সে পরমাত্মায়।
শ্রীরামই পরমাত্মা রাখো, রাখো মনে
জীবের পরমা গতি তাঁরি আকর্ষণে।

নদীয়ার নীল বিদ্রোহ

রতন কুমার দাস

"নীল বানরে সোনার বাঙ্গালা কল্লে এবার ছারেখার
অনময়ে হরিশ মলো লণ্ডের হলো কারাগার।
প্রজার আর প্রাণ বাঁচানো ভার ॥"

এই কবিতাটি কেন লেখা হইয়াছিল তাহা জানিতে হইলে আমাদের দেড়শত বৎসর পিছনে যাইতে হইবে। নীল! যে নীল হইতে রং প্রস্তুত হয় তাহার বৈজ্ঞানিক নাম **Indigoferatinctoria.** নীলের আদি ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। প্রাচীন উদ্ভিদবিদ্যা বিশারদ পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ, আফ্রিকা এবং আরবদেশে ইহা বন্যাবস্থায় জন্মিত। ডি, কান্দোলি লিখিয়াছেন যে, সংস্কৃত কবিগণ যখন 'নীলি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তখন ইহা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের বৃক্ষ। নীল রং পৃথিবীর অনেক স্থানেই প্রচলিত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের বাণিজ্য আরম্ভ হইল, তখন এদেশ হইতে নীল প্রেরিত হইতে লাগিল। সেখানকার উদ্ভিজ্জাত-বর্ণের গাঢ়ত্ব সম্পাদনার্থে নীল মিশান হইত। ইউরোপের মধ্যে হলাণ্ড দেশের লোকেরা নীল রং করিতে সুদক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে এমন কি, ১৭শ শতাব্দীর প্রথমেও ইংরাজেরা রং করিবার জন্য তথায় কাপড় পাঠাইয়া দিত। ১৬৫১ সালে ওলন্দাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি কোম্পানি গঠিত হয় এবং হলাণ্ডে যথেষ্ট নীল আনীত হয়। এই নিমিত্ত অন্যান্য ব্যবসায়ীদের যথেষ্ট ক্ষতি হইতে লাগিল।

ফরাসীদেশের রঙের আয়ের উপর রাজার আয় নির্ভর করিত; এই নিমিত্ত রাজা ১৫৯৮ সালে তথায় নীল রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিলেন।

১৬০৯ সালে ৪র্থ হেন্‌রী আদেশ ঘোষণা করিলেন যে, যদি কেহ নীল রং ব্যবহার করে তবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। জার্ম্মানীতেও নীল ব্যবসা খর্ব্ব করিবার নিমিত্ত কঠোর আইনজারি হইয়াছিল। এই প্রকারে ইউরোপের সর্ব্বত্রই ওয়াড চাষের বিশেষ অবনতি হইতে দেখিয়া, নীল ব্যবহার বন্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছিল; কিন্তু কিছুতেই সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। অল্পদিনের মধ্যেই ভারতের নীল রঙ তথাকার চিরপ্রচলিত রঙের স্থান অধিকার করিল।

রাণী এলিজাবেথের সময়ে ১৫৮১ সালে নীল রং ও ওয়াড হইতে প্রস্তুত রং সমভাবে ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। পশমে ঈষৎ কালো রং দেওয়ার নিমিত্ত তখন নীল ব্যবহার হইত। তখনও তথায় ইহার নীল রং রূপে ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। অল্পকালের মধ্যে ইংল্যাণ্ডবাসীগণ নীল বিষাক্ত দ্রব্য বলিয়া আপত্তি করিলেন; অতএব ইহার ব্যবহার বন্ধ করা হইল। ১৬৬০ সাল পর্য্যন্ত এই আইন প্রচলিত ছিল। তাহার পর ২য় চার্লস্ বেলজিয়াম হইতে সুকৌশলী নীলকরদিগকে আনয়ন করিলেন। তাহারা ইংল্যাণ্ডের লোকদিগকে তদ্বিষয়ে শিক্ষা দান করিতে লাগিল। এদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সুরাট এবং বোম্বাই হইতে প্রচুর পরিমাণে নীল প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এই সমস্ত প্রাচীন বিবরণ মধ্যে বঙ্গ দেশজাত নীল সম্বন্ধে কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

কেহ কেহ বলেন যে, চন্দননগরে ফরাসীদের একটি

নীল কুঠি ছিল। এই কুঠি হইতেই ভারতবর্ষে নীল চাষের পুনরভ্যুদয় হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতেও ততোধিক উন্নতি হয় নাই। পরে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেখিল যে, নীলের জন্য ফরাসী ও স্পেনের উপনিবেশস্থ লোকের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে, তখন হইতে তাহারা বঙ্গদেশে নীলোৎপত্তির নিমিত্ত যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ইউরোপীয় বণিকগণ বাঙ্গালার নানাস্থানে আসিয়া কুঠি করিতে লাগিল। ক্রমশঃ ভারতবর্ষ হইতে এত উৎকৃষ্ট নীল উৎপন্ন হইতে লাগিল যে, ফ্রান্স ও স্পেনকে অতিক্রম করিয়া উচ্চস্থান গ্রহণ করিল। ১৭৯৫ সালে যশোরে ও নদীয়ায় প্রথমে নীলের চাষ আরম্ভ হইল।

প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কৃষকদিগকে দাদন দিয়া নীল চাষে উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। পরে যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, একার্য্যে বিলক্ষণ লাভ আছে, তখন (১৮০২ সালে) অগ্রিম টাকা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৮০৬ সালে কোম্পানি নগদ টাকায় নীল কিনিবার জন্য একটি কুঠি স্থাপিত করিলেন। প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে, ইউরোপবাসীদিগের উৎসাহেই প্রথমে এদেশে নীলের বিস্তৃত চাষ আরম্ভ হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে অর্দ্ধসের নীল আড়াই টাকা হইতে পাঁচ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইত।

রাজা রামমোহন রায় ১৮২৯ সালে নীল চাষ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন যে, নীলচাষ দ্বারা প্রজাসাধারণ উপকৃত হইতেছে। এরপর থেকেই ক্রমশঃ নীলকরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। নীলকর সাহেবগণ নীল পাতা উৎপাদনের জন্য নিজ আবাদ ও রাইয়তী আবাদ এই দুই প্রণালী অবলম্বন করেন। যে ভূমি নিজ আবাদে থাকিত, তাহার

কতকাংশ ভৃত্য দ্বারা আবাদ করাইতেন, ও কতকাংশ রাইয়ত দ্বারা আবাদ করিয়া লইতেন। রাইয়তী আবাদের বিবরণ এই যে প্রত্যেক রাইয়ত যে পরিমাণ ভূমি আবাদ করিবে, তাহাকে নীলকরেরা কিছু টাকা দাদন দিতেন ও একটি অঙ্গীকার পত্র লেখাইয়া লইতেন যে, এত পরিমাণ জমিতে নীল উৎপন্ন করিয়া দিব বলিয়া এত টাকা অগ্রিম লইতেছি। যদি দুরভিসন্ধি পূর্ব্বক অন্যথা করি, তবে আপনার যে ক্ষতি হইবে, তাহা আমিও আমার উত্তরাধিকারিগণ পূরণ করিতে বাধ্য।" প্রতি বিঘা দুই টাকা করিয়া দাদন দেওয়া হইত।

নদীয়া ও যশোহর জেলায় নীলকরদের অত্যাচার সব থেকে বেশী। নীলকর সাহেবদের দেওয়ান, নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি স্বদেশীয় ভৃত্যরা, প্রভুর অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া, আপনার ইষ্টসাধনে নীল চাষীদের প্রায় সর্ব্বস্ব হরণ করিতেন। সে সমস্ত নীলপাতা কুঠিতে আনিত হইত, কর্মচারীগণ কিছু না পাইলে ঠিকমত মাপ করিয়া লইতেন না। নীলপাতার হিসাবের সময় কিছু না দিলে ঠিক হিসাব করিতেন না। নীল চাষীরা নিজের ক্ষেতের বা বাড়ীর কোন দ্রব্য না দিলে তাহাদের ক্ষতির সীমা ছিল না। নরহত্যা, গোহত্যা, গৃহদাহ, বাড়ীভাঙ্গা সবই তারা করিতেন।

১৮৫০ সালে নদীয়া, যশোহর জেলায় বাড়িতে বাড়িতে এই অত্যাচার চরমে ওঠে। ১৮৫০ সাল হইতে ১৮৬০ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসর বাঙালায় নীলচাষ সম্পর্কে ভীষণ গোলযোগ দেখা দেয়। "হিন্দু পেট্রিয়ট"—এর সম্পাদক নীলচাষী দরদী হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইউরোপীয় সমাজ ও ইংরাজ-পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ

করেন এবং নীল চাষীদের দুঃখদুর্দশার কাহিনী শিক্ষিত জনসাধারণের গোচরে আনেন। এই সময় "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় অক্ষয় কুমার দত্ত নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী বিশদভাবে বর্ণনা করেন। নীলকরদের ঔদ্ধত্য এক সময় চরমে ওঠে। নীল চাষীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা রাশিয়ার 'সার্ফ' ও আমেরিকার নিগ্রোদাসদের সামিল হইয়াছিল।

উইলিয়াম হিকি তাঁর "স্মৃতি কথায়" যা বলেছেন— "এই সময় আমার এক বন্ধু ফ্রেডারিক মেটল্যাণ্ড আর্নট শোচনীয়ভাবে মারা যান। ১৭৭৭ সালে তিনি ক্যাডেট হয়ে একই জাহাজে আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে আসেন এবং পরে সেনাবিভাগে ক্যাপটেনের পদে উন্নীত হন। কিন্তু ক্যাপটেনের কাজ ছেড়ে দিয়ে টাকা রোজগারের আশায় তিনি নীলের (indigo) ব্যবসা করবেন ঠিক করেন। তার জন্য কৃষ্ণনগরে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেন। দেশীয় প্রথা অনুযায়ী তিনি চাষীদের টাকা দাদন দিয়ে নীলচাষ করাতেন। চাষীরা এবারে নাকি তাঁর কাছ থেকে দাদন খেয়ে চুক্তি অনুযায়ী তাঁকে গাছ সরবরাহ করেনি, অন্য কোন নীলকরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিক্রি করে দিয়েছে। চাষীদের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হয়ে আর্নট গ্রামে গিয়ে তাদের উপর চড়াও হন এবং দু-একজনকে টেনে-হেঁচড়ে ধরে আনার চেষ্টা করেন। আইনের প্রয়োগ আর্নট নিজেই করার জন্য উদ্যত হন, কিন্তু তা করতে গিয়ে ভীষণ বিপদে পড়ে যান। কয়েকশত চাষী দলবদ্ধ হয়ে বাঁশ লাঠি ইত্যাদি নিয়ে তাঁকে ঘেরাও করে এবং জবরদস্তির জবাব চায়। জবাব না পেয়ে তারাও অপরাধের বিচারক হয়

নিজেরা, এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়েই আর্নট সাহেবকে বাঁশপেটা করে ধরাশায়ী করে। এমনভাবে তাঁকে পেটানো হয় যে জড় পিণ্ডের মতন তিনি দলা পাকিয়ে যান। কাকুতি-মিনতি, অনুনয়-বিনয় সবই তাঁর ব্যর্থ হয়। ফাটা মাথা, হাড় গোড় ও পাঁজর-সুদ্ধ তাকে বাড়ীতে বয়ে আনা হয় এবং সেখানে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আশ্চর্য হল, এরকম একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কোন তদন্ত করা প্রয়োজন বোধ করলেন না গভর্ণমেণ্ট। বরং ইংরেজ মহলে বলাবলি হতে শুনেছি যে যে দোষ আর্নটের এবং দোষের উপযুক্ত দণ্ড তিনি পেয়েছেন। দু'জন চাষীকে তিনি নাকি আগে অত্যাচার করে মেরে ফেলেছিলেন। কাজেই চাষীদের হাতেই তাঁর মৃত্যু হওয়াতে তিনি বেঁচে গেছেন, তা না হলে বিচারে তাঁর দুষ্কৃতির জন্য আরও বেশী দুর্ভোগ তাঁকে ভুগতে হত।"

নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নীলচাষীর পক্ষ অবলম্বন করিয়া প্রথম সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন নদীয়া জেলার চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস। এই দুইজন নীল কুঠিয়ালের দেওয়ান ছিলেন। কিন্তু নীল করদের অত্যাচার ও নীলচাষীদের দুঃখ-দুর্দশা দেখিয়া তাঁহারা বিচলিত হইয়া পড়িলেন। বিষ্ণুচরণ ও দিগম্বর কাজে ইস্তফা দিয়া প্রজাদের পক্ষে নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় নীলের বিরুদ্ধে ছড়া ও গান রচনা করিয়া গ্রামে গ্রামে নীলচাষী-দের উত্তেজিত করিয়া তুলিতে লাগিল। নীলচাষীর পক্ষ হইয়া মোকদ্দমা, লড়াই, লাঠিয়াল পাঠাইয়া প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ প্রভৃতি ব্যাপারে তাহাদের অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়, তবুও

তাঁহারা বিন্দুমাত্র দমেন নাই। বাঙ্গালার নীলচাষীদের আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই দুইজনের নাম নীল কৃষাণবন্ধু হিসাবে অক্ষয়-অমর হইয়া থাকিবে।

"সংবাদপ্রভাকর" পত্রিকার ৩০শে ফাল্গুন ১২৬৬ সংখ্যায় "সম্পাদকীয়" স্তম্ভে যা লেখা হয়—"নদীয়া জেলায় রায়তদের সহিত নীলকরের ক্রমবর্দ্ধমান বিরোধের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি হওয়াতে প্রজাদের কষ্ট বাড়িয়াছে। কিন্তু নীলকরেরা বর্ধিত হারে মজুরি দেয় না। ইহার উপর যেসব প্রজারা দাদন লইয়াছে, তাহাদের অবস্থা আরো করুণ। প্রতিকারের কোন উপায় না থাকায় কোথাও কোথাও প্রজা ধর্মঘট হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। এই পত্রিকার ৬ই মাঘ ১২৬৬ সংখ্যায় 'সম্পাদকীয়' স্তম্ভে লেখা হয়—"নদীয়া জেলার নীলকরদের অকথ্য অত্যাচারের ফলে প্রজাদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে যে সরকারী কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যভাবে নীলকরদের পক্ষভুক্ত হইয়া এই অত্যাচারে সাহায্য করিতেছেন।" "সংবাদ প্রভাকর" পত্রিকার ২৫শে ফাল্গুন ১২৫৮ সংখ্যায় "সম্পাদকীয়" স্তম্ভে যা লেখা হয়—"জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেট নীলকর সাহেবদের পক্ষভুক্ত হইয়া প্রজাদের প্রতি সুবিচার না করায়, চার পাঁচশত কৃষক লাঙল কাঁধে করিয়া 'গবর্ণমেণ্ট হৌসে'র ও দেওয়ানী আদালতের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। সম্পাদকীয়তে কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হইয়াছে।"

নীল আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও 'হিন্দু পেট্রিয়টে' হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিয়া এই

অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জাগাইয়া তুলিতে থাকেন। বারাসত জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এই মর্ম্মে একটি পরোয়ানা জারী করেন যে, "নিজ জমিতে নীলচাষ করা কৃষকদের ইচ্ছাধীন, এই জন্য চাষীদের উপর জোর জুলুম করা বে-আইনী বলিয়া বিবেচিত হইবে।" এই ঘোষণায় আশান্বিত হইয়া ১৮৫৯ সালে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ নীলচাষী ধর্ম্মঘট করে। অন্য জায়গায় চাষ হইলেও নদীয়া ও যশোহর জেলাতেই নীলচাষ হইত সবচেয়ে বেশী। বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নীলচাষীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র শিশির কুমার ঘোষ এই ধর্মঘট পরিচালনায় বিশেষ অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। নীলচাষীদের এই ধর্মঘট বা জোট "নীলহাঙ্গামা নামে পরিচিত।

নীলচাষীদের এই ধর্মঘট কিরূপ ব্যাপক ও স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ছিল, তাহা ঐ সময়ের লেঃ গবর্ণর স্যার জন প্রিটার গ্রাণ্ট কমিশনে প্রদত্ত সাক্ষ্যে তাঁহার নিজস্ব মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"তিনি যশোহর, নদীয়া ও পাবনা জেলার মধ্যবর্ত্তী কুমার ও কালিগঙ্গার ষাট সত্তর মাইল নদীপথে ষ্টীমার যোগে অতিক্রম করেন তখন সহস্র সহস্র নরনারী ও শিশু এই দুই নদীর উভয় কূলে উপস্থিত হইয়া সমবেত কণ্ঠে তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা জানায় যে, নীলচাষ যেন তাহাদের দ্বারা আর করান না হয়।" এই দৃশ্য গ্রাণ্টের মনে গভীরভাবে রেখা-পাত করিয়াছিল। নীল কমিশনে সাক্ষ্যদান কালে "হিন্দু পেট্রিয়ট" সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় বলেন—"আমি এই নীল হাঙ্গামা বিশেষ যত্ন ও সতর্কতার সহিত পর্য্যা-লোচনা করিয়াছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বর্ত্তমান নীলচাষ

প্রজার অহিতকারী। আমি এই মত বহুবার প্রকাশ করিয়াছি।"

প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র ডাকবিভাগের পরিদর্শক ছিলেন। বিভিন্ন জেলায় অবস্থানকালে নীলকরদের বীভৎস অত্যাচারে লাঞ্ছিত দেশীয় নীলচাষীদের দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখেন। তাঁহার এই অভিজ্ঞতার ফল বিখ্যাত 'নীল দর্পন'। ১৮৬০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকা সহর হইতে 'কস্যচিৎ পথিকস্য' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। একটি মাত্র নাটকের পক্ষে জনসাধারণকে মাতাইয়া তুলিবার ব্যাপারে কি বিপুল শক্তি থাকিতে পারে 'নীলদর্পনে' তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজ মহলেও 'নীলদর্পনের' প্রচার প্রয়োজন— পাদ্রী জেম্‌স লঙ উহার ইংরাজী অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করেন। ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইতে দেখিয়া শুধু নীলকরগণ কেন, বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত ইংরাজগোষ্ঠীই ক্ষেপিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মুখপাত্র হিসাবে 'ইংলিশ-ম্যান' এর সম্পাদক ওয়ালটার ব্রেট জেম্‌স লঙের বিরুদ্ধে এক মামলা জুড়িয়া দিলেন এবং বিচারে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার মরডাণ্ট ওয়েলস্ কর্ত্তৃক এক মাসের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এতদ্ব্যতীত তাহার এক সহস্র মুদ্রা অর্থ দণ্ড হয় ১৮৬১ সালের ২৪শে জুলাই। জরিমানার টাকা স্বনাম ধন্য কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রদান করেন। এই অনুবাদ প্রচার করার জন্য 'সীটনকার' সাহেবও অপদস্থ হইয়াছিলেন। জেম্‌স লঙ 'নীলদর্পন' নাটকটি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দিয়া অনুবাদ করাইয়াছিলেন। এই কারণে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সরকারী কর্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত দীনবন্ধু-জীবনীতে "নীল দর্পণ" প্রসঙ্গ যাহা আছে—"উড়িষ্যা বিভাগ হইতে দীনবন্ধু নদীয়া বিভাগে প্রেরিত হয়েন এবং তথা হইতে ঢাকা বিভাগে গমন করেন। এই সময়ে নীলবিষয়ক গোলযোগ উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া নীলকরদিগের দৌরাত্ম্য বিশেষ-রূপে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে "নীল দর্পণ" প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় প্রজাদিগকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিলেন।

দীনবন্ধু বিলক্ষণ জানিতেন যে, তিনি যে নীল দর্পণের প্রণেতা, একথা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। যে সকল ইংরেজের অধীন হইয়া তিনি কর্ম করিতেন, তাহারা নীলকরের সুহৃদ। বিশেষ, পোষ্ট অফিসের কার্য্যে নীলকর প্রভৃতি অনেক ইংরেজের সংস্পর্শে সর্বদা আসিতে হয়। তাহারা শত্রুতা করিলে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারুক না পারুক সর্বদা উদ্বিগ্ন করিতে পারে; এ সকল জানিয়াও দীনবন্ধু নীল দর্পণ প্রচারে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। নীল-দর্পণে গ্রন্থকারের নাম ছিলনা বটে, কিন্তু গ্রন্থকারের নাম গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু অন্য কোন প্রকার যত্ন করেন নাই। নীল দর্পণ প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকেই কোন প্রকারে না কোন প্রকারে জানিয়াছিল যে, দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা।

দীনবন্ধু পরের দুঃখে নিতান্ত কাতর হইতেন, নীল দর্পণ এই গুণের ফল। তিনি বঙ্গদেশের প্রজাগণের দুঃখ সহৃদয়-তার সহিত সম্পূর্ণরূপে অনুভূত করিয়াছিলেন বলিয়াই নীল দর্পণ প্রণীত ও প্রচারিত হইয়াছিল। যে সকল মনুষ্য পরের দুঃখে কাতর হন, দীনবন্ধু তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন।

তাঁহার হৃদয়ের অসাধারণ গুণ এই ছিল যে, যাহার দুঃখ, সে যেরূপ কাতর হইত, দীনবন্ধু তদ্রূপ বা ততোধিক কাতর হইতেন। ....

নীল দর্পণ ইংরেজিতে অনুবাদিত হইয়া ইংলণ্ডে যায়। লং সাহেব তৎপ্রচারের জন্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারে দণ্ডনীয় হইয়া কারাবদ্ধ হয়েন। সীটনকার সাহেব তৎ-প্রচার জন্য অপদস্থ হইয়াছিলেন। এসকল বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন।

এই গ্রন্থের নিমিত্ত লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়াই হউক, অথবা ইহার কোন বিশেষ গুণ থাকার নিমিত্তই হউক, নীল দর্পণ ইউরোপের অনেক ভাষায় অনুবাদিত ও পঠিত হইয়াছিল। এই সৌভাগ্য বাঙ্গালায় আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই। গ্রন্থের সৌভাগ্য যতই হউক, কিন্তু যে যে ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় তাঁহারা সকলেই কিছু কিছু বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন, ইহার প্রচার করিয়া লং সাহেব কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন; সীটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়া-ছিলেন এবং শুনিয়াছি, শেষে তাঁহার জীবন নির্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরী পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা নিজে কারাবদ্ধকি কর্মচ্যুত হয়েন নাই বটে, কিন্তু তিনি ততোধিক বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। একদিন রাত্রে নীল দর্পণ লিখিতে লিখিতে দীনবন্ধু মেঘনা পার হইতেছিলেন। কূল হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে গেলে নৌকা হঠাৎ জলমগ্ন হইতে লাগিল। দাঁড়ি মাঝি সকলেই সন্তরণ আরম্ভ করিল; দীনবন্ধু তাহাতে অক্ষম। দীনবন্ধু

নীল দর্পণ হস্তে করিয়া জলমজ্জনোন্মুখ নৌকায় নিস্তব্ধে বসিয়া রহিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ একজন সন্তরণকারীর পদ মৃত্তিকা স্পর্শ করিবায় সে সকলকে ডাকিয়া বলিল, "ভয় নাই, এখানে জল অল্প, নিকটে অবশ্য চর আছে।" বাস্তব নিকটে চর ছিল, তথায় নৌকা আনীত হইয়া চরলগ্ন হইলে দীনবন্ধু উঠিয়া নৌকার ছাদের উপর বসিয়া রহিলেন। তখনও সেই আর্দ্র নীল দর্পণ তাঁহার হস্তে রহিয়াছে। এই সময় মেঘনায় ভাঁটা বহিতেছিল, সত্বরেই জোয়ার আসিয়া এই চর ডুবিয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে এই জলপূর্ণ ভগ্ন তরি ভাসিয়া যাইবে, তখন জীবনরক্ষার উপায় কি হইবে, এই ভাবনা দাঁড়ী, মাঝি সকলেই ভাবিতেছিল, দীনবন্ধুও ভাবিতেছিলেন। তখন রাত্রি গভীর, আবার ঘোর অন্ধকার, চারিদিকে বেগবতীর বিষম স্রোত-ধ্বনি, কুচিৎ মধ্যে নিশাচর পক্ষীদিগের চীৎকার। জীবন রক্ষার কোন উপায় না দেখিয়া দীনবন্ধু একেবারে নিরাশ্বাস হইতেছিলেন, এমত সময়ে দূরে দাঁড়ের শব্দ শুনা গেল। সকলেই উচ্চৈঃস্বরে পুনঃ পুনঃ ডাকিবায় দূরবর্তী নৌকা-রোহীরা উত্তর দিল, এবং সত্বরে আসিয়া দীনবন্ধু ও তৎসম-ভিব্যাহারীদিগের উদ্ধার করিল।..... প্রজাপীড়ন তিনি যেমন জানিয়াছিলেন, এমন আর কেহই জানিতেন না।— নীল দর্পণ বাঙ্গালার uncle Tom's cabin: "টম্ কাকার কুটীর" আমেরিকার কাফ্রিদিগের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে; নীল দর্পণ, নীল দাসদিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে।"

যে সকল মহাপ্রাণ এই নীল আন্দোলনকে শেষ পর্যন্ত সাফল্যের শিখরে উপনীত করেন তাঁহারা হইলেন—বিষ্ণুচরণ

বিশ্বাস, দিগম্বর বিশ্বাস, শিশির কুমার ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পাদ্রী জেমস্ লঙ ও দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি।

বাংলার অগণিত নীলচাষীর হৃদয়ে ইঁহারা লাভ করিয়াছিলেন দেবতার আসন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে বাংলাদেশে অত্যাচারী নীলকর সাহেবগণের হস্ত হইতে দরিদ্র অসহায় অগণিত সাধারণ মানুষের রক্ষাকল্পে এই মহাত্মা যে ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ইতিহাসে তাহা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

নদীয়ায় নীল বিদ্রোহের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। এই প্রসঙ্গে ঐ জেলায় তৎকালে নীলকরগণ কর্তৃক যে সকল নীলের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১) কল্লিপল ফ্যাক্টরী অব দি করগোদা কনসার্ন। মালিক চাষ, ডেভারীন। কলিকাতার এজেন্টের নাম ও ঠিকানা উইলিয়াম মোরান অ্যাণ্ড কোং ৩, চার্চ লেন (ওল্ড মিণ্ট মার্ট) মালিক—উইলিয়াম মোরান, এ, আর, মোরিনেট, এস, পি, গ্রিফিত, ই, সি, ক্রেসওয়েল। মহাজন—গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়।

২) কাটছিকট্টা কনসার্ন। মালিক—জাস, হিলস, সিনিয়র, জাস, হিলস, জুনিয়র। ম্যানেজার—জে, টি সেনডিই, সহকারী—আরচ হিলস্, কলিকাতার এজেন্টের নাম ও ঠিকানা—গিসবোর্ণ অ্যাণ্ড কোং, ২১/১, স্ট্যাণ্ড রোড, মালিক—জোন ডোগল, জর্জ ডোগল, জর্জ বার্টন, জেমস্ স্কট এলিয়ট, আলেকজাণ্ডার ওয়াকার, মহাজন—বুধন চাঁদ রায়।

৩) কাঠগড়া কনসার্ন। মালিক—বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোং। ম্যানেজার—আর, লারমুর, সহকারী মিষ্টার ক্লার্ক, কলিকাতার এজেন্টের নাম—বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোং, কলিকাতার ঠিকানা পাওয়া যায় নাই।

৪। কাঠালী। মালিকের নাম নেই, ম্যানেজার—জে. ডব্লু. স্মিথ, কলিকাতার এজেন্টের নাম ও ঠিকানা— উইলিয়াম মোরান অ্যাণ্ড কোং, ৩, চার্চ লেন (ওল্ড মিণ্ট মার্ট) মালিক—উইলিয়াম মোরান, এ, আর, মোরিনেট, এস. পি. গ্রিফিত, ই. সি. ক্রেসওয়েল, মহাজন—গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়।

৫) কানীনগর কনসার্ন। কারখানা—কানীনগর, ঝলসুকা, বালীপুর, মালিক—জ্ঞাস. হিলস, সিনিয়ব এবং জ্ঞাস. হিলস, জুনিয়র, ম্যানেজার—রবার্ট নিউকোমেন, কলিকাতার এজেন্টের নাম ও ঠিকানা গিসবোর্ণ অ্যাণ্ড কোং, ২১/১, স্ট্যাণ্ড রোড, মালিক—জোন ডোগল. জর্জ ডোগল, জর্জ বার্টন, জেমস স্কট এলিয়ট, আলেব-জাণ্ডার ওয়াকার, মহাজন—বুধন চাঁদ রায়।

৬) কাশীপুব ফ্যাক্টরী, মালিকের নাম নেই, ম্যানেজার—পি রায়সন, কলিকাতার এজেন্টের নাম ও ঠিকানা উইলিয়াম মোরান অ্যাণ্ড কোং, ৩, চার্চ লেন (ওল্ড মিণ্ট মার্ট), মালিক—উইলিয়াম মোরান এ, আর, মোরিনেট, এস. পি. গ্রিফিত, ই. সি. ক্রেসওয়েল, মহাজন—গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়।

৭) কুটোরিয়া কনসার্ন, মালিক—ই ডুবোইস ডে. শরণ, সি এ সউবোলে, জে. রোবসন, ম্যানেজার—ই ডুবোইস

ডে শরণ, কলিকাতার এজেন্টের নাম ও ঠিকানা— উইলিয়াম মোরান অ্যাণ্ড কোং, ৩, চার্চ লেন (ওল্ড মিণ্ট মার্ট) মালিক—উইলিয়াম মোরান, এ আর মোরিনেট, এস পি গ্রিফিত, ই সি ক্রেসওয়েল, মহাজন—পোপীনাথ মুখোপাধ্যায়।

৮) খালবোলিয়া কনসার্ন, মালিক—বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোং, ম্যানেজার—ই. রবার্টস্, সহকারী—মিষ্টার টুইডি, কলিকাতার এজেন্টের নাম—বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোং, ঠিকানা নেই।

৯) গোসাইন দুর্গাপুর, কনসার্ন, কারখানা—গোসাইন দুর্গাপুর, মালিক—জাস. হিলস, সিনিয়র, জাস. হিলস, জুনিয়র, ম্যানেজার—জে: সিসেনডিই, কলিকাতার এজেন্টের নাম ও ঠিকানা গিসবোর্ন অ্যাণ্ড কোং, ২১/১, স্ট্যাণ্ড রোড, মালিক—জোন ডে গল, জর্জ ডোগল, জর্জ বার্টন, জেমস স্কট এলিয়ট, আলেকজাণ্ডার ওয়াকার, মহাজন—বুধন চাঁদ রায়।

১০) জটরপুর কনসার্ন, কারখানা - জটরপুর, দুলালনগর, টুঙ্গী, মালিক—জাস. হিলস, সিনিয়র, জাস. হিলস, জুনিয়র, ম্যানেজার উইলিয়াম এম. স্মিথ, কলিকাতার এজেন্টের নাম ও ঠিকানা—গিসবোর্ণ অ্যাণ্ড কোং, ২১/১, স্ট্যাণ্ড রোড, মালিক—জোন ডোগল, জর্জ ডোগল, জর্জ বার্টন, জেমস স্কট এলিয়ট, আলেকজাণ্ডার ওয়াকার মহাজন—বুধন চাঁদ রায়।

১১) জেনারপুর, মালিক—এইচ. এ. পলসন, ম্যানেজার—এইচ. এ. পলসন, কলিকাতার এজেন্টের নাম ও ঠিকানা উইলিয়াম মোরান অ্যাণ্ড কোং, ৩, চার্চ লেন (ওল্ড

মিণ্ট মার্ট : মালিক উইলিয়াম মোরান, এ আর. মোরিনেট, এস. পি. গ্রিফিত, ই সি. ক্রেসওয়েল, মহাজন—গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়।

১২) দুর্গাধরপুর, মালিক ই. ব্রোডেরিক, ম্যানেজার—ই ব্রোডেরিক, কলিকাতার এজেণ্টের নাম ও ঠিকানা—গিসবোর্ণ অ্যাণ্ড কোং. ২১/১, স্ট্যাণ্ড রোড, মালিক—জোন ডোগল, জর্জ ডোগল, জর্জ বার্টন, জেমস স্কট এলিয়ট, আলেকজাণ্ডার ওয়াকার, মহাজন- বুধন চাঁদ রায়।

১৩) নন্দনপুর সদর কনসার্ন, কারখানা—নন্দনপুর, ইশুরপুর, চিৎকা, লালবাজার, মালিক—জাস. হিলস, সিনিয়র, ম্যানেজার—হুগ সিব্বাল্ড, কলিকাতার এজেণ্টের নাম ও ঠিকানা—আর, থমাস অ্যাণ্ড কোং, ২, মিশন রো, মালিক—আর. থমাস, রিচার্ড ডড, জে. পি. থমাস, টি. এম. রবিনসন।

১৪) নিশ্চিন্দীপুর সদর কনসার্ণ, কারখানা—নিশ্চিন্দীপুর, চেতলা, চুকুলিয়া, রাণীনগর, রুতুনপুর, জেটরপুর, মালিক—জাস. হিলস, সিনিয়র, জাস. হিলস, জুনিয়র, ম্যানেজার—জেমস ফরলং, জেমস হিল্স, কলিকাতার এজেণ্টের নাম ও ঠিকানা—গিসবোর্ণ অ্যাণ্ড কোং, ২১/১, স্ট্যাণ্ড রোড, মালিক—জোন ডোগল, জর্জ ডোগল, জর্জ বার্টন, জেমস স্কট এলিয়ট, আলেকজাণ্ডার ওয়াকার মহাজন—বুধন চাঁদ রায়।

১৫) নোয়াপাড়া ফ্যাক্টরী, মালিক—জোন হোয়াইট, সি.এ. সৌবোলে, জোন রবসন, ম্যানেজার—সি. আমেদি সৌবোলে, কলিকাতার এজেণ্টের নাম ও ঠিকানা--

উইলিয়াম মোরান অ্যাণ্ড কোং, ৩ চার্চ লেন (ওল্ড মিন্ট মার্ট) মালিক—উইলিয়াম মোরান, এ আর. মোরিমেট, এস. পি. গ্রিফিত, ই. সি. ক্রেসওয়েল, মহাজন - গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়।

১৬) পাইকপাড়া কনসার্ন, কারখানা পাইকপাড়া, মিঠুন, পোড়াহুযা সাউথ, মালিক—জাস. হিলস, সিনিয়র, জাস. হিলস, জুনিয়র, ম্যানেজার—জে. টিসেনডিই, সহকারী—আউগটে. সৌবোলে, কলিকাতার এজেন্টের নাম ও ঠিকানা—গিসবোর্ণ অ্যাণ্ড কোং, ২১/১, স্ট্যাণ্ড রোড, মালিক—জোন ডোগল, জর্জ ডোগল, জর্জ বার্টন, জেমস স্কট এলিয়ট, আলেকজাণ্ডার ওয়াকার, মহাজন—বুধন চাঁদ রায়।

১৭) পীরপুর কনসার্ন, কারখানা—পীরপুর দামুরহুদা, মালিক—জাস হিলস, সিনিয়র, জাস. হিলস, জুনিয়র. ম্যানেজার জাস. ফরলং, সহকারী—টি. টেলর, কলিকাতার এজেন্টের নাম ও ঠিকানা—গিসবোর্ণ অ্যাণ্ড কোং, ২১/১. স্ট্যাণ্ড রোড, মালিক—জোন. ডোগল, জর্জ ডোগল, জর্জ বার্টন, জেমস স্কট এলিয়ট, আলেকজাণ্ডার ওয়াকার, মহাজন—বুধন চাঁদ রায়।

১৮) বামুন্দি কনসার্ন, মালিক—সি. মারটিন, ম্যানেজার—জে. টি. বোয়ার্স, কলিকাতার এজেন্টের নাম ও ঠিকানা—আর. থমাস অ্যাণ্ড কোং, ২, মিশন রো, মালিক—আর. থমাস, রিচার্ড ডড, কে. পি. থমাস, টি. এম রবিনসন।

১৯) ধাবকিষ্টোপুর কনসার্ন, মালিক—ফ্রেড. ম্যাকলাগান, ম্যানেজার—জিও. ম্যাকগোয়ান, কলিকাতার এজেন্টের

নাম ও ঠিকানা—আর. থমাস অ্যাণ্ড কোং, ২, মিশন রো, মালিক—আর. থমাস, রিচার্ড ডড, জে. পি থমাস, টি এম, রবিনসন।

২০) মুলনাথ কনসার্ন, মালিক—বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোং। ম্যানেজার—আর, টি লারমুর, সহকারী মিষ্টার ক্লার্ক, এবং মিষ্টার ওয়ালার, কলিকাতার এজেণ্টের নাম—বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোং।

২১) মোইসগঞ্জ কনসার্ন, কারখানা—পানসিলা, শম্ভুনগর, সুত্রধর, মালিক—দোস সভি, কলিকাতার এজেণ্টের নাম ও ঠিকানা—উইলিয়াম মোরান অ্যাণ্ড কোং, ৩, চার্চ লেন (ওল্ড মিণ্ট মার্ট) মালিক—উইলিয়াম মোরান, এ, আর, মোরিনেট, এস. পি. গ্রিফিত, ই. সি. ক্রেসওয়েল, মহাজন—গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়।

২২) রুতনপুর কনসার্ন, কারখানা—রুতনপুর, বিদ্ধদপুর, আউনডোহো, মালিক—জাস. হিলস, সিনিয়র, জাস. হিলস, জুনিয়র, ম্যানেজার—জাস. ফবলং সহকারী—জাস গো স্মিত, কলিকাতার এজেণ্টের নাম ঠিকানা—গিসবোর্ণ অ্যাণ্ড কোং, ২১/১, স্ট্যাণ্ড রোড, মালিক—জোন ডোগল, জর্জ ডোগল, জর্জ বার্টন, জেমস স্কট এলিয়ট, আলেকজাণ্ডার ওয়াকার, মহাজন—বুধন চাঁদ রায়।

২৩) লোকনাথপুর কনসার্ন, মালিক—ফ্রেড ম্যাকলাগান, ম্যানেজার—আর পি সেগ, কলিকাতার এজেণ্টের নাম—বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোং, কলিকাতার ঠিকানা পাওয়া যায় নাই।

২৪) সদাগরপুর কনসার্ন, মালিক—কিষেণ চন্দ্র রায়, এই কোম্পানীর আর কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। একমাত্র বাঙালী কোং।

২৫) শিকারপুর কনসার্ন, মালিক—রবার্ট ওয়াটসন অ্যাণ্ড কোং, আর ওয়ার্টসন ', সহকারী—এণ্ড্রু স্কট, ম্যানেজার জাস. বারেল, সহকারী—ডব্লু ওয়াইট, জে. ডানবি, কলিকাতার এজেন্টের নাম ও ঠিকানা—জারডিন, স্কিনার অ্যাণ্ড কোং, ১৪, স্ট্যাণ্ড রোড, মালিক চার্লস বিনী স্কিনার, রবার্ট জারডিন, গ্রাহামমুর রবার্টসন, জর্জ ব্রাউন, ডাডলি রবার্ট স্মিত, মহাজন—ঈশান চন্দ্র বসু।

২৬) সেইজদা ফ্যাক্টরী, মালিক—রবার্ট ওয়াটসন অ্যাণ্ড কোং (আর. ওয়াটসন), সহকারী—এণ্ড্রু স্কট, ম্যানেজার—জাস বারেল, সহকারী—ডব্লু. ওয়াইট, জে. ডানবি, কলিকাতার এজেন্টের নাম ও ঠিকানা জারডিন, স্কিনার অ্যাণ্ড কোং, ১৪, স্ট্যাণ্ড রোড, মালিক—চার্লস বিনী স্কিনার, রবার্ট জারডিন, গ্রাহাম মুর রবার্টসন, জর্জ ব্রাউন, ডাডলী রবার্ট স্মিত, মহাজন ঈশান চন্দ্র বসু।

২৭ সোনাদা সদর কনসার্ন, কারখানা—সোনাদা, নাতি-পোতা, মালিক জাস. হিলস সিনিয়র, ম্যানেজার—উইলিয়াম ওগিলভি, সহকারী—এল লিওটার্ড, কলিকাতার এজেন্টের নাম ও ঠিকানা—আর, থমাস, অ্যাণ্ড কোং, ২, মিশন বো, মালিক—আর থমাস রিচার্ড ডড, জে. পি. থমাস, টি. এম. রবিনসন।

২৮) হারা সদর কনসার্ন, কারখানা—হারা, বীরপুর ফুলবাড়ী বর্গাতেহী, পটকাবাড়ী, মালিক—জেমস হিলস সিনিয়র, ম্যানেজার—এ ব্রোসমিচি, কলিকাতার এজেন্টের নাম ও ঠিকানা—আর থমাস অ্যাণ্ড কোং, ১, মিশন রো, মালিক আর থমাস, রিচার্ড ডড, জে পি থমাস, টি এম রবিনসন।

২৯) হাঁসখালি কনসার্ন, মালিক—জোন হোয়াইট এবং প্যাট্রিক স্মিত, ম্যানেজার ডব্লু ডব্লু স্মিত, কলিকাতার এজেন্টের নাম ও ঠিকানা—উইলিয়াম মোরান অ্যাণ্ড কোং, ৩, চার্চ লেন (ওল্ড মিণ্ট মার্ট), মালিক—উইলিয়াম মোরান, এ আর মোরিনেট, এস পি গ্রিফিত ই সি ক্রেসওয়েল, মহাজন—গোপীনাথ মুখোপাধ্যায়।

উপরিউক্ত এই নীল কারখানাগুলি অধিকাংশই ছিল কৃষ্ণনগরের কাছাকাছি।

সহায় গ্রন্থপঞ্জী—

ড: অসীমা চট্টোপাধ্যায়—ভারতীয় বনৌষধি

নগেন্দ্রনাথ বসু—বিশ্বকোষ

প্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্ত -নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—রচনাবলী

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—ভারত কোষ

বিনয় ঘোষ—সাময়িকপত্রে বাংলার সামাজিক চিত্র

—সুতানুটি সমাচার

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো: ও সজনীকান্ত দাস—সম্পাদক, নীল দর্পণ

সুকুমার রায়—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস

সুপ্রকাশ রায় ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম

সুবল চন্দ্র মিত্র—সরল বাঙ্গালা অভিধান

Kumud Bihari Basu—Indigo Planters and all about them

C.S I R. The Wealth of India

Haran Chandra Chakladar—Fifty years Ago

Benoy Ghosh—Selections from English Periodicals of 9th Century

Lalit Chandra Mitra—History of Indigo Disturbance in Bengal

Nirmal Sinha—Freedom Movement in Bengal who who

George Walt Dictionary of the Economic Products of India

A. G. Roussac—The New Calcutta Directory for the Town of Calcutta, Bengal, The North-West Provinces, Punjab, Arracan, Assam, Pegu, Tenasserim for 1 57.

"সাহিত্য সৈকত" এর গ্রাহকদের উদ্দেশে জানানো যাচ্ছে যে গ্রাহক চাঁদা পাঠিয়ে সহযোগিতা করুন।

শাড়ী কুঠির

প্রোঃ ননী গোপাল দাস

ফুলিয়া চটকাতলা, নদীয়া, ফোন ঃ ফুলিয়া-৩৯
কলকাতা বিক্রয় কেন্দ্র ঃ ফোন ঃ ৪২-৮৩৮৭

ফুলিয়া বাস স্ট্যাণ্ড থেকে ১ মিনিট আর রেল স্টেশন থেকে ৩ মিনিটের পথ। ৩৪নং জাতীয় সড়কের ওপরেই আমাদের শো-রুম।

অভিজাত টাঙ্গাইল শাড়ীর যাবতীয় ভ্যারাইটি পেতে হলে আসুন আমাদের শো-রুমে। আধুনিক ডিজাইনের বিপুল সম্ভার। বর্ষশেষের সুযোগ নিন।

রাজা ষ্টোর্স

প্রোঃ নিরঞ্জন পাল

ফুলিয়া রেলবাজার, ফুলিয়া, নদীয়া

এখানে সর্বপ্রকার স্টেশনারী সামগ্রী, প্রসাধনী, নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য কলকাতার দরে পাওয়া যায়।

অফিসের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তাঁতের সামগ্রী পাওয়া যায়

শিশু কন্যা জাতির ভবিষ্যৎ

১। শিশু কন্যা ও শিশু পুত্রের প্রতি সমান যত্ন নিন। উভয়েই জাতির ভবিষ্যৎ।

২। বাল্য বিবাহ একটি সামাজিক কু-প্রথা। ১৮ বৎসরের পূর্বে মেয়েদের এবং ২১ বৎসরের পূর্বে ছেলেদের বিবাহ দেওয়া আইনতঃ নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়।

৩। শিশু কন্যার প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া সমাজের কল্যাণের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

৪। শিশু পুত্রের মত শিশু কন্যারও স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও শিক্ষার প্রতি সমান যত্ন নিন।

শিশু কন্যাও শিশু পুত্রের মত সমান অধিকার ও যত্নের দাবীদার।

নদীয়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত

Advt, No. 25/90-91
dt. 14-2-90

SAHITYA SAIKAT
Jan-March 1991 Rs. 3·00
Regd. No. 42112/81 R.N.I.

কৃত্তিবাসের ফুলিয়া জানে সর্বজন
টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের ধন।

আমাদের গর্ব আমরা কৃত্তিবাস ভিটের মানুষ বলে। এই পরিচয় আমাদের গর্বিত করে।

আমাদের প্রত্যয় আমাদের নিজেদের কাছে। আমাদের আস্থা আমাদের সকল শিল্পী ভাইদের কাছে। আমরা বিশ্বাস করি কোন আন্তরিক আবেদন কোন নিষ্ঠা কোন পরিশ্রমই বৃথা যায়না। আমাদের প্রতিষ্ঠানের আজ যা চেহারা তা' পরিশ্রমেরই ফসল। ফুলিয়ার মানুষ তা নিজেদের চোখেই দেখেছেন।

আমাদের এই নিষ্ঠা আমাদের সব কাজেই। শাড়ীর বুননেও। তাই সত্যিকারের টেকসই টাঙ্গাইল, নতুনত্বে টাঙ্গাইল, প্রত্যাশা মাফিক টাঙ্গাইল শাড়ীটি পেতে হলে আমাদের কাছেই আসুন।—**সমবায় সদন-এ**

ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ি বয়ন শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

টাঙ্গাইল তন্তুজীবি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

(ফুলিয়া রেল স্টেশনের সন্নিকট)

ফুলিয়া, নদীয়া

দূরভাষ—ফুলিয়া ২২

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য ● প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য
সার্কুলেশন ম্যানেজার : গণেশ রায়
প্রকাশ স্থান : সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া, ৭৪১৪০২
মুদ্রণ : মায়া প্রেস, কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা (উঃ)

সাহিত্য সৈকত পত্রিকা সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল।

১। প্রকাশ স্থান : সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া

২। প্রকাশকাল : মাসিক (বর্তমান সংখ্যা থেকে)

৩। প্রকাশক ও মুদ্রাকর : শ্রীমতী কাকলি ভট্টাচার্য
সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া

৪। নাগরিক : ভারতীয়

৫। সম্পাদক : শ্রীমাধব ভট্টাচার্য (অবৈতনিক)
সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া

৬। নাগরিক : ভারতীয়

৭। স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতী কাকলি ভট্টাচার্য

৮। মুদ্রণ : মায়া প্রেস, কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা(উ:)

আমি শ্রীমতী কাকলি ভট্টাচার্য এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলো আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মত সত্য।

স্বা: কাকলি ভট্টাচার্য
প্রকাশক

তারিখ
১৫-৪-১৯৯১

নিয়মাবলী

১। "সাহিত্য সৈকত" বর্তমান সংখ্যা থেকে প্রতি ইংরেজী মাসের ১৫ তারিখ (মাসিক পত্রিকা হিসাবে) বেরুবে।

২। বছরে ১২টি সংখ্যার জন্য (পুজো সংখ্যা সমেত) গ্রাহক চাঁদা পঁচিশ টাকা।

৩। তরুণ লেখক-লেখিকারা কপি রেখে লেখা পাঠাবেন। নদীয়া জেলার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা প্রবন্ধ ও ফিচার অগ্রাধিকার পাবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA/ 33 /90/A

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তাঁর সমসাময়িক দেশকাল

হরপ্রসাদ মিত্র

পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের হাস্যময় তেজোময় স্বভাব, পিতা ঠাকুরদাসের কষ্ট সহিষ্ণু স্বাবলম্বী চরিত্রবল, পিতামহী দুর্গাদেবীর সন্তোষগুণ, জননী ভগবতী দেবীর সংস্কারের সংকীর্ণতা মুক্ত দয়াবৃত্তি যার ফলে নিজের এই পুত্রকে তিনি বলতে পেরেছিলেন—বছরে একদিন পূজা উপলক্ষে দু'-সাতশ টাকা অপব্যয় করার চেয়ে গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোকদের প্রতিদিন আহারের সংস্থান করা ভাল।

আন্তরিক ব্যক্তিগত আকর্ষণে দুঃখীর দুঃখ দূর করবার ঐকান্তিক চেষ্টাই ছিল বিদ্যাসাগরের স্বভাবধর্ম। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল সরকার, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন, শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, লালমোহন বিদ্যানিধি, রাজনারায়ণ বসু, ভগিনী নিবেদিতা, বিপিন বিহারী গুপ্ত, রজনীকান্ত গুপ্ত, ক্ষুদিরাম বসু, শশিভূষণ বসু, যতীন্দ্রমোহন ঘোষ, কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, বিপিনচন্দ্র পাল, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যেসব

অসংখ্য গুণগ্রাহী বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তথ্য পরিবেশন করেছেন, তাঁরা একবাক্যে এই তাঁর হৃদয়গুণের ওপর জোর দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের পত্তনের সময়ে দেশোদ্ধারের হুজুকের চেয়ে দারিদ্র্য দূর করবার প্রয়োজন য়-তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গটি অবশ্যই বিবেচ্য। রাজনীতি তাঁর পথ ছিল না,—কেন যে ছিলনা, সেকথা তিনি নিজেই বলে গেছেন। বিহারীলাল সরকারের বইয়ে তা পাওয়া যায়।

অন্নবস্ত্রের অভাব, জনসংখ্যা-বিস্ফোরণ, স্বাস্থ্যবিধির প্রতি উদাসীনতা, ব্যাপক শিক্ষাহীনতা, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা, নারীনির্যাতনের অবাধ অভ্যাস এবং শ্রেণীবৈষম্যের বিবিধ কুপ্রথা যে সামাজিক প্রগতির পরিপন্থী, একথা কে না জানেন? রাজনৈতিক পরাধীনতা দূর হলেই যে অকস্মাৎ রামরাজ্যের সূচনা সম্ভব নয়, ইতিমধ্যে অভিজ্ঞতাই তা আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। উনিশ শতকে বাঙালির ভাবজীবনে যে নবজাগরণ ঘটেছিল, সেইসব আশা আকাঙ্খার স্বপ্নাবেশ কালক্রমে ইতিহাসের নথীভুক্ত হয়েছে। প্রধানত সমাজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি অজস্র উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটেছিল উনিশ শতকে। ব্যক্তিজীবনে ও সমাজ জীবনে কোন্ কোন্ বাধাবিঘ্ন একক ও যৌথ বিতাড়নসাধ্য, সে প্রসঙ্গ এঁদের রচনায় যুক্তিবিচারের পথে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে। সামঞ্জস্য-সাধনের সমস্যাই যে মানব-জীবনের মূল সমস্যা, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ—এঁরা প্রত্যেকেই তা বলেছেন।

সৌষম্য, সুসংগতি, সমন্বয়পন্থা ইত্যাদি আদর্শ-সংকেত বারবার উচ্চারিত হয়েছে। ধর্মজীবনে আচার পালনের গোষ্ঠীবদ্ধতাকে 'অচলায়তন' বলে চিহ্নিত করাও এই শুভ প্রয়াসেরই নিদর্শন। জাতির কোনো দীর্ঘলালিত উচ্চ মননসম্পদও যদি বাস্তব ক্ষেত্রে জীবনবিমুখ বলে মনে হয়, তাহলে যথার্থ 'আধুনিক' মনোভঙ্গিই তাকে অগ্রাহ্য করে থাকে, যেমন ঘটেছিল রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথও এই আধুনিকতারই প্রবক্তা। এই তালিকায় আরো অনেকের নাম যোগ করা যায়, কিন্তু সে প্রয়াস বাহুল্য মাত্র।

বুদ্ধি-বিচারের প্রয়োগে মনের আলস্য ও জড়তা নির্মম ভাবে ত্যাগ করা চাই। এই 'আধুনিক' চেতনায় চিহ্নিত ছিল এঁদের ভাব-ভাবনা। উনিশ শতকের প্রথম দিকে রামমোহন একভাবে তা দেখিয়ে গেছেন, শতাব্দের শেষ দিকে রামকৃষ্ণদেব তাঁর শিষ্যদের মধ্যে আর একভাবে তা সঞ্চারিত ক'রেছেন—যার নমুনা আছে বিবেকানন্দের নানা রচনায়, ভাষণে, পত্রাবলীতে। বিশেষভাবে শতাব্দীর শেষ র্ধে নজর দিলে আমাদের সমাজে ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত পরিণত মানসিকতার লক্ষণীয় বিশেষত্বগুলি চিহ্নিত করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' বই হয়ে প্রথম বেরোয় ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৮২ সালে। ১৮৮১-৮২তেই বিবেকানন্দ প্রথম দক্ষিণেশ্বর যান রামকৃষ্ণদেবের দর্শন-কামনায়। কেশবচন্দ্র সেন তৎপূর্বেই ১৮৭৮-এ তাঁর 'নববিধান' ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন এবং সে ধর্মপথের নাম হয়েছে সমন্বয়ধর্ম বা 'রিলিজন অফ হার্মনি'। রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রথম প্রচার-

পরিচিতির সূচনা ঘটে তাঁরই উৎসাহে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় ১৮৭৫-এ। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পত্তন তার প্রায় দশ বছর পরের ঘটনা ১৮৮৫-তে। বিদ্যাসাগরের জীবনের শেষ পর্ব তখন।

উনিশ শতকের আরো অনেকের প্রসঙ্গ মনে আসা স্বাভাবিক। রামমোহনের (১৭৭২-১৮৩৫) প্রসঙ্গ তো বটেই, আরো অনেকের ভাবনাচিন্তা, পথ-সন্ধান, কর্মপ্রবর্তনা ইত্যাদি। সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রেই নতুন উদ্যম, সংস্কার, সৃষ্টির প্রাচুর্য ছিল তখন। দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫), বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১), মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-৯৪), দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩) বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩), দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-৯৮), বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)— এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন বিশেষভাবে উনিশ শতকেরই মানুষ বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ ঘটে ১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই। অতএব মোটামুটি আয়ুষ্কালের বিচারে একথা বলা অসংগত হবে না যে, উনিশ শতকের উত্তরকাল অর্থাৎ পরবর্তী ঘটনাধারা এঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় ধরা পড়বার কথা নয়। তবে ব্যতিক্রম এ ক্ষেত্রেও স্বীকার্য—যেমন বলা যায়, শূদ্র-জাগরণ, নারী জাগরণ, শিক্ষার আদর্শ-জিজ্ঞাসা ইত্যাদি বিষয়ে বিশ শতকের নানা সম্ভাবনা বিষয়ে বিবেকানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী চকমপ্রদ তো বটেই। পক্ষান্তরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯),

নবীনচন্দ্র সেন ১৮৪৭-১৯০৯, মীর মশার্‌রফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), অমৃতলাল বসু ১৮৫৩-১৯২৯), বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২), ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১-১৯০৭), রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯), রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩), শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২-১৯৫০), সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২), সরলাদেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫), শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮) এবং আরো অনেকেই উনিশ শতকে জন্মগ্রহণ করেও পরবর্তী বিশের শতকের অল্পবিস্তর বেশ কিছুকাল জীবিত ও সক্রিয় ছিলেন। তাঁরা পরবর্তী সমাজ পরিবর্তন অবশ্যই দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। বিদ্যাসাগরের বা বঙ্কিমচন্দ্রের যে সুযোগ ছিলনা। আবার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) এবং তাঁর মতন মেধাবী ও দীর্ঘজীবী যাঁরা, তাঁরা নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উনিশ শতকের চেয়ে বিশ শতকের জীবনতরঙ্গ ধারাই অনেক বেশি দেখেছেন।

১৩০১ সালের ভাদ্রের রচনা 'বিদ্যাসাগর চরিত' নিবন্ধে বিদ্যাসাগরের জীবনীতে অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই যে সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ তা সমুচিত জোর দিয়েই লেখেন। তিনি জানান,— তাঁর প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা, তিনিই বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী—'সমাজবন্ধন যেমন মনুষ্যত্ববিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক, ভাষাকে তেমনি কলাবন্ধনের দ্বারা সাহিত্য সৃষ্টির উপযোগী করে [তুলতে হয়;

বিদ্যাসাগর সরল, সমাসাড়ম্বরহীন, ধ্বনিসামঞ্জস্যময় বাংলা গদ্যরীতির স্রষ্টা। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতার হাত থেকে উদ্ধার করে বাংলা গদ্যকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী করে গেছেন তিনি। যথার্থ বিশ্বমানব সমাজের নিত্যবিধানের সঙ্গে সহজ যোগ ছিল তাঁর প্রতিভার। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর উভয়ের মধ্যে এদিকে নিকট সাদৃশ লক্ষ্য করেন রবীন্দ্রনাথ। পিতামহ রামজয় তর্কভূষণের হাস্যময় তেজোময় স্বভাব, পিতা ঠাকুরদাসের কষ্টসহিষ্ণু স্বাবলম্বী চরিত্রবল, পিতামহ দুর্গাদেবীর সন্তোষগুণ, জননী ভগবতী দেবীর সংস্কারের সংকীর্ণতামুক্ত দয়াবৃত্তি যার ফলে নিজের এই পুত্রকে তিনি বলতে পেরেছিলেন—বছরে একদিন পূজা উপলক্ষে ছ'সাতশ টাকা অপব্যয় করার চেয়ে গ্রামের দরিদ্র নিরুপায় লোকেদের প্রতিদিন আহারের সংস্থান করা ভাল। এই সংস্কারমুক্ত মনের গুণেই তাঁদের গ্রামের বাড়িতে নিমন্ত্রিত সিবিলিয়ন হ্যারিসন সাহেবকে আহারের সময়ে বহু সমাদরে আপ্যায়ন করেন ভগবতী দেবী। ১২৬৬ থেকে ১২৭২ সালের মধ্যে বিদ্যাসাগরের আনুকূল্যে যেসব বিধবা-বিবাহ ঘটে, সেইসব বিধবাকে ভগবতী দেবী বাড়িতে এনেছেন এবং "বিবাহিতা ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রীলোকের সহিত একত্র একপাত্রে ভোজন করতেন"। প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্যাসাগরের দুর্দম জেদের কথা তাঁর শিক্ষাজীবনে আত্মমর্যাদা রক্ষার নিত্যজাগ্রত প্রয়াস ও নির্ভীক ব্যক্তিত্ব, স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁর ভক্তি অন্যায় আয়করের তাড়না থেকে স্বল্প আয়ের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের রক্ষা করবার চেষ্টা ইত্যাদি তাঁর চরিত্রগুণের কথা সুপরিচিত। ১৯৬৯-এর ডিসেম্বরে 'করুণাসাগর বিদ্যাসাগর' নামে তাঁর সুবিশাল জীবনীতে শ্রীঅরবিন্দ গুহ

('ইন্দ্র মিত্র') নিপুণভাবে বিদ্যাসাগরের এইসব মহৎ গুণের কথা লিখেছেন। তাতে সমসাময়িকদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় সুস্পষ্ট। ঐ বইয়ে ১২৯১ সালের 'নবজীবন' পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় 'রসিক মোল্লা' ছদ্মনামে প্রকাশিত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে কয়েক ছত্র তুলে দেখানো হয়, তাতে বিদ্যাসাগরকে বলা হয়—"প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, দাতাকর্ণ দানে"—এবং "স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুল-কাঁটা, পারিজাত ঘ্রাণে।"

১৩০৫ সালের বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'মনের জীবন মননক্রিয়া এবং সেই জীবনেই মনুষ্যত্ব'—যোগবাশিষ্ঠের 'স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি' উক্তিটি শিবনাথ শাস্ত্রীর বিদ্যাসাগর-জীবনী সম্পর্কিত আলোচনায় ব্যবহৃত হতে দেখে তার আগে ১৩০২ সালের ভাদ্রের 'বিদ্যাসাগর-চরিত' নিবন্ধে তিনি জানান যে অনন্য-সুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্তে সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তিনি গতানুগতিক ছিলেন না, ছিলেন পারমার্থিক। রাজনীতির পথে নয়, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির পথে নয়, আধ্যাত্মিক প্রভাবে ও বলিষ্ঠ পৌরুষে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ এই তিন জনই। রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"আধুনিক ইংলণ্ডে বিদ্যাসাগরের ঠিক উপমা পাওয়া যায়না। কেবল জন্‌সনের সহিত কতকগুলি বিষয়ে তাঁহার অত্যন্ত সাদৃশ্য দেখিতে পাই। সে সাদৃশ্য বাহিরের কাজে ততটা নয়—কারণ, কাজে বিদ্যাসাগর জন্‌সন অপেক্ষা অনেক বড়ো ছিলেন, কিন্তু এই সাদৃশ্য অন্তরের সরল, সবল এবং অকৃত্রিম মনুষ্যত্বে।" লেস্‌লি স্টীফেনের এবং কার্লাইলের জন্‌সন—সম্পর্কিত দুটি পৃথক

রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশের বঙ্গানুবাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের মন্তব্যের সমর্থন অনুভব করেন বিদ্যাসাগর চরিত্রেও। তাঁর কথায় –"তিনি স্বতন্ত্র, সচেতন, পারমার্থিক ছিলেন। শেষ দিন পর্যন্ত তাঁহার জুতা তাঁহারই নিজের চটিজুতা ছিল। আমাদের কেবল আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল কেহ ছিল না; তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা, সরলতা, গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতিদিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদ্য সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই।"

কাঙ্খিত গন্তব্য

নারায়ণ চন্দ্র বসু

মাঝে মাঝে কাজের পর
কিছু কিছু কষ্টকর অনুভূতির হয় উদ্ভব।
সমস্যা, সমস্যা আর সমস্যা—
আর তা সমাধান করার জন্য চাই সামর্থ্য।
ভাবতে ভাবতে এক সময় শান্ত হতে হয়।
রাতের তারাদের দেখে দেখে
সব কিছু সুবিন্যস্ত হয়ে আসে।
ভোরের প্রথম সূর্যের আলো বলে—
সকল বাধা জয় করেই তো
আমরা বেঁচে আছি।
দুপুরের খররৌদ্র জানায় ইঙ্গিতে
সব কিছু সুন্দর থেকে সুন্দরতম হতে
দরকার শুধু ধৈর্য আর দরকার জীবন বোধ।
সন্ধ্যার স্বপ্নালু অন্ধকারের হাতছানির
একমাত্র নির্দেশ—
সম্মিলিত বিবেক ঘোড়াকে ছোটাও
আরও জোর কদমে।
তা হলেই নিশ্চিত পৌঁছে যাবে কাঙ্খিত গন্তব্যে।

নববর্ষ

কাকলি ভট্টাচার্য

পয়লা বৈশাখকে নববর্ষের উৎসব হিসাবে পালন করার রেওয়াজটা খুব প্রাচীন না হলেও নববর্ষ এই ব্যাপারটা যথেষ্ট প্রাচীন। কিছু-দিন আগেও আমাদের দেশে অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন ও নববর্ষের যে উৎসব পালিত হতো সম্ভবত মাঠ থেকে নতুন ফসল তোলার মধ্য দিয়েই এই অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটত। সম্বৎসরের খাদ্যই মানু-ষের জীবনে সুখ দুঃখের প্রধান সঙ্গী। তাই নবান্ন ও নববর্ষের উৎসবকে ঘিরে সারা বছরের শুভ ইঙ্গিতই বহন করে।

আমাদের জীবনে, বিশেষ করে বাংলা ভাষাভাষীদের জীবনে নববর্ষ আসে বছরে দু'বার। প্রথম নববর্ষ হাড় কাঁপানো শীতে জানুয়ারীর প্রথম প্রভাতে, দ্বিতীয় নববর্ষ বসন্ত শেষে পাতা ঝরার রুক্ষ দিনের সকালে পয়লা বৈশাখে।

নববর্ষ আসে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে ঋতুর সঙ্গে তাল মিলিয়ে। ঋতু চক্রের ঘূর্ণনে পৃথিবীর মাটিতে, মানুষের অঙ্ক কষা এই যে বর্ষ গণনা, তা স্থান কাল পাত্র ভেদে ভিন্ন সময় ও ভিন্ন আচারের।

নববর্ষ যেমন নতুনকে বরণ করার অনুষ্ঠান তেমনি প্রত্যাশারও অনুষ্ঠান। আমাদের দেশে নবান্নের সঙ্গে নববর্ষের একটা আত্মিক সম্পর্ক জড়িয়ে রয়েছে দেখা যায় সর্বত্রই। চাষীর ঘরে ফসল ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নবান্নের উৎসব শুরু হয়। বছরের দিন গণনার শুরুও সে সময় থেকেই। আগে বাংলা নববর্ষের প্রথম মাস ধরা হত অগ্রহায়ণ মাসকে। পয়লা অগ্রহায়ণ থেকে শুরু হত নতুন বছর। কৃষি প্রধান ভারতবর্ষে তখন অগ্রহায়ণই ছিল কৃষকের ঘরের ফসল ওঠা ও ঋণ শোধের প্রধান সময়।

অগ্রহায়ণের এই বর্ষ গণনা আজ আর নেই। এখনও অগ্রহায়ণে কৃষক মাঠ থেকে ঘরে ফসল তুলে আনেন কিন্তু মানুষের প্রয়োজনেই বর্ষ গণনা এখন অগ্রহায়ণ থেকে বৈশাখে সরে এসেছে।

পয়লা বৈশাখকে নববর্ষের উৎসব হিসাবে পালন করার রেওয়াজটা খুব প্রাচীন না হলেও নববর্ষ ব্যাপারটা যথেষ্ট প্রাচীন। আগেই বলেছি কিছুদিন আগেও আমাদের দেশে অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন ও নববর্ষের যে উৎসব পালিত হত সম্ভবত মাঠ থেকে নতুন ফসল ঘরে তোলার মধ্য দিয়েই এই অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটতো। সম্বৎসরের খাদ্যই মানুষের জীবনে সুখ দুঃখের প্রধান সঙ্গী। তাই নবান্ন ও নববর্ষের উৎসবকে ঘিরে সাড়া বছরের শুভ ইঙ্গিতই বহন করে। এখন মাটিতে ফসল ফলে বছর জুড়ে। নবান্নের

অনুষ্ঠানও উদযাপিত হয় বছর ভর। বছর গোনার শুভ দিনটিও মানুষের প্রয়োজনের তাগিদেই যে পাল্টে গেছে তা বুঝতে অসুবিধা হয়না।

এক সময় ফাল্গুনী পূর্ণিমার দোল উৎসবের উচ্ছল আনন্দকে ঘিরেও নতুন বছরের সূচনা হত। বাঙালীরা এখন পয়লা বৈশাখকে নববর্ষ হিসাবে পালন করলেও উত্তর ভারতের কোথাও কোথাও এখনও চৈত্র পূর্ণিমার দিনটি নববর্ষের প্রথম দিন হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে। কেরলে নববর্ষ বা ওনম উৎসব পালিত হয় ভাদ্র মাসে। নেপালে নববর্ষ শুরু হয় কার্তিক পূর্ণিমার পরদিন থেকে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে নববর্ষ আসে বিভিন্ন সময়ে।

বিদেশে নববর্ষের অনুষ্ঠান

বিদেশের অধিকাংশ দেশেই নববর্ষ পালিত হয় পয়লা জানুয়ারীতে। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ছেচল্লিশ বছর আগে জুলিয়াস সীজারই প্রথম রোম দেশে পয়লা জানুয়ারীকে নববর্ষ হিসাবে ঘোষণা করেন। ইউরোপের অন্যান্য জায়গায় তখন মার্চ মাসেই নববর্ষ পালিত হত। কোথাও কোথাও আবার যীশু খ্রীষ্টের ধর্মের প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বড়দিনেই নববর্ষের উৎসব পালিত হত। প্রায় চারশ বছর আগে কেবলমাত্র রাশিয়া ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য দেশে পয়লা জানুয়ারীতেই নববর্ষের উৎসব অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে। অবশ্য পরবর্তী কালে রাশিয়াতেও পয়লা জানুয়ারীতেই নববর্ষের উৎসব পালনের প্রচলন হয়। এইভাবে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ের নববর্ষের হিসাব

নিলে দেখা যায়, আসলে সামগ্রিকভাবে এই উৎসবের একটা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তা হল হেমন্তকালে কিম্বা বসন্ত ঋতুতে ফল ফুল শস্য নতুন ভাবে লাগানো বা ঘরে তোলা। এই ব্যাপারটাকে ঘিরেই যে উৎসব আনন্দ তাই দিয়েই নতুন বছরের হিসাব শুরু। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন ঋতুতে তা অবশ্য বদলে গেছে। তাই পয়লা জানুয়ারী বা পয়লা বৈশাখের উৎসব হাল আমলেরই বলা যায়।

পৃথিবীর সর্বত্রই কৃষি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্য থেকেই নবান্ন এবং নববর্ষ উৎসবের উৎপত্তি। কেউ কেউ পুরুষ এবং প্রকৃতির সঙ্গেও এর সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছেন। ফসল ও সন্তান এই দুই ধারা পারস্পরিক সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত। প্রাচীনকাল থেকে নারীকে প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করা হয়। উর্বরা প্রকৃতি যেমন শস্য দান করে মানুষের জীবন ধারাকে অক্ষুন্ন রাখে, নারীও সন্তানের জন্ম দিয়ে পৃথিবীকে সুন্দর স্বচ্ছন্দ করে তোলে। বংশধারার ঐতিহ্য বজায় রেখে আসছে সেই সৃষ্টির আদিকাল থেকে। বহু যুগ ধরে বহু আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি ও নারী উভয়ে একই ভূমিকা পালন করে আসছে একথা অনস্বীকার্য।

প্রাচীনকালের মদনোৎসব রূপান্তরিত হয়েছিল নবান্ন উৎসবে। নববর্ষ নবান্নরই নামান্তর বললে ভুল হবে না। নববর্ষের আগের দিন চৈত্র সংক্রান্তি। গাজন ও চড়কের উৎসব। সেদিন যে আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চড়কের খুঁটি পোঁতা হয় এর মধ্যেও নারী ও প্রকৃতির উর্বরা শক্তির প্রতীকই ধরা পড়ে। বাংলার গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ গৃহস্থ বাড়িতে ঐদিনে ঘর দোর পরিষ্কার করার রেওয়াজ আছে। বাড়ির উঠোন আঙ্গিনার সমস্ত আবর্জনা জড়

করে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। একে 'বুড়ির ঘর' বা 'মেড়ার ঘর' পোড়ান বলে। অর্থাৎ যা কিছু জীর্ণ, যা কিছু পুরনো তা' বিশেষ করে নববর্ষের প্রভাতে নতুনকে আবাহন করার এই হল রীতি। পুরনোকে বর্জন করে নতুনকে গ্রহণ করার প্রস্তুতি চলে বর্ষশেষের চৈত্র সংক্রান্তির বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ বৈশাখকে আহ্বান করেছেন এই ভাবে—

"এসো এসো এসো হে বৈশাখ
তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক
যাক পুরাতন স্মৃতি যাক ভুলে যাওয়া গীতি
অশ্রু বাষ্প সুদূরে মিলাক।"

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নববর্ষ

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে নববর্ষের ব্যাখ্যা ভিন্নতর। তাঁর উপলব্ধি অন্তর্মুখী। নববর্ষ সম্পর্কে তিনি বলেছেন—এই যে নববর্ষ আজ জগতের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে, একি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে পেরেছে? আমাদের জীবনে কি আজ নববর্ষ আরম্ভ হল?

এই যে বৈশাখের প্রথম প্রত্যুষটি আজ আকাশ প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালো কোথাও দরজাটি খোলারও কোন শব্দ পাওয়া গেলনা, আকাশ ভরা অন্ধকার একেবারে নিঃশব্দে অপসারিত হয়ে গেল, কুঁড়ি যেমন করে ফোটে আলোক তেমনি করে বিকশিত হয়ে উঠল, তার জন্য কোথাও কিছুমাত্র বেদনা বাজল না। নববৎসরের উষালোক কি এমন স্বভাবত এমন নিঃশব্দে আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হয়?

আর এক জায়গায় বলেছেন—নববর্ষ চির প্রবহমান নদীর মতো অবিশ্রাম চলেছে। একদিনের জন্যেও যে নববর্ষের নবীনত্ব ব্যাঘাত হয় না এবং সেই জন্যই প্রকৃতির মধ্যে নববর্ষের দিন বলে কোন একটা বিশেষ দিন নেই সেই নববর্ষকে মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারে না তাকে চিন্তা করে গ্রহণ করতে হয় বিশ্বের চির নবীনতাকে একটি বিশেষ দিনে বিশেষ করে চিহ্নিত করে তবে তাকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করতে হয়। তাই মানুষের পক্ষে নববর্ষকে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করা একটা কঠিন সাধনা। এ তার পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা নয়। মানুষের নববর্ষ আরামের নববর্ষ নয়, সে এমন শান্তির নববর্ষ নয়, পাখির গান তার গান নয়, অরুণের আলো তার আলো নয়, তার নববর্ষ সংগ্রাম করে আপন অধিকার লাভ করে। আবরণের পর আবরণকে ছিন্ন বিদীর্ণ করে তবে তার অভ্যুদয় ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ নববর্ষ খুঁজতে গিয়ে অনেকটা আত্মোপলব্ধির গভীরে ডুব দিয়েছেন। সাধারণ মানুষের কাছে নববর্ষ আসে আবীর হাতে খুশির হালকা হাওয়া ছড়িয়ে। সাধারণের কাছে নববর্ষ মানে আনন্দ, নববর্ষ মানে ছুটির দিন। খাওয়া দাওয়া আড্ডা, বিকেলে দোকানে হালখাতা।

শান্তিনিকেতনে নববর্ষের উৎসব

রবীন্দ্রনাথের এই আত্মোপলব্ধি শান্তিনিকেতনে তাঁরই ইচ্ছা ও প্রচেষ্টায় নববর্ষের উৎসব পালনে খুশির আনন্দই ছড়িয়েছে। তাইতো আম্রকুঞ্জের ছায়াবীথিতলে গাইতে শুনি—

নব আনন্দে জাগো আজি নব রবি কিরণে
শুভ্র সুন্দর প্রীতি-উজ্জ্বল নির্মল জীবনে।।
উৎসারিত নব জীবন নির্ঝর, উচ্ছ্বাসিত আশাগীতি,
অমৃত পুষ্প গন্ধ বহে আজি এই শান্তি পবনে।।"

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি এককালে ছিল বাংলা সংস্কৃতির পীঠস্থান। বাবা দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের আমলের নববর্ষ ও মাঘোৎসব অনুষ্ঠান রবীন্দ্রনাথ সযত্নে বয়ে এনেছিলেন শান্তিনিকেতনে। ওর সঙ্গে তিনি চৈত্র সংক্রান্তির অনুষ্ঠানটিও জুড়ে দিয়েছিলেন নিজের মত করে। রবীন্দ্রনাথের সময় শান্তিনিকেতন প্রাঙ্গণ সব সময় উৎসব মুখর হয়ে থাকতো। এখনও শান্তিনিকেতনে বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠানের শুরু নববর্ষের উৎসবকে ঘিরে। নববর্ষের দিনটিতে ভোর থেকেই ঘন্টা ধ্বনির শব্দে ছাত্রছাত্রী অধ্যাপকরা জেগে উঠেন। স্নানান্তে পোষাক পরে সবাই উপাসনা ঘরে গিয়ে পৌছান। উপাসনা শেষে প্রনাম ও আলিঙ্গন করার নিয়ম এখনও বজায় রয়েছে আগের মত।

শান্তিনিকেতনে নববর্ষের উপাসনা সঙ্গীতের মাধ্যমেই একক বা কোরাসে নিবেদিত হয়—

জয় হোক জয় হোক নব অরুণের জয় জয় জয়
পূর্ব দিগঞ্চল হোক জ্যোতির্ময়।

এ ছাড়াও—

প্রথম আলোর চরণধ্বনি উঠলো বেজে যেই
নীড় বিবাগী হৃদয় আমার উধাও হল সেই।

—এ রকম আরও কত প্রার্থনা সঙ্গীত।

আগে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালিত হত ২৫শে বৈশাখ তারিখেই। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা পরিবর্তন করেছিলেন শান্তিনিকেতনের গরমের কষ্টের কথা চিন্তা করে। সবচেয়ে মজার কথা ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে তাঁর জন্মদিনও ২৫শে বৈশাখের পরিবর্তে নববর্ষের অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিশে গেছে। তবে এ কেবল শান্তিনিকেতনেই।

উপাসনা শেষে সবাই বকুল বীথিতে মিলিত হন। সেখানে ফল মিষ্টি সরবৎ খাওয়া হলে আম্রকুঞ্জে এসে জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান শুরু হয়। এইভাবে পঁচিশে বৈশাখের অনুষ্ঠান নববর্ষের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

পুণ্যাহ হালখাতা

অতীতে বাংলায় নববর্ষ অনুষ্ঠানের এত রূপ লাবণ্য ছিলনা, ছিলনা তেমন কোন জৌলুস। এত উচ্ছলতাও ছিলনা মানুষের মনে। নববর্ষ এতটা আদরনীয় হয়ে ওঠেনি। তবে জমিদারের খাজাঞ্চিখানায় এই দিনটি গণেশ পুজোর মধ্য দিয়ে 'পুণ্যাহ' রূপে পালিত হত। পুণ্যাহের দিনে জমিদারের কাছারী বাড়িতে ফরাশ বিছানো গদিতে নায়েব মহাশয় তহবিলের খাতা নিয়ে বসতেন। প্রজারা সেদিন যথা সাধ্য সেজে গুজে কাছারী বাড়িতে উপস্থিত হয়ে সাধ্য মত ঋণ মেটাতেন। সেদিন জমিদার বাড়িতে প্রজাদের নিমন্ত্রণ থাকতো। পুণ্যাহের তহবিলে ঋণ পরিশোধ করে প্রজারা খেতে বসত। সম্ভ্রান্ত জমিদারগণ শুধু খাইয়েই বিদায় দেননি প্রজাদের নতুন বস্ত্রও দান করেছেন। প্রজারা ধার মেটানো ছাড়াও ক্ষেতের প্রিয় ফসলটি তুলে আনতেন জমিদারবাবুর জন্যে। এই পুণ্যাহ অনুষ্ঠানই, ক্রমে ক্রমে হালখাতায় রূপান্তরিত হয়েছে এখন।

p30714

জমিদারীর আমল উঠে গেছে অনেকদিন। এখন ব্যবসায়ীদের যুগ। নববর্ষের সকালে অনেক বাঙালী ব্যবসায়ীই গণেশ পুজো করে নিজ নিজ দোকানে বা কারখানায় হালখাতা করেন। নববর্ষের ছাপানো নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয় খদ্দের এবং প্রিয়জনদের কাছে। নববর্ষের দিনে খদ্দেররা আসেন, ধার মেটান। ধার না থাকলেও কার্ড পেলে দু'দশ টাকা জমা দিতে হয়। ব্যবসায়ী হাতে মিষ্টির প্যাকেট তুলে দেন।

নববর্ষের ভোর থেকেই ব্যবসায়ীরা যে যেখানে থাকেন কাছাকাছি কোন দেবতার মন্দিরে গিয়ে নতুন লাল খেরোখাতা দেবতার পায়ে ছুঁইয়ে সিঁদুর পরিয়ে আনেন। ফুল, সিদ্ধি এবং রূপো বা ধাতুর তৈরী টাকাতেও সিঁদুর মাখিয়ে আনা হয়। একেই বলে মহরৎ করা। মহরৎ কথাটি এসেছে মোহর থেকে আগে রূপোর টাকার পরিবর্তে জমিদারগণ মোহর রাঙিয়েই মহরৎ অনুষ্ঠান পালন করতেন। উত্তর ভারতে মহরৎ অনুষ্ঠান হয় দেওয়ালীর দিন। বাঙালী অনেক ব্যবসায়ীসম্প্রদায় অক্ষয় তৃতীয়া বা রাম নবমী দিনেও হালখাতার মহরৎ করেন। আর একটি মজার ব্যাপার হল যেহেতু নববর্ষের দিন গণেশ পুজোর প্রচলন হয়ে আসছে এবং তিনি সিদ্ধিদাতা গণেশ, অনেক ব্যবসায়ী নববর্ষের দিনে মন্দিরে যাবার সময় কিছু সিদ্ধিও নিয়ে যান।

মিষ্টি মুখের দিন

নববর্ষের দিনে মিষ্টিমুখ বা প্রিয়জনদের বিভিন্ন স্বাদের খাদ্য খাবারের যে আপ্যায়ন তা কেবলমাত্র আমাদের দেশেই নয়, বিদেশেরও বহু স্থানেই এই প্রথা প্রচলিত আছে।

চীন দেশেও পয়লা জানুয়ারীতে নববর্ষ উৎসব পালন করা হয়। এই উৎসব উপলক্ষে নানারকম সুখাদ্য তৈরী এবং প্রিয়জনদের মধ্যে বিলোন চীনা সমাজের রীতি। পরবাসীরা এই দিনে নানা ফুলে ঘর সাজান, সুখাদ্য খান, প্রতিবেশী প্রিয়জনদেরও আপ্যায়ন করেন। জাপানেও নববর্ষের দিনে ঘরের মেয়েরা নানারকম খাবার তৈরী করেন। অন্যান্য খাদ্য সামগ্রীর সঙ্গে দুটি বড় মাপের চালের পিঠে তৈরী করেন তারা। ঐ পিঠে দুটোর একটি মেয়ে এবং অন্যটি পুরুষ কল্পনা করে চাঁদ ও সূর্যের উদ্দেশে নিবেদন করেন। ফ্রান্সের মেয়েরা নববর্ষের দিনে তাদের কোমর বন্ধনীতে দুটি শস্যের পিঠে ঝুলিয়ে রাখেন।

মালয়ালীদের 'ওনম' বা নববর্ষের উৎসবে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যোগ দেন। তামিলদের নববর্ষ অনুষ্ঠানের নাম 'পোঙ্গল'। এঁদের উৎসবে ধর্মাচরণের চেয়েও সামাজিকতার মূল্য অনেক বেশি। বাঙালীর নববর্ষ ও আসামের 'রঙ্গালী বিহু' একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়। 'বিহু' অসমীয়াদের জাতীয় উৎসব। নাচ গানের মাধ্যমে অসমীয়ারা এই অনুষ্ঠানটি উদযাপন করেন পয়লা বৈশাখ।

ঘরে ঘরে আচার অনুষ্ঠান

নববর্ষ সাধারণ মানুষের ঘরেও আসে নতুন রূপে। গ্রামের কুমারী মেয়েরা কোথাও কোথাও নববর্ষের দিনে উপোস থেকে 'পুণ্যিপুকুর' ব্রত করে, ছড়া কাটে—এ সবই করা হয় সাংসারিক সুখের আশা আকাঙ্খায়। পয়লা বৈশাখের পুণ্যদিনে অনুষ্ঠানের অন্ত নেই বাঙালীর ঘরে। গ্রাম

বাংলার কোথাও কোথাও সেদিন ভগবতীর পুজো করে বর্ষাবরণ করা হয়। গোয়াল নিকিয়ে ধূপ ধুনো জ্বালিয়ে পুরোহিতের মন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে শুরু হয় নববর্ষের এই অনুষ্ঠান। গ্রামে তুলসী মঞ্চে মাটি দেওয়ার প্রথও এই নববর্ষের দিনে শুরু হয়। চলে সারা বৈশাখ মাস জুড়ে। আসলে এ সবই ধর্মপ্রাণ বাঙালীর জীবন ঘিরে পুজো পাঠ ধর্ম কর্মের মধ্য দিয়ে নতুন বছরটাকে আশা আকাঙ্খায় জড়িয়ে ধরার প্রয়াস মাত্র।

দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ মানুষের অভাব বোধ তো ঘোচার নয়। তবু বিলাস প্রিয় বাঙালী জাতি কোন শুভদিন বা অনুষ্ঠানকে ঘিরে কিছুটা বেহিসাবী হয়েই পড়েন দিনটাকে পালন করতে গিয়ে। ভাল মন্দ খাওয়া ছাড়াও রয়েছে নতুন পোষাক কেনা কাটার ব্যাপার। নতুন দিনে নতুন পোষাক পরার বেওয়াজ বাঙালী পরিবারে অনেকদিনের।

পয়লা জানুয়ারী আর পয়লা বৈশাখ

শুরুতেই উল্লেখ করেছি আমরা নববর্ষ উৎসব পালন করি বছরে দুবার। পয়লা জানুয়ারী ও পয়লা বৈশাখ। পয়লা জানুয়ারীর আনন্দ উচ্ছাস আমাদেরকে যতটা বাইরে টানে পয়লা বৈশাখ সে অর্থে ঘরোয়া—একান্তই নিজের। পয়লা বৈশাখের দিনটা যেন ঘরে থাকারই দিন। নিভৃতে বসে প্রিয়জনের কথা শোনার দিন। ভাললাগা গান নিজের কণ্ঠে গেয়ে শোনাবার দিন। হয়তো বা ঘরের কোণে আটকে থাকার জন্যে প্রকৃতির রুদ্ররোষ খানিকটা দায়ী। তবু বলব—এই-ই ভাল। আপন ঘরে থাকি সবারে লয়ে। আজকের দিনে নববর্ষের এই অনুষ্ঠান আমাদের সাংসারিক

জীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। নববর্ষের দিনে ছেলের হাত ধরে দোকানে গিয়ে হালখাতা করা এবং মিষ্টির প্যাকেট হাতে নিয়ে ফিরে আসা বুঝিয়ে দেয় নববর্ষও সামাজিক একটি অনুষ্ঠান। সামাজিক হলেও নববর্ষ উৎসব এখনও বারোয়ারী উৎসবের রূপ পায়নি। এই উৎসব এখনও মেলা হয়ে উঠতে পারেনি। বাংলা নববর্ষ এখনও গৃহস্থের পুজোর ঘর থেকে খাবার ঘর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

ভাল লাগার দিন

নববর্ষ আসে আবার চলেও যায়। আমরা তার আসার অপেক্ষায় প্রহর গুনি। তার প্রথম দিনের সূর্যোদয় দেখতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি। নববর্ষের প্রথম দিনটা আমরা আনন্দ মুখর করে তুলতে চাই গোটা বছরের দিনগুলোয়, অনুরূপ প্রত্যাশায়। মানুষ জানে সুখ দুঃখ নিয়েই তার জীবন। নববর্ষ আসে নববর্ষ চলে যায়। 'ফি' বছরের প্রত্যাশায় প্রাণের বীণার' তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুরণিত হয়ে ওঠে কবির সেই প্রিয় সুর —

'তোমায় নতুন করে পাবো বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ
ও মোর ভালোবাসার ধন।'

—★—

নতুন বই

"লহ প্রণাম" কবি অমিয়কুমার পালের কাব্যগ্রন্থ। নিছক কাব্য নয়। কাব্যের শরীরে সুরারূপ হয়েছে। কাব্যে শুধু কথার মালা হয়েই থাকেনি, কবির কলমে তা হয়ে ওঠেছে গান।

কবি অমিয়কুমার পালের লেখালেখির সঙ্গে কম বেশি আমরা পরিচিত। এর আগে তাঁর লেখা "মর্মতরঙ্গ" ও "পণ্ডিচেরী তীর্থ পরিক্রমা" পড়েছি। বর্তমান গ্রন্থটি ২৮টি গানের সংকলন। ভক্তপ্রাণ কবির চিত্ত মাতৃবন্দনায় আপ্লুত। তাঁর প্রথম গান ঋষি অরবিন্দকে স্মরণ করে। বইয়ের ভেতরকার শেষ গান "লহ প্রণাম" মায়ের উদ্দেশে। কবির মা জগতের মা। কল্যাণ রাগে "লহ প্রণাম" এর শেষ দুই লাইন—"হে প্রেরণাদাত্রী সর্ব সংসিদ্ধিদায়িনী
মাতঃ মীরা! লহ প্রণাম জগৎ জননী।"

চল্লিশ পৃষ্ঠার ছোট চটি বই এরই মধ্যে কবির আত্মোপলব্ধির ফসল থরে থরে সাজান। কোথাও তিনি বলেছেন—

মন তুই শিশু হয়ে/শুধু খেলা কর
আমার মায়ের এই/বিশ্ব খেলা ঘর।"

আবার অন্যত্র ব্যাকুল আকুতি—

"দেখা দাও মাগো দেখা দাও
আমার অন্তরে বসি যে সুর বাজাও
সেই সুরে সুরে কাছে টেনে নাও।"

প্রচ্ছদ সুন্দর। কিছু মুদ্রণ প্রমাদের ত্রুটি থাকলেও ছাপা ভাল। আমরা বইটির প্রচার প্রত্যাশা করি।

"ভোরের ডাক" দুই কবি অসিতকুমার সিংহ এবং তপন চক্রবর্তীর সম্মিলিত মোট ২৭টি কবিতার সংকলন। ছন্দ পতন তো আছেই অসংখ্য বানান ভুল কবিতা পড়ার ইচ্ছাটাই নষ্ট করে দেয়। উভয়কেই আরও সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। তুলনায় তপন চক্রবর্তীর আঞ্চলিক ভাষায় লেখা কবিতাগুলো ভাল লেগেছে।

"একুশ শতক" পত্র পত্রিকার জগতে নতুন সংযোজন। ছোট হলেও পরিচ্ছন্ন কাগজ। কবিতা লিখেছেন আলোক সরকার, পলাশ ভট্টাচার্য, হাসেম হাজরা, আবুল কালাম, সাদরে আলম প্রমুখ। পত্রিকাটির কাছে প্রত্যাশা রইল।

"অঙ্গীকার" ত্রৈমাসিক পত্রিকাটি নিয়ে আমরা ইতি-পূর্বেও কোন কোন সংখ্যায় আলোচনা করেছি। পত্রিকাটিতে সুরুচির ছাপ আছে। ৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যায় রোহিনীনাথ মণ্ডলের লেখা 'নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক পট-ভূমিকায় পটুয়া পাঁচালী' ও অসীম কুমার চট্টোপাধ্যায়ের আধুনিক কবিতা ও পাঠক সমাজ উল্লেখযোগ্য রচনা।

মহাপ্রস্থান—ছয় টাকা, অমিয় কুমার পাল,
প্রকাশক : কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপাত্র, বেলগাছিয়া ভিলা,
গৃহ: হাউসিং এস্টেট, ব্লক সি, ফ্ল্যাট ৮, কলকাতা—৩৭

ভোরের ডাক—দশ টাকা, অসিতকুমার সিংহ, তপন চক্রবর্তী
জনগণ প্রকাশনী : কেন্দুয়াডিহি, বাঁকুড়া।

একুশ শতক—তিন টাকা, সম্পাদক : সাদরে আলম
নূরপুর, পলাশন, বর্ধমান।

অঙ্গীকার : তিন টাকা, সম্পাদক : রামরঞ্জন রায়
কুশপাতা : ঘাটাল, মেদিনীপুর

মাধব ভট্টাচার্য

টুকরো খবর

আসাননগরে সম্প্রীতি অনুষ্ঠান :

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখকশিল্পীসংঘের নদীয়া জেলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে গত ১১ই এপ্রিল নীল বিদ্রোহ আন্দোলনের তীর্থভূমি আসাননগর গ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে মনোজ্ঞ আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আসাননগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রাণরঞ্জন সরকার। প্রধান বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের নদীয়া জেলা কমিটির সহ-সভাপতি বিশিষ্ট নদীয়া বেত্তা মোহিত রায়। লোককথার আলোকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র তুলে ধরেন তিনি। সভার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন নদীয়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বসু। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মাজদিয়া শাখার) শিল্পীরা গণসঙ্গীত ও 'কংকাল' নাটিকাটি পরিবেশন করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 'বনভূমি' পত্রিকা সম্পাদক শ্রীসত্যনারায়ণ মজুমদার। সবশেষে 'দৃষ্টিনন্দন ও শিক্ষামূলক পরিচয় সিনেমাটি প্রদর্শিত হয়।

বর্তমান সংখ্যা থেকে *সাহিত্য সৈকত* মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রতি বাংলা মাসের ১লা তারিখে প্রকাশিত হবে। পত্রিকার কাজ জানা একজন প্রুফ রিডার এবং ফুলিয়া এলাকায় দু'জন সেলসম্যান কমিশনের ভিত্তিতে নেওয়া হবে। পত্রিকা অফিসে যোগাযোগ করুন।

নববর্ষে আমাদের
শুভেচ্ছা গ্রহণ
করুন

এ. টি. জুয়েলার্স

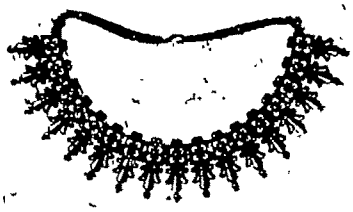

প্রোঃ শৈলেন্দ্র কুমার কর্মকার

ফুলিয়া রেলবাজার, বেলেমাঠ, নদীয়া
(মাছ বাজারের কাছে)

আমাদের বিশেষত্ব :

- কম সোনায় আধুনিক ডিজাইনের গহনা
- জড়োয়া অলংকার তৈরী
- গ্রহরত্নের সরবরাহকারী

ফুলিয়ার মানুষ যে কোন গহনার কথা ভাবলেই **এ. টি. জুয়েলার্সের** কথা ভাবেন।

বিঃ দ্রঃ—প্রতি বুধবার সম্পূর্ণ বন্ধ।

বর্ষ ১০ সংখ্যা ৩ ১৫ মে ১৯৬১
বৈশাখ ১৩৬৮

এ সংখ্যার সূচি

[illegible] : [illegible] ১
[illegible] : [illegible] ৩
[illegible] : [illegible] ৬
[illegible] : [illegible] ১১
[illegible] ( ) : [illegible] ১২
[illegible] ( ) : গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩
[illegible] ( ) : নারায়ণ চন্দ্র বসু ১৪
[illegible] ( ) : প্রণবেশ শর্মা ১৬
[illegible] ১৭

তরুণ লেখক লেখিকাদের প্রতি—

- "সাহিত্য সৈকত" মাসিক পত্রিকায় লেখা পাঠাতে হলে কপি রেখে পাঠাবেন।
- মৌলিক সৃজনধর্মী লেখাই প্রত্যাশিত। নদীয়া জেলার নানা বিষয়ের ওপর তথ্যমূলক প্রবন্ধ/ফিচার অগ্রাধিকার পাবে।
- বই ছাপতে আগ্রহী তরুণ লেখকগণ পাণ্ডুলিপি সহ সরাসরি পত্রিকার প্রকাশন বিভাগে যোগাযোগ করুন।
- 'সাহিত্য সৈকত' এর বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা পুজো এবং বিশেষ সংখ্যা সহ পঁচিশ টাকা।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি—

- ★ ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য সৈকত' এখন মাসিক।
- ★ 'সাহিত্য সৈকত' এ বিজ্ঞাপন দেওয়ার অর্থ আপনার বক্তব্য বা প্রতিষ্ঠানকে শুধুমাত্র বহু মানুষের মধ্যেই ছড়িয়ে দেওয়া নয় ভবিষ্যৎ কালের জন্যে সংরক্ষিত করাও।
- ★ আপনার বক্তব্য আমাদের প্রচার করার সুযোগ দিন।

দশ বছরের

'সাহিত্য সৈকত'

পাবেন হাফ রেক্সিন বাঁধাই দু'টো ভল্যুমে।

- ★ নদীয়ার ইতিহাস জানতে হলে এই সংগ্রহ অপরিহার্য।
- ★ দাম একশ' কুড়ি টাকা।

সাহিত্য সৈকত প্রকাশনীর

কাকলি ভট্টাচার্য-র

প্রথম কাব্যগ্রন্থ

এক আঁজলা সুখের খোঁজে

দাম : পাঁচ টাকা

পত্রিকা অফিসের ঠিকানায় পাবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রশিক্ষণের সুযোগ

অল্পব্যয়ে স্বগৃহে পছন্দমত মরশুমি ফল ও সব্জী সংরক্ষণ করুন এবং সম্বৎসর খাদ্য নতুনত্ব রাখুন। উপরোক্ত বিষয়ে **কৃষিজ বিপণন অধিকার পরিচালিত ২৫/১ ডি, এল, রায় রোড, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলা—নদীয়া** কেন্দ্রে বিনাব্যয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য কেবলমাত্র মহিলা প্রার্থী-দের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। আবেদন পত্র অবিলম্বে উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে জমা দিতে হইবে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ২½ মাস, নূন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতা—মাধ্যমক/উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল। বয়স— ১৮ বৎসরের উর্দ্ধে। আসন সংখ্যা ২০টি।

বিশদ বিবরণের জন্য উক্ত কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞাপন নং ৩/৯১-৯২ ডি, আই, এণ্ড সি, ও তাং ৩০-৪-৯১

রাজা ষ্টোর

প্রো: নিরঞ্জন পাল

ফুলিয়া রেলবাজার, ফুলিয়া, নদীয়া।

এখানে সর্বপ্রকার স্টেশনারী সামগ্রী, প্রসাধনী, নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্য কলকাতার দরে পাওয়া যায়। অফিসের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তাঁতের সামগ্রী সরবরাহ করে থাকি।

সাহিত্য সৈকত/জ্যৈষ্ঠ '৯৮/১৫ মে '৯১

মুখে ভাত
জন্মদিন
উপবয়ন
বিবাহ
প্রীতি অনুষ্ঠান বা
সামাজিক অনুষ্ঠানে

মনের মত উপহারে দিতে হলে আসুন আমাদের কাছে

এ. টি. জুয়েলার্সে

এ টি. জুয়েলার্সের গয়না আপনার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার প্রতীক।

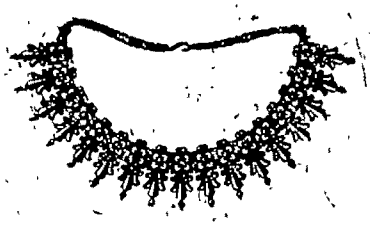

এ টি জুয়েলার্সের গয়না পরুন। আপনার ভবিষ্যৎ সঞ্চয়কে মজবুত করুন।

এ. টি. জুয়েলার্স

প্রোঃ শৈলেন্দ্র কুমার কর্মকার

ফুলিয়া রেলবাজার, (মাছ বাজারের সন্নিকটে) নদীয়া

বিঃ দ্রঃ প্রতি বুধবার দোকান সম্পূর্ণ বন্ধ।

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের অনুষ্ঠান

কাকলি ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের বিয়ের পর কবিপ্রিয়া মৃণালিনী একবার কোনও এক ২৫শে বৈশাখ কবির জন্মদিনকে স্মরণ করে তাঁকে একটি সোনার আংটি উপহার দিতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাতে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন—"ছি ছোট বউ পুরুষ মানুষদের কি সোনার গয়না পরতে আছে?"

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথম পালন করেন রবীন্দ্রনাথের আদরের ভাগ্নী স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোটমেয়ে সরলা দেবী, ১২৯৪ সালে ২৫শে বৈশাখ।

এবার আমরা রবীন্দ্রনাথের ১৩০তম জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালন করলাম। অবশ্য আনুষ্ঠানিক জন্মদিনের অনুষ্ঠান হিসেবে এবার তাঁর আশিতম জন্মোৎসব পালিত হল যতই দিন যাচ্ছে কবিগুরুর জন্মদিন পালনের নিত্য নতুন রীতিও ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর রূপ নিচ্ছে। ২৫শে বৈশা

এখন একটি বিশেষ জাতীয় উৎসব। এখন দেশে ছোট-
শিশু থেকে আরম্ভ করে যুবক বৃদ্ধ সবার মধ্যেই গান, নাটক, নৃত্য, আবৃত্তি ইত্যাদি ছোটো-বড় নানা রকম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সেই মহামানবকে স্মরণ করার প্রবণতা দিনে দিনে বাড়ছে।

রবীন্দ্রনাথের যখন বছর সাতেক বয়স (?) সে সময় তাঁর বড়দি সৌদামিনীদেবী ২২শে বৈশাখ প্রথম তাঁর জন্মদিন পালন করেছিলেন। সেদিন ছোট ছেলেকে জন্মদিনের অনুষ্ঠানের পিঁড়িতে বসা অবস্থায় দেখে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'সৌদামিনী রবির পিঁড়ির চারপাশে প্রদীপ জ্বালিয়ে দাও। আমার এই ছেলে একদিন জগৎ আলো করবে।' এই সামান্য কথা কটির মধ্যে কি বিরাট ব্যঞ্জনা লুকিয়ে ছিল আজ তা আমরা মর্মে মর্মে অনুভব করছি। পরবর্তীকালে সেই আলো দিশারী করে আমরা পথ হাঁটছি। হয়তো হাঁটবো অনন্তকাল। প্রতিপদে অন্তরে ও বাইরে অনুভব করছি সে আলোর প্রশান্ত দ্যুতি। আমরা ভারতবাসী ছাড়াও সারা পৃথিবীতে আমাদের আর একটা বড় পরিচয়—আমরা রবি ঠাকুরের দেশের লোক, একি কম গর্ব!

রবীন্দ্রনাথের বিয়ের পর কবিপ্রিয়া মৃণালিনী একবার কোন এক ২৫শে বৈশাখ তাঁর জন্মদিনকে স্মরণ করে তাঁকে একটি সোনার আংটি উপহার দিতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাতে আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন - "ছি ছোট বউ পুরুষ মানুষদের কি সোনার গয়না পরতে আছে?"

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথম পালন করেন রবীন্দ্রনাথের আদরের ভাগ্নী স্বর্ণকুমারী

দেবীর ছোটমেয়ে সরলাদেবী, ১২৯৪ সালে ২৫শে বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথ তখন ছাব্বিশ বছরের পরিপূর্ণ যুবক। সরলাদেবী চৌধুরাণীর নিজের আত্মকথা 'জীবনের ঝরাপাতা'য় এই জন্মদিন সম্পর্কে সুন্দরভাবে উল্লেখ করেছেন—"রবিমামার প্রথম জন্মদিন উৎসব আমি করাই। তখন মেজোমামা (সত্যেন্দ্রনাথ। ওজনতুনমামার (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) সঙ্গে তিনি ৪৯নং পার্কষ্ট্রীটে থাকেন। অতিভোরে উল্টোডিঙ্গির কাশিয়াবাগান বাড়ি থেকে পার্কষ্ট্রীটে নিঃশব্দে তাঁর ঘরে তাঁর বিছানার কাছে গিয়ে বাড়ির বকুল ফুলের নিজের হাতে গাঁথা মালা ও বাজার থেকে আনানো বেলফুলের মালার সঙ্গে অন্যান্য ফুল ও একজোড়া ধুতি চাদর তাঁর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করে তাঁকে জাগিয়ে দিলুম। তখন আর সবাই জেগে উঠলেন—পাশেই নতুন মামার ঘর। 'রবির জন্মদিন' বলে একটি সাড়া পড়ে গেল। সেই বছর থেকে পরিজনদের মধ্যে তাঁর জন্মদিন উৎসব আরম্ভ হল।" এই জন্মদিন উপলক্ষ্যে সরলাদেবীর দাদা জ্যোৎস্নানাথ তাঁকে সেবার উপহার দিয়েছিলেন—'দ্য পোয়েমস অব হাইনে'।

এইভাবে প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনের উৎসব কেবলমাত্র পারিবারিক উৎসব হিসেবেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৩১৭ সালে তাঁর উনপঞ্চাশতম জন্মদিনটি পালিত হয় শান্তিনিকেতন আশ্রমে শান্ত আম্রছায়ায়। এর উদ্যোক্তা ছিলেন কেবলমাত্র আশ্রমের অধ্যাপক ও ছাত্রবা। বাইরের আমন্ত্রিত কেউই ছিলেন না। সে অনুষ্ঠান ছিল অনাড়ম্বর আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ ঘরোয়া অনুষ্ঠান। তাই কবিগুরুর অভিভূত কবিচিত্ত অতীতের

পারিবারিক জন্মদিনের অনুষ্ঠানকে স্মরণ করে একাত্ম হয়ে উঠেছিল। সেদিন তাই সেই অনুষ্ঠানে তিনি স্মৃতিচারণ করে আশ্রমবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—"তখন আমার তরুণ বয়স। প্রভাত হতে না হতে প্রিয়জনেরা আমাকে কত আনন্দে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, 'আজ তোমার জন্মদিন'। আজ তোমরা যেমন ফুল তুলেছ, ঘর সাজিয়েছ সেই রকমই আয়োজন তখন হয়েছে। আত্মীয়দের সেই আনন্দ উৎসাহের মধ্যে মনুষ্যজন্মের একটি বিশেষ মূল্য সেইদিন অনুভব করতুম"।

এরপর ১৩১৮ সালে ২৫শে বৈশাখ কবিগুরুর পঞ্চাশতম জন্মদিনের উৎসব শুধু মাত্র শান্তিনিকেতনে আশ্রমিক পরিবেশে বা পারিবারিক অনুষ্ঠানের মধ্যেই আটকে রইল না, তা ছড়িয়ে পড়লো আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান রূপে সারাদেশে রবীন্দ্রানুরাগীদের মধ্যে। সেদিন শান্তিনিকেতনে আম্রকুঞ্জ সেজেছিল আপনার শোভায়। চারদিকে চারটি কলাগাছ পুঁতে পুণ্য কলসে আম-পল্লব আর মালা দিয়ে উৎসবমুখর হয়ে উঠেছিল সেই পবিত্র স্থানটি। সে অনুষ্ঠানে অজিত কুমার চক্রবর্তী পাঠ করেছিলেন বিখ্যাত প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথ'। কলকাতা ও অন্যান্য জায়গা থেকে বহু রবীন্দ্রভক্ত স্ত্রী-পুরুষ সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে শান্তা দেবী স্মৃতি চারনায় এই দিনটির কথা উল্লেখ করেছেন 'সেই প্রচণ্ড রোদে বোলপুরের ভুবনডাঙ্গার মত জলহীন প্রান্তরে জন্মোৎসবের নামে দলে দলে ছেলে বুড়ো গিয়ে হাজির'।

কবিগুরুর এই পঞ্চাশতম জন্মদিনটিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকেও জাতীয় উৎসব হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ছিলেন জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী,

স্যার গুরুদাস ব্যানার্জীর মত গুণিজনেরা। এই অনুষ্ঠানের প্রচণ্ড বিরোধিতা করেছিলেন রবীন্দ্র বিরোধী গোষ্ঠীর কিছু বিখ্যাত ব্যক্তি। তাঁদের অভিযোগ ছিল—কবিগুরুর এই পঞ্চাশতম জন্মদিনের সমারোহ তাঁর ইচ্ছানুসারেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এবং এই সম্পর্কে তাঁরা যথেষ্ট নিন্দা বিদ্রুপও করতে পিছপা হননি। এসব কথা রবীন্দ্রনাথের কানে এলে তিনি ব্যথিত চিত্তে ২৫শে বৈশাখ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা কবি রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীকে লিখেছিলেন—"আপনারা পরিষদ হইতে যে উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন একদল তাহার বিরুদ্ধে একখানি পত্র মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিতেছেন। তাহার মধ্যে আমার প্রতি যে কটাক্ষপাত আছে তাহা পড়িয়া বুঝলাম আমার চিরন্তন ভাগ্য পঞ্চাশিক জন্মোৎসবেও অবিচলিত আছেন। ভগবানের কৃপায় আমি সত্য মিথ্যা অনেক নিন্দা জীবনে বহন করিয়া আসিয়াছি। আজ আমার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হইবার মুখে এই আর একটি নিন্দা আমার জন্মদিনের উপহার স্বরূপ লাভ করিলাম এই যে, আমি আত্মসম্মানের জন্য লোলুপ হইয়াছি এবং অভিনন্দনের দায় হইতে পরিষদকে নিষ্কৃতি দান করা আমারই উপর নির্ভর করিতেছে। এই নিন্দাটিকেও নতশিরে গ্রহণ করিয়া আমার এক পঞ্চাশৎ বৎসরের জীবনকে আরম্ভ করিলাম, আর আপনারা আশীর্বাদ করিবেন, সকল অপমান সার্থক হয় যেন।"

অবশ্য অনুষ্ঠানের দিন সব অভিমান ভুলে কবিগুরু যথাসময়ে হাজির হয়েছিলেন টাউন হলের সেই উৎসবে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সেদিন আবৃত্তি করেছিলেন তাঁর নিজের লেখা বিখ্যাত কবিতা—'জগৎ কবি সভায় মোরা

তোমার করি গর্ব,/বাঙালী আজ গানের রাজা, বাঙালী নহে খর্ব।'

এরপর প্রতিবছর গুরুদেবের জন্মদিন পালিত হয়েছে যথারীতি মহাসমারোহে নিন্দুকদের সমালোচনার পরোয়া না করেই। কবির ষাট বছর বয়সেও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কবিকে সসম্মানে সংবর্ধনা জানিয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দেও সাড়ম্বরে পালিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সত্তরতম জন্মদিনটি। এই দিনে কলকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দিয়েছিলেন মেয়র বিধানচন্দ্র রায়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব পরিষদের পক্ষ থেকে জগদীশ চন্দ্র বসু। এই বিশেষ উৎসবকে ঘিরে প্রকাশিত হয়েছিল দেশ বিদেশের বিখ্যাত লোকদের লেখার সঙ্কলন—'দ্য গোল্ডেন বুক অব টেগোর'।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন বরাবর ২৫শে বৈশাখই পালিত হয়ে আসছিল কিন্তু শান্তিনিকেতনে প্রচণ্ড গরমের জন্য আশ্রমবাসী এবং ছাত্র-ছাত্রীদের কথা চিন্তা করেই রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর জন্মদিনের অনুষ্ঠানটিকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন। গুরুদেবের সে নিয়ম আজিও শান্তিনিকেতনে বর্তমান। অবশ্য ২৫শে বৈশাখেও যথারীতি জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালিত হয় সেখানে।

১২৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা বৈশাখ কবিগুরুর আশিতম এবং জীবদ্দশায় শেষ জন্মোৎসব পালিত হয় শান্তিনিকেতনে। এই দিনটির কথা উল্লেখ করে রাণী চন্দ লিখেছেন—'ভোর-বেলা কচি কলাপাতার ঠোঙায় কিছু বেল, জুঁই, কামিনী তুলে উদয়নের দক্ষিণ বারান্দায় গুরুদেবের হাতে দিয়ে তাঁকে

প্রনাম করলুম। আজ অনেক আগে থেকেই গুরুদেব বারান্দায় এসে বসেছেন, ফুলের ঠোঙাটি হাতে দিয়ে তা থেকে শুঁকতে শুঁকতে ধীরে ধীরে বললেন—"আজ আমার আশি বছর পূর্ণ হল। আজ দেখছি পেছন ফিরে- কত বোঝা যে জমা হয়েছে। বোঝা বেড়েই চলেছে।" তাঁর এই শেষ জন্মোৎসবে প্রথম গাওয়া হয়েছিল—"হে নূতন দেখা দিক আরবার।" এছাড়াও 'ওই মহামানব আসে' এই গানটিও সেদিন গাওয়া হয়েছিল।

এই মহাযোগী তাঁর জন্মদিনের সমারোহের পানে তাকিয়ে হয়তো সেদিন মনে মনে বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর উপস্থিতিতে সেই বোধ হয় শেষ জন্মদিনের উৎসব। তাই সেদিন আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে তাঁর শেষ জন্মদিনে লেখা কবিতাটি আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন সবাইকে—

"আমার এ জন্মদিন মাঝে আমি হারা
আমি চাহি বন্ধুজন যারা
তাহাদের হাতের পরশে
মর্ত্যের অন্তিম প্রীতিরসে
নিয়ে যাব জীবনের চরম প্রসাদ
নিয়ে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।
শূন্য ঝুলি আজিকে আমার;
দিয়েছি উজাড় করি
যাহা কিছু আছিল দিবার,
প্রতিদানে যদি কিছু পাই -
কিছু স্নেহ কিছু ক্ষমা—
তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই
পারের খেয়ায় যাব যবে
ভাষাহীন শেষের উৎসবে।"□

পয়লা বৈশাখও রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন

আমাদের চেনা আকাশে পঁচিশে বৈশাখের সূর্য ওঠে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনকে স্মরণ করে। এই দিনে ঘটা করে দেশে বিদেশে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয়। জন্মদিনের এই অনুষ্ঠান শুরুর একটা ইতিহাস আছে। রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী অর্থাৎ স্বর্ণকুমারী দেবীর মেয়ে সরলা দেবী যিনি পরিণত বয়সে বিখ্যাত সাহিত্যিকের খ্যাতি পেয়েছিলেন, সেই সরলা যখন ছোট্ট মেয়েটি একবার ২৫শে বৈশাখের সকালে পার্কষ্ট্রীটের ঠাকুরবাড়িতে ফুল চন্দন আর মালা হাতে নিয়ে রবি মামার ঘরে ঢুকে পড়লেন। ঘরে ঢুকে দেখেন রবিমামা তখনও ঘুমুচ্ছেন। ডেকে তুললেন মামাকে। মামার গলায় পরিয়ে দিলেন ফুলের মালা। কপালে দিলেন চন্দনের ফোঁটা। মামা তো কাণ্ড কারখানা দেখে হতভম্ব। এসব কি! আজ যে ২৫শে বৈশাখ আজ তোমার জন্মদিন। ২৫শে বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালনের সূচনা এইভাবেই হয়েছিল।

পঁচিশে বৈশাখ দিনটি ছাড়াও আরো একটা দিনে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালিত হয়। সে দিনটা হল পয়লা বৈশাখ। ১লা বৈশাখও ঘটা করে রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয়। তা অবশ্য শুধুমাত্র শান্তিনিকেতনেই। শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বাসী ছাত্রছাত্রী শিক্ষকরা ২৫শে বৈশাখের সঙ্গে ১লা বৈশাখও রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন করেন। আগে কিন্তু এমন হতনা। ১৯১১ সালের পর এই প্রথা চালু হয় শান্তিনিকেতনে। ২৫শে বৈশাখ আসতে আসতে শান্তিনিকেতনে প্রচণ্ড গরম পড়ে যায়। গ্রীষ্মে ছেলেমেয়েদের

"ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃষ্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ-ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক করানো, সায়ান্স শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও, ···দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নং—৫/৯১-৯২ ডি, আই. এণ্ড সি, ও তাং—৩/৫/৯১

সাহিত্য সৈকত/জ্যৈষ্ঠ '৯৮/১৫ মে '৯১

কষ্ট হয়। বিদ্যালয় তাই আগে ভাগেই গ্রীষ্মের ছুটি দিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন গুরুদেব। এই নির্দেশ পেয়ে অনেকেই বলে উঠলেন—গুরুদেব তা হলে আপনার জন্মদিন যে পালিত হয়না আশ্রমে! না হলে আর কি হবে? কিন্তু তাই কি হয়! অগত্যা গুরুদেব বিধান দিলেন ঠিক আছে ২৫শে বৈশাখের পরিবর্তে পয়লা বৈশাখই আমার জন্মদিন পালন করা হোক শান্তিনিকেতনে। তারপরই বিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশ হবে। সেই থেকে শান্তিনিকেতনে ২৫শে বৈশাখের আগে পয়লা বৈশাখও কবির জন্মদিন পালিত হয়।

প্র. শ.

●

পঁচিশে বৈশাখ

কাকলি ভট্টাচার্য

ফুল চন্দন পরিয়ে দিলাম ভালে
ধূপ জ্বেলেছি আতর সুবাস ঢেলে
তোমার গানে সাজিয়ে পূজার ডালি
জন্মদিনের প্রদীপ দিলাম জ্বেলে।
তুমি আবার আসবে আমার প্রাণে
আশায় আশায় সময় যে যায় চলি
আজকে যে সেই পঁচিশে বৈশাখ
কেমন করে তোমায় বল ভুলি?

রবি অর্ঘ্য

গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়

দূরাগত শতাব্দীর কোন এক পঁচিশে বৈশাখ,
উদয়ের স্বর্ণরথে 'নূতনেরে' দিয়েছিল ডাক।
স্পন্দিত মূর্ছনা তার প্রভাতের সিংহদ্বার ছাড়ি,
ছুটেছিল দিকে দিকে নবরূপে মহিমা সঞ্চারি।
সেদিনের আলোকিত মধুগন্ধি আকাশ বাতাস
মণি মঞ্জুষায় ভরি রাখিয়াছে দীপ্ত ইতিহাস।
প্রেম-হাসি বেদনার অকথিত বিচিত্র বারতা
ধ্বনিয়াছে ক্ষণে ক্ষণে ধরণীর শত মর্মকথা
সত্য-শিব-সুন্দরের 'গীতাঞ্জলি' মধুর স্বপনে,
অর্পিয়াছ শতবার তব কাব্যবিনোদ-নিঃস্বনে।
'রক্তকরবী'র ধ্বনি 'মুক্তধারা' স্মরি, ওগো কবি,
যৌবনদীপ্ত ব্যঞ্জনায় আঁকিবে কি 'ফাল্গুনী'র ছবি?
তোমার 'সোনার তরী', 'খেয়া' ওই ভিড়িল কোথায়?
'পূরবী'র সুরে ব্যথা, 'সানাই', 'বাঁশরী' কাঁদে হায়।
'বলাকা'র ক্লান্ত পাখা শোকাবেগে বহ্নি 'বনবাণী',
'শ্যামলী'র দগ্ধ বুকে অবস্মাৎ বজ্র গেল হানি।
যে গান রচিলে তুমি মধুরসে নৈঃশব্দের তীরে,
যে গান গুমরি মরে আজি হেথা শুধু অশ্রুনীরে।
'বিশ্বভারতী' তব শান্তরূপ শান্তিনিকেতন,
শোকাচ্ছন্ন, মৌন স্তিমিত বাংলার শ্যামল অঙ্গন।
স্মরিছে তোমায় কবি ব্যথাহত ঐ দিগঙ্গনা,
মেদুর আকাশ চাহে লভিবারে তব কাব্যকণা।
আবার আসিবে তুমি 'কালান্তরে' 'শিশু ভোলানাথ',
বিমুগ্ধ বিশ্বের কবি লহ আজি মোর প্রণিপাত।

সাহিত্য সৈকত/জ্যৈষ্ঠ '৯৮/১৫ মে '৯১

মহান মে দিবস

দীর্ঘজীবী হোক !

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিজ্ঞাপন নং—৪/৯১-৯২ ডি আই. এণ্ড সি. ও তাং—৩/৫/৯১
সাহিত্য সৈকত/জ্যৈষ্ঠ'৯৮/১৫ মে '৯১

শান্তিপুর কো-অঃ কোল্ড ষ্টোরেজ সোসাইটি লিঃ

রেলেষ্টেশন, ফুলিয়া, জিলা—নদীয়া। ফোন নং ফুলিয়া-৪০

সরকারী অংশীদারিত্বে ও নদীয়ার চাষীভাইদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ৩৪নং জাতীয় উচ্চ সড়ক সংলগ্ন এই সমবায় হিমঘরে চাষীভাইদের উৎপাদিত আলু অতি যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা হয়। এই সমবায় হিমঘরে আলু সংরক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত সুযোগ-সুবিধাগুলি চাষীভাইদের দেওয়া হয়ে থাকে।

১। আলু উৎপাদনকারীগণের আলু সংরক্ষণের জায়গা নিশ্চিত।

২। আলু উন্নতমানের হলে সমিতি বাজার দর অনুযায়ী ক্রয় করতে পারে।

৩। আলু হিমঘরজাত করলে আলুর বস্তার উপর ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

৪। হিমঘর হ'তে ভাল বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।

৫। প্রয়োজনে চাষীভাইরা স্থানীয় কৃষি বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ পেতে পারেন।

৬। শেয়ার ক্রয়েচ্ছুগণের নিকট এখনও শেয়ার বিক্রয় করা হচ্ছে। প্রতিটি শেয়ার মূল্য একশত টাকা। প্রবেশ দক্ষিণা পাঁচ টাকা।

৭। **Transport Rebate** (গাড়ীভাড়া ছাড়) :—শান্তিপুর রাণাঘাট ১নং ও ২নং ব্লক, হাঁসখালী, কৃষ্ণনগর, চাকদহ ও হরিণঘাটা ব্লকের চাষীভাইদের জন্য প্রতি বস্তা ১-৫০ (একটাকা পঞ্চাশ পয়সা) হারে!

৮। **Members Rebate** (হিমঘরের সদস্যদের জন্য ষ্টোরভাড়া ছাড়) :—প্রতি বস্তা ১-০০ টাকা। একটাকা। হিসাবে সর্বোচ্চ **Paid up Share Capital** পর্য্যন্ত।

বিঃ দ্রঃ এই হিমঘরে আখের গুড়, দুধ, দই, মিষ্টি, ফুল ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হয়।

শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র ঘোষ	*শ্রীঅভয়পদ পাণ্ডে*
সভাপতি	মুখ্য নির্ব্বাহী আধিকারিক
শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সরকার	*শ্রীবিমল কুমার বিশ্বাস*
সহ-সভাপতি	সম্পাদক

আত্মসমীক্ষার মহালগ্ন

নারায়ণ চন্দ্র বসু

আবার এসেছে ২৫শে বৈশাখ
দেখ ভেবে আর একবার
তুমি কে ? কে তুমি
নও তুমি ভীরু, কাপুরুষ,
নির্দয় নিষ্ঠুর।
নও দাম্ভিক, মিথ্যাচারী,
জ্ঞানহীন পশুসমান।
নিশ্চিত নও তুমি
পতিত অভিশপ্ত।

মুগ্ধ মায়া একদিন
করেছিল বিস্তার মোহজাল
'তুমি' ও 'তোমার'
বিস্তৃত বিশাল অঙ্গনে
তারই মধ্যে ধরা পড়েছিলে
এতকাল।

তোমার 'তুমি'ই
চালায় তোমায়
সতত পিচ্ছিল পথে
ধূম্রময় অন্ধকার রথে
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ।

সাহিত্য সৈকত/জ্যৈষ্ঠ'৯৮/১৫ মে '৯১

প্রতিপক্ষে আসক্তি তোমার
কেবল অন্যায়-অশুভ
স্বার্থপর দিশার নেশায়।

আজও হয় হেথা
দেখা যায় সুস্পষ্ট আভাস
তোমারি স্বভাব স্বরূপের।
দেখি তব 'মম'ত্ব
তোমারই ন্যায়-অন্যায়
শুভ-অশুভের সংজ্ঞা
ত্যাগ-সেবা-সত্য ও প্রেমের
নিরন্তর বহি আনে
জীবনের গাঁথা
এক অখণ্ড ধারা
অন্যায় ব্যর্থ-এ জীবন।

সুন্দর জীবনের
তুমিও তো একজন
পরিচিত ভূমি
নিত্য-ন্যায় কর্মের পূজারী।
ত্যাগময় সেবাময়
স্নিগ্ধ শান্ত সমাজের।
তোমরা সকলেই
এক এক প্রত্যক্ষ প্রতীক।
দেখ ভেবে, এসেছে আবার
২৫শে বৈশাখ।
শপথ নেবার
মহালগ্ন আবার।

ভোটাধিকার

প্রশান্ত শর্মা

যেতে হবে নির্দ্দিষ্ট দিনে
অধিকার প্রয়োগের, ফতোয়া হাতে করে
নির্দ্দিষ্ট বুথে—
পায়ে হেঁটে দুপুর রোদ্দুরে।

দলনেতা এসেছিলেন গত রাতে গাঁয়ের ভিটেতে
এসে বলে গেলেন—আবার তো ভোটের দিন এসে গেল ভাই,
ভোট দিতে যেও কিন্তু!
—এ তোমার আমার গণতান্ত্রিক অধিকার
এ অধিকার নষ্ট করো না!
আমি মাথা নাড়ি

মনে মনে বলি: অধিকার! কি সে অধিকার?
এই বেঁচে থাকা? যেমন আছি!
থাক্ থাক্ ঢের হয়েছে।
চল্লিশ বছর ধরে আমি বেঁচে আছি এই মাটিতে
চল্লিশ বছর ধরেই তো—
কত অধিকার আর কত প্রতিশ্রুতির বুলি শুনে আসছি
বেঁচে আছি এই যে এতটা কাল আত্মসম্মান খুইয়ে—
অপুষ্টি, অশিক্ষা, অনাদর আর অনধিকারকে লয়ে
বেঁচে আছি নিশিদিন মৃত্যুর সঙ্গে আত্মীয়তা করে।
কতবার তো টিনের বাক্সে ফেলেছি সংগোপনে
অধিকারের টিকিটখানি ভাজ করে।
কিন্তু কি ই বা হল!

মনে মনে ভাবি : অধিকারের কী ই বা পেলাম
কী ই বা হারাবে ?
চল্লিশ বছর তো কেটে গেল একইভাবে
দুঃখের দিনে শুধু আকাশের পানে চেয়ে চেয়ে।
নবলার মেঠো পথ ধরে যেমন হেঁটেছি ছোটবেলায়
আজও তেমনি হাঁটি।
সেই চেনা পথ তেমনি আছে
বর্ষায় কাদা হয় শীতে ধুলো ওড়ে।
ভাঙ্গা ছাউনির দাওয়ায় দাঁড়িয়ে
আমার পাঁজর উঁচু উদোম গায়ে হাত রেখে
মুখ থেকে পানের পিক ফেলতে ফেলতে
দলনেতা বলে গেলেন—প্রশান্ত, যাস্ কিন্তু ভাই !
তোদের এই দাদাটাকে দেশ সেবার সুযোগ দিবিনা
আর একবার !

দাদার চোখে বোধ হয় অন্ধকার গাঢ় হয়ে গেঁথেছিল
তাই আমার বুকের পাঁজরগুলো দেখতে পায়নি।
ওর প্রতীকী চিহ্নটি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে গেছিলো
কিন্তু নিরন্ন অনাহারক্লিষ্ট মানুষের জীবন্ত প্রতীক
এই আমার অস্থিচর্মসার চেহারাটি তার চোখে
ধরা পড়েনি একবারও।

আমি ভাবি : মনে মনে ভাবি
তবু যেতে হবে—
অধিকার প্রয়োগের ফতোয়া হাতে কবে
নির্দ্দিষ্ট দিনে নির্দ্দিষ্ট বুথে।

ভৃত্য সংবাদ

নীহার মজুমদার

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তাহলে ভৃত্য সংরক্ষণ সমিতি চালু করা গেল। স্বাধীনতার পর থেকে বেঁচে থাকার লড়াই-এ কত যে ভৃত্য চাকুরীতে শহীদ হয়েছে তার কথা স্মরণ করলে জলে চোখ ভরে আসে। এ পেশায় সরকারী স্বীকৃতি অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডোমেষ্টিক সার্ভেন্টস সার্ভিস রেগুলেশন এ্যাক্ট ১৯৯১-এ পরিচারক বৃত্তিক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে এমনভাবে আলোকপাত করা হয়েছে যাতে আর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না। মালিক সম্প্রদায়ও আর যখন তখন এদের লাথি জুতো মেরে তুচ্ছ কারণে অনিশ্চয়তার মুখে ঠেলে দিতে পারবে না। চার ফর্মার পুস্তিকা নিয়ে বিশদ আলোচনায় না গিয়ে মোটামুটি প্রয়োজনীয় অধ্যায়গুলির উপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যেতে পারে :

১। 'ভৃত্য' (স্ত্রী/পুরুষ) ক্রীতদাস ভাড়া করা এবং সময়ান্তরে স্বীকৃত স্কেল অনুযায়ী মজুরী অবশ্যই প্রদেয়।

২। প্রতি পরিবারে যেখানে সদস্য সংখ্যা চার-এর অধিক সেক্ষেত্রে আইনত: ভৃত্য (স্ত্রী/পুরুষ) রাখা আবশ্যক।

৩। পরিচারক "স্ট্যাটাস্ সিম্বল" নয়, সেবক বিশেষ এবং নার্সিং-এর মত সমপর্য্যায়ের বৃত্তি।

৪। পরিবারের অন্যতম সদস্য রূপে ওর আহার্য সমান হবে। আর যদি সে নাবালক/নাবালিকা হয় তাহলে দুধ বরাদ্দ।

৫। পোষাক আশাকে উদার মনোভাব থাকবে এবং বাসি জামাকাপড় পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে ধোওয়া হবে।

৬। বাজার বা অন্য কোন কিছু কেনা কাটা করতে পাঠালে 'সেবক' যা হিসাব দেবে তাই গ্রহনীয় এবং ঐ সময় তার জন্য নিত্যকার যা কাজ বরাদ্দ ছিল তা থেকে সে রেহাই পাবে।

৭। বাড়িতে টেলিভিশন থাকতে হবে। ভি সি আর/ভিসিপি অগ্রগণ্য এবং পরিবারের অন্যান্যদের সঙ্গে যে কোন অনুষ্ঠান (অধিক রাত্রের ছবিসহ) দেখার অধিকার থাকবে।

৮। বাড়িতে গ্যাস রাখা আবশ্যিক। বয়লা বা উনুন ব্যবহারে প্ররোচিত করা আইনবিরুদ্ধে। পরিচারকের টেলিফোন আসতে পারে অথবা সে করতেও পারবে।

৯। ঝি ও চাকর উভয়ই একই বা অন্য পরিবারে কর্মরত থাকলে তাদের মধ্যে মেলা মেশায় কোন বাধা থাকবে না এবং এ ব্যাপারে এরাই ওদের অভিভাবক।

১০। বৎসরান্তে একমাস টি-এ সহ (দ্বিতীয় শ্রেণী) সবেতন ছুটি। পরিবারের সঙ্গে ভৃত্যও হাওয়া বদলে সঙ্গী হবে।

১১। সম্বোধন 'তুমি'; তুই তোকারি নৈবচ। লোডশেডিং হলে জল তোলার জন্য বালতি প্রতি পৃথক মূল্য ধরে দিতে হবে।

১২। বাড়ির কর্তা হবেন ওর কন্ট্রোলিং অফিসার। গিন্নী মা'র এ ব্যাপারে কোন ভূমিকা থাকবে না।

১৩। বেঁচে থাকার অধিকারে দিবা নিদ্রার ব্যবস্থা এবং আহারের পর নেশা সেবন।

১৪। প্রতি মহল্লায় ভৃত্য সংরক্ষণ সমিতির গণ আদালত থাকবে। কোন গৃহকর্তা অগণতান্ত্রিক পথ নিলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং সংশ্লিষ্ট বাবুকে তা মেনে নিতে হবে। প্রয়োজনে এক মালিকের অন্যায়ের জন্য পাড়ায় ভৃত্য ধর্মঘটের অধিকার দেওয়া আছে।

১৫। পে স্কেল শিরোধার্য্য করে ভৃত্যকে নিয়োগ পত্র দিতে হবে এবং চাকুরীতে থাকা না থাকা তারই উপর নির্ভরশীল ইত্যাদি! ইত্যাদি!! ভৃত্য নিয়োগ করা হবে মহল্লার এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরো থেকে। যথাযথ মিয়মে ইচ্ছুক মালিক নির্দিষ্ট আবেদনপত্রে ভৃত্য চাইবেন। সঙ্গে রেফারী হিসাবে সে পাড়ার যে কোন একজন সদস্য ভৃত্যের সাক্ষর প্রয়োজন।

ইলা আর আমি অনেকদিন থেকে হন্যে হয়ে একটা কাজের লোক বা মেয়ে খুঁজছিলাম ভীষণ ভাবে। আপাততঃ কেষ্টদার চা-এর দোকানে ভৃত্য সংরক্ষণ সমিতির এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরোতে! একহাতে ঐ এ্যাক্ট-এর পুস্তিকা অপর হাতে আবেদনপত্র।

অনেক ভেবে ঠিক করলাম বর্তমান চাকুরীটা ছেড়ে সমিতির সদস্যপদ নেব। □

নদীয়ায় নজরুল

মাধব ভট্টাচার্য

১৯২৩ সাল। নজরুল ইসলাম হুগলী জেলে রাজবন্দী। রাজবন্দী আর সাধারণ কয়েদীতে কোন তফাৎ নেই ঐ জেলে। তার ওপর কবির সশ্রম কারাদণ্ড। ইংরেজ পেয়াদাদের কড়া পাহারা। আজ যদি পেছন ফিরে কারাবাসী নজরুলকে আমরা খুঁজি তাহলে আত্মগ্লানি নয় আত্মোন্মচনের নজরুলকেই খুঁজে পাব। আমার আজকের এ লেখার বিষয় হুগলী নয়, নদীয়া। হুগলীর প্রসঙ্গ টেনে কথা বলার উদ্দেশ্য হল, হুগলী জেলে থাকার সময়ে নজরুলের শরীর নানাদিক থেকে বিদ্রোহ করছিল। জেলখানা থেকে বেরিয়ে এসে হুগলীতে তাঁর যে সপরিবারে বাস সেখানেও আর্থিক দৈন্যতা এবং শরীরের অপটুতা তাঁকে দেহ ও মনের দিক থেকে ধীরে ধীরে অবসাদ ক্লিষ্ট করে তুলেছিল। অবসাদ ক্লিষ্ট নজরুলকে নদীয়া খানিকটা প্রাণ দিতে পেরেছিল সন্দেহ নেই। নজরুলের এই দুর্দিনে স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম নেতা, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রিয় শিষ্য কৃষ্ণনগরবাসী হেমন্ত কুমার সরকার উদ্যোগী হয়ে নজরুলকে হুগলী থেকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে এসেছিলেন।

১৯২৬ সালের ৩ জানুয়ারী। নজরুল হুগলীর পাট চুকিয়ে দিয়ে সপরিবারে চলে এলেন নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগরের গোলাপট্টিতে ছিল হেমন্ত সরকারদের বাড়ি। বাড়িটি অনেকদিনের পুরনো। বাড়িটির একটি অংশ নজরুল ইসলামকে সপরিবারে বসবাস করার জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন

হেমন্তবাবু। বাড়িটি নজরুলের পছন্দ ছিলনা কিন্তু উপায় কি? নজরুল-প্রমীলা ঐ বাড়িতেই নতুন করে সংসার পেতে বসলেন।

হুগলীতে থাকাকালীনই নজরুল বারবার ম্যালেরিয়ায় ভুগছিলেন। কৃষ্ণনগরে আসার পর হেমন্ত সরকারের অনুরোধে তখনকার দিনে কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত বিলাত ফেরৎ ডাক্তার জে, এন, দে নজরুলের চিকিৎসার ভার নেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই নজরুল সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়ে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন।

হেমন্তবাবু স্বরাজপার্টি করতেন। নজরুল যখন কৃষ্ণনগরে, হেমন্তবাবু বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। নজরুল ইসলামও কৃষ্ণনগরে এসে সক্রিয় রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়লেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির একজন সভ্য ছিলেন তিনি। তাঁর কৃষ্ণনগরে আসার পর পরই (১৯২৬ ফেব্রুয়ারী—মে) নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মেলনের যে অধিবেশন হয় কৃষ্ণনগরে তার কর্মকর্তাদের মধ্যে নজরুল ছিলেন অন্যতম।

"—ওরে ধ্বংস পথের যাত্রীদল!
ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল।
আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই
পায়ের সুখে ভাঙব চল।
ধর হাতুড়ি, তোল কাঁধে শাবল।"

সম্মেলনের উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে নজরুল ইসলাম এই গানটি রচনা করে নিজের কণ্ঠে গেয়েছিলেন সেদিন।

সে সময়, ১৯২৬ এর এপ্রিল মাস নাগাদ কলকাতায় হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধলে নজরুল মনে মনে অস্থির হয়ে ওঠলেন। নানা কাজে ভয়ঙ্কর ব্যস্ত

তিনি তখন। একদিকে সম্মেলনের দায়িত্ব তার ওপর কৃষ্ণনগরে ভলানটিয়ার বাহিনী গড়ে তোলার কাজকর্ম। এমন অবস্থা যে নজরুলের নাওয়া খাওয়ারই সময় নেই। সাম্প্রদায়িক এই অসুস্থ আবহাওয়ার আশু অবসানের কথা মাথায় রেখেই প্রাদেশিক সম্মেলনের অনুষ্ঠানের জন্যে নজরুল লিখলেন —

"দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার।
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল আছে কার হিম্মৎ।"

১৯২৬ সালেই কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত হল যুব সম্মেলন। যতদূর জানা যায় যুব সম্মেলনের উদ্বোধন সঙ্গীত হিসাবে নজরুল চল্ চল্ চল্/ঊর্ধে গগনে বাজে মাদল/নিম্নে উতলা ধরনীতল..." এই গানটি লিখেছিলেন—

একটানা তিন মাস ধরে সম্মেলনের কাজকর্ম চলার পর হাতে যখন একটু অবসর এল, কৃষ্ণনগর স্টেশনের কাছে চাঁদ সড়ক এলাকায় একটি ভাল বাড়ি পাওয়ায় নজরুল হেমন্তবাবুর আশ্রয় ছেড়ে সপরিবারে উঠে এলেন। মজফ্‌ফর আহমদের লেখা "কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা বই থেকে জানা যায়—"বাড়িটি ছিল স্টেশন রোডের ধারে। একতলা ছোট্ট বাড়ি হলেও খুব চওড়া ছিল তার বারান্দা। পাশে আমের বাগান ছিল এবং এত বেশী খোলা ময়দান ছিল যে তাকে বাগানবাড়িও বলা যায়। বাড়ির মালিক ছিলেন একজন খ্রীষ্টান মহিলা। নিকটেই ছিল "দত্ত নিবাস"। বিখ্যাত অধ্যাপক উমেশ চন্দ্র দত্তগুপ্তের বাড়ি।

নজরুল কৃষ্ণনগরে যে খ্রীষ্টান ভদ্রমহিলার বাড়িতে ছিলেন, সে বাড়িটি এখনও আছে। পরবর্তী সময়ে বাড়িটি বি, এন, ইলিয়স কোম্পানী কিনে নিয়েছিল। এখন ঐ বাড়িটিতে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অফিস বসে। নজরুল তাঁর কৃষ্ণনগর বাসের শেষ দিন পর্যন্ত এবাড়িতেই ছিলেন। এই বাড়িতেই তাঁর প্রথম পুত্র বুলবুলের জন্ম হয় ১৯২৬ সালের ৯ অক্টোবর। বুলবুলকে মুখেভাত খাওয়ানোর অনুষ্ঠানও হয় এই বাড়িতেই ১৯২৭ সালের ১৩ মার্চ।

১৯২৬ সালে নজরুল কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন হেমন্ত বাবু এবং আরও অনেক শুভার্থী বন্ধুদের কথা উপেক্ষা করেই করেই কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। তখন ঢাকা বিভাগে কেন্দ্রীয় আইন সভায় মুসলমানদের জন্যে দু'টো আসন সংরক্ষিত ছিল। শুধু মুসলমানদেরই ভোটাধিকার থাকতো এবং প্রত্যেকে দু'টো করে ভোট দিতে পারতেন। নজরুল প্রার্থী হবেনই। কারো কথা শুনলেননা তিনি। কিন্তু প্রার্থী হিসাবে নিজেকে জাহির করার জন্যেও তো টাকা চাই। ছুটলেন কলকাতায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে। সব শুনে বিধান রায় তাঁকে তিনশ' মত টাকা দিয়েছিলেন। সেই টাকায় নজরুল নির্বাচনে প্রার্থীপদ দাখিল করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি হেরে যান এবং জামানত পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত হয়।

নজরুল কৃষ্ণনগরে থাকার সময় তাঁর বাসস্থানের কাছেই একটি নৈশ বিদ্যালয় করেছিলেন। বিদ্যালয়টি এখনও আছে।

১৯২৬ থেকে ১৯২৮, নজরুলের সাহিত্য জীবনও কম উল্লেখনীয় নয়। বর্তমান নিবন্ধে নজরুলের সাহিত্য জীবন নিয়ে কোন আলোচনা করার অবকাশ ঘটলনা। ইচ্ছা আছে পরবর্তী কোন সংখ্যায় কৃষ্ণনগর অবস্থান কালীন তাঁর সাহিত্য জীবন নিয়ে আলোচনা করার। □

টুকরো খবর

কৃষ্ণনগরে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান

কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, নদীয়ার উদ্যোগে সাড়ম্বরে রবীন্দ্রনাথের ১৩০তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হয়। সকাল ৮টায় কৃষ্ণনগর রবীন্দ্র ভবনের সামনের রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ভারতীয় গণনাট্য শাখার নদীয়া জেলার সভাপতি ও জেলার লোক সংস্কৃতি পর্ষদের সদস্য শ্রীসাধন চট্টোপাধ্যায়, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বসু, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক ও শিল্পী সংঘের নদীয়া শাখার সভাপতি অধ্যাপক আকুলানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সংগঠনের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। পরে স্থানীয় বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশিত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে মূল অনুষ্ঠান শ্রীগৌতম সাহার উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক বিষয়-গুলি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক প্রসুন মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য যেসকল শিল্পীরা সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রীসলিল ঘোষ, শ্রীমতী পূর্ণিমা ভট্টাচার্য্য, শ্রীমতী সুপর্ণা ভট্টাচার্য্য, শ্রীদ্বিজেন রায়, শ্রীমতী পদ্মিনী ঘোষ, শ্রীদীপংকর দাস, শ্রীউত্তম সিংহরায় প্রমুখ। পরিশেষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নাটক 'বিসর্জন' পরিবেশন করে নেথুয়া-ডহরীর আপনজন গোষ্ঠী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি শিল্পীদের দক্ষতায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। উপস্থিত শিল্পীদের ও দর্শকদের স্বাগত ও ধন্যবাদ জানান সহ সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র বসু।

আলুচাষ ও ফুলিয়া হিমঘর

শ্যালো এবং ডিপ টিউবয়েলের কল্যাণে নদীয়ার অনুর্বর মাটিও ইদানীং ফুলে, ফলে ফসলে ভরে যাচ্ছে। তবে এ বছর সর্ষে, আখ ও গমের ফলন যতটা আশানুরূপ হয়েছে আলুর ফলন সে তুলনায় ভাল হয়নি।

শান্তিপুর ব্লকের বাঁশডোপ গ্রামের আলুচাষী নিমাই রায় কথা প্রসঙ্গে জানালেন নদীয়ার মাটিতে আলু চাষের খরচ যে পরিমাণ বাড়ছে ফলনের দিক থেকে ততটা আশা ব্যঞ্জক হচ্ছেনা। নিমাই রায়ের সমীক্ষা অনুযায়ী পুরনো বীজের থেকে নতুন বীজে ফলন ভাল হয়। এক বিঘা জমি চাষে ৯ মণ বীজ লাগে। প্রতি মণ বীজের দাম গড় পরতা ১০০ টাকা এ ছাড়া চাষের খরচ, সার, জল, জন সব মিলে বিঘা প্রতি খরচ দু'হাজার টাকার মত। বীজ বোনা থেকে ফসল ওঠা পর্যন্ত সময় লাগে ৩ মাস। বিঘায় গড় পরতা ফলন ৭০/৭৫ মণ। অথচ কাছাকাছি বর্ধমান জেলাতে একই খরচায় ফলন কম করেও ১১০/১২০ মণ। একটু যত্নশীল মনোযোগী চাষীরা খরচ খরচা বাদ দিয়েও বিঘা প্রতি বছরে ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা লাভ করেন।

১৯৮৪-৮৭ পর্যন্ত নদীয়ার আলুর ফলন যথেষ্ট ভাল ছিল। নদীয়া জেলায় হিমঘরের সংখ্যা ৩টি। একটি কৃষ্ণনগরে। বাকী দু'টোর একটা ফুলিয়া এবং অন্যটা নগরউখড়ায়। কৃষ্ণনগরের হিমঘরটি বেসরকারী উদ্যোগে নির্মিত। ফুলিয়া এবং নগরউখড়ারটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে এবং আর্থিক সাহায্যে নির্মিত হয়। কৃষ্ণনগরের হিমঘরটি বেশ কিছুদিন হল বন্ধ হয়ে আছে। ফুলিয়ার হিমঘরটি ১৯৮১ সালে ৫২ লক্ষ টাকা খরচ করে নির্মিত হয়। সরকারী এবং বেসরকারী অংশীদার মিলে ১৭০০ শেয়ার হোল্ডার রয়েছেন। হিমঘরটিতে ৬৬ হাজার প্যাকেট আলু সংরক্ষণ করার ক্ষমতা আছে। কিন্তু বর্তমান বছরে এই হিমঘরে আলু মজুত হয়েছে মাত্র ৩৫ হাজার প্যাকেট। ফুলিয়া কোল্ড স্টোরেজের তরুণ চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ হিমঘরটির আধুনিকীকরণের কথা ভাবছেন। ডিফ্রিজার সিস্টেমের পরিবর্তে বাঙ্কার সিস্টেম চালু হলে খরচ অনেক কমে যাবে বলে শোনালেন।

সম্পাদকীয়

দশম লোকসভা নির্বাচন

'সাহিত্য সৈকত' এর বর্তমান সংখ্যাটি যেদিন প্রকাশ পাবে তার পাঁচদিন বাদে অর্থাৎ ২০শে মে ১৯৯১ আমাদের রাজ্যে দশম লোকসভা এবং একাদশ বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে। এক একটা লোকসভা নির্বাচন মানে প্রায় হাজার কোটি টাকা ব্যয় আর এই ব্যয়ভার পরোক্ষভাবে এদেশের জনসাধারণকেই বহন করতে হয়।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক চিত্রটা খুব ঘন ঘন পাল্টাচ্ছে। এই পরিবর্তনের মধ্যে গণতন্ত্র বা প্রগতির ছাপ যে বড় একটা আছে তা বলা যায়না। বরঞ্চ দলীয় কোন্দলই মাঝে মাঝে মুখ উঁচু করে তাকায়। একই দল বহুধা বিভক্ত। একই রাজনীতিবিদের বহু দল পরিবর্তন। খুঁজলে দেখা যাবে এই পরিবর্তনের পেছনে আদর্শের থেকে স্বার্থই বড়। আর এই আদর্শহীনতাই যে দেশকে দুর্বল করছে তা বলা বাহুল্য। রাজনীতিও যে একটা "দর্শন" তা হাল আমলের রাজনীতিবিদদের দেখলে মনে হয়না। নীতি-আদর্শও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। আজকের রাজনীতিতে দর্শন বড় কথা নয়, নীতি আদর্শ বড় কথা নয়, মানুষ বা দেশটাও বড় নয়। বড় হল দল। দলগত নির্বিশেষে সব রাজনীতিবিদদেরই সমস্ত শক্তি ব্যয় হয়ে যাচ্ছে আপন আপন দলের অস্তিত্ব রক্ষা করতে গিয়েই। দেশের কথা, দেশের সার্বিক মঙ্গলের কথা ভাববার অবকাশ কোথায়! যার ফলে দেশ দেউলিয়া হচ্ছে, দুর্বল হচ্ছে, ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হচ্ছে, অশুভ শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

এটাই আমাদের দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে স্বাধীনতার ৪৪ বছর বাদেও আসন্ন দশম লোকসভা নির্বাচনের মুখে দাঁড়িয়ে ভাবতে হচ্ছে দেশবাসীর সামনে কোথায় আদর্শ, কই সেই বীর্যবান নেতা, শক্ত হাতে হাল ধরার মত দলই বা কোথায়! ভারতবাসীর রাজনৈতিক জীবন থেকে এই অভাব মোচন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। দশম লোকসভা নির্বাচন দেশকে কোন পথে নিয়ে যায় তাই আপাতত দেখার।

SAHITYA SAIKAT
Jaistya. 1398/15th May 1991 Rs. 2·00
Regd. No. 42112/81 R.N.I.

কুষ্টিয়ার কুলিয়া জানে সর্বজন
টাঙ্গাইল শাড়ী তার গলার ভূষণ ॥

প্রথম কুলিয়া স্টেশনের কাছেই আমাদের আস্তানা। এখানেই তাঁতবোনের ঐতিহ্যমণ্ডিত "টাঙ্গাইল শাড়ীর" প্রস্তুতিস্থান।

কুলিয়ার তৈরী টাঙ্গাইল শাড়ীর চাহিদা সকলের ছাড়াছাড়ি পেতে হলে আসুন আমাদের সমবায় সদনে।

সমবায় সদনের তিনটি শো রুম :

- কুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
- টাঙ্গাইল তন্তুজীবি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
- নতুন কুলিয়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ

সমবায় সদন
কুলিয়া, নদীয়া।

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য ● প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য
সার্কুলেশন ম্যানেজার : গণেশ রায়
প্রকাশ স্থান : বৈশাখ সদনী, কুলিয়া, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ
মুদ্রণ : মাধবী প্রেস, উলুবেড়িয়া, হাওড়া (উঃ)

উৎসবে অনুষ্ঠানে
প্রিয়জনকে উপহার দিতে হলে
আসুন

এ, টি, জুয়েলার্সে

এ, টি, জুয়েলার্সের গয়না শুধু আনন্দের প্রতীকই নয়, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তারও চাবিকাঠি।

এ, টি, জুয়েলার্সের নির্মিত গয়না পরুন আপনার ভবিষ্যৎ সঞ্চয়কে সমৃদ্ধ করুন।

এ. টি. জুয়েলার্স

প্রোঃ শৈলেন্দ্র কুমার কর্মকার

ফুলিয়া রেলবাজার, (মাছ বাজারের সন্নিকট)

বিঃ দ্রঃ প্রতি বুধবার দোকান সম্পূর্ণ বন্ধ।

রাজা ষ্টোর

প্রো: নিরঞ্জন পাল

ফুলিয়া রেলবাজার, ফুলিয়া, নদীয়া,

এখানে সর্বপ্রকার ষ্টেশনারী সামগ্রী প্রসাধনী, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কলকাতার দরে পাওয়া যায়। আফসের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তাঁতের সামগ্রীও সরবরাহ করে থাকি।

পুজো মরশুমের ভিড় লাগার আগেই আপনার প্রয়োজনীয় শাড়ী ঘরে তুলে নিন। নতুন ডিজাইনের নতুন ভ্যারাইটিতে আমাদের শো-রুম শাড়ী কীর্ণ।

অভিজাত টাঙ্গাইল শাড়ীর বৈচিত্র্য পেতে হলে আসুন আমাদের কাছে।

ফুলিয়া ষ্টেশন থেকে ৫ মিনিট আর বাস স্ট্যাণ্ড থেকে ১ মিনিট ৩৪ নং জাতীয় সড়কের ওপর—

শাড়ী কুঠির

প্রোঃ ননীগোপাল দাস

ফুলিয়া চটকাতলা, নদীয়া, ফোন : ফুলিয়া ৩৯

কলকাতা বিক্রয় কেন্দ্র ফোন : ৪০-৭৫৮৭

সম্পাদকীয়

রাজীব হত্যা, গণতন্ত্রেরই হত্যা

মানুষটি ছিলেন আমাদের মধ্যে, আজ আর নেই। মানুষটি ভালবাসতেন তাঁর মাটি ও মানুষকে তাই মাতৃভূমির এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে বেড়াতেন, মানুষটি বিশ্বাস করতেন মানুষকে, তাই মানুষের ডাকে মানুষের কাছে ছুটে যেতেন। মানুষটি ভালবাসতেন ফুলকে তাই হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন অচেনা মেয়েটির দিকেও। ভালবেসে তার দেওয়া ফুলের তোড়াটি তিনি বুকে টেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু হায়! ফুলের মধ্যেও এত বিষ! ফুলের মধ্যে তো মধু থাকে সে মধু পেতে কখনও সখনও কাঁটার ঘা খেতে হয় এই তো জানা ছিল। কিন্তু সব জানাই যে ভুল হয়ে গেল। তাঁর ভালবাসার ফুল ও মানুষ তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করল।

মানুষটির পরিচয় জানার অপেক্ষা রাখেনা আজ আর। শুধু এদেশের মানুষই নয়, গোটা বিশ্বের সংবেদনশীল মানুষ মাত্রই রাজীব গান্ধীর এই মৃত্যুতে মর্মাহত হয়েছেন। গত ২১শে মে রাত্রে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী যে নৃশংসভাবে নিহত হয়েছেন সে কথা আজ আর কারো অজানা থাকার কথা নয়। অজানা শুধু এইটুকুই কি তাঁর অপরাধ; কি অপরাধের শাস্তি দিয়ে তাঁকে পৃথিবী থেকে বিদেয় করে দেওয়া হল?

অপরাধ কি তাঁর ভালবাসা? অপরাধ কি তাঁর স্বদেশের মাটি ও মানুষকে আপন ভাবা? অপরাধ কি ভারতের সুসংহতির ভাবনা ভাবা? ভালমন্দ সব মানুষের মধ্যেই আছে। রাজীবের মধ্যেও ছিল। তবে নিন্দুকেরা যাই বলুক, সাধারণ মানুষের কাছে ছিল তাঁর ভালর দিকটাই বেশি।

তাঁর সাত বছরের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক জীবনের হিসেব নিকেশ করলে দেখা যাবে গদিতে বসে প্রাজ্ঞদের মত তিনি তামাক খাননি। নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত থাকেননি, পরনিন্দায় সময় ব্যয় করেননি। নজরটা এদিকে ছিলনা বলেই স্বচ্ছ উদার দৃষ্টি মেলে তাকাতে পেরেছিলেন দেশটার দিকে, দেশের সাধারণ মানুষের দিকে। স্বপ্ন দেখতেন আশাবাদী যুবক রাজীব, নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন।

দিল্লীর মসনদে বসে বহু রাজনীতিবিদের অনেক কটু ক্ষ কটূক্তি তাঁকে শুনতে হয়েছে, বহু সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সবই মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন। তাঁর চরিত্রের এইসব গুণই ধীরে ধীরে তাঁকে সাধারণ মানুষের প্রিয় করে তুলেছিল। পোড় খাওয়া অভিজ্ঞ তামাকু সেবন প্রিয় বহু রাজনীতিবিদই তাঁর অনভিজ্ঞতার সাফাই গেয়েছেন জনগণের কাছে। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টোটাই, রাজনীতির পণ্ডিতরা যতই তাঁর কুৎসা গেয়েছেন সাধারণ মানুষের ভালবাসা জুটেছে তাঁর ততই বেশি।

এই ভালবাসাটাই তাঁর কাল হয়ে এল। মৃত্যুর পর অন্ততঃ তাই মনে হচ্ছে। মানুষের এত ভালবাসাই বোধ হয় চক্রান্তকারীদের টনক নড়িয়ে দিয়েছিল। তবে কি রাজীব মানুষের ভালবাসার জোরে দিল্লির মসনদে স্থায়ী আসন দখল করে নেবেন? দুষ্ট চক্র সেই ভয়েই কি মানুষটিকে সরিয়ে দিল। সরিয়ে দিল একেবারে পৃথিবী থেকে। রাজীব হত্যা-কারী কে বা কারা তা আজও প্রমাণের অপেক্ষায়। হয়ত একদিন প্রমাণিত হবে, দোষীর শাস্তিও হবে কিন্তু যা বড় করে ভাববার তা হল রাজীবের এই হত্যা শুধু ব্যক্তি রাজীবকেই হত্যা করা না, ভারতের গণতন্ত্রকেও হত্যা করা হল। মহাত্মা গান্ধী, ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর মৃত্যু বারবার এই প্রমাণই করছে যে ভারতীয় গণতন্ত্র আজ বিপন্ন। দলমত নির্বিশেষে এই বিপন্ন অবস্থা থেকে দেশকে মুক্ত করতে না পারলে সমূহ বিপদ। □

নবদ্বীপের শিবের বিয়ে

পবিত্র চক্রবর্তী

ভারতীয় লোকধর্মে শিবের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। সুদূর সিন্ধুসভ্যতার কাল থেকেই শিবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন উচ্চধর্মে এবং পুরাণে শিবের একটি বিশেষ ভাবমূর্তি রচিত হলেও তার লৌকিক চরিত্রটি অবলুপ্ত হয়নি; বাংলার লোকধর্মে ও সাহিত্যে শিবের লোকায়ত চরিত্রটি বিশেষভাবে প্রবাহিত থেকেছে।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত বৈষ্ণবতীর্থ নবদ্বীপে বৈষ্ণবসাধনা, তন্ত্রসাধনার পাশাপাশি শিব আরাধনারও বলিষ্ঠ গতি লক্ষ্য করা যায়। এখানকার 'বুড়োশিব', 'যোগনাথ', 'বালকনাথ', 'আলোকনাথ', 'মালোদের শিব', 'দণ্ডপানী', 'পরেশনাথ' প্রভৃতি শিবলিঙ্গগুলিকে আশ্রয় করে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। এখানকার শিব বিবাহ বা শিবের বিয়ে এইরকমই একটি প্রাণবন্ত ও জনপ্রিয় লৌকিক অনুষ্ঠান।

নবদ্বীপের শিবের বিয়ে প্রতি বৎসর চৈত্র অথবা বৈশাখ, ইংরাজী মার্চ/এপ্রিল মাসে বাসন্তীপূজার শেষদিন অর্থাৎ দশমী পূজার অন্তে ভোর রাত্রিতে (প্রায় সকল ক্ষেত্রেই ভোর ৪ টেয়) দেবী বাসন্তীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব প্রধানতঃ বাসন্তীপূজার তিথির উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক শিবমন্দির প্রাঙ্গণে বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠানের পর দশমীর দিন বিকালে বাসন্তী এবং শিবলিঙ্গগুলি নির্দিষ্ট মানুষের কাছে বৃত্তি তুলতে বের হন।

বিবাহ অনুষ্ঠানের পরেও পরদিন সকাল পর্যন্ত শিববাহক-দের দ্বারা বাহিত হয়ে বৃত্তি তোলেন। শিবকে বহনের জন্য 'হাওদা' ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বুড়োশিব ও যোগনাথকে বৃত্তি তোলার সময় বহন করবার সুবিধার জন্য অপেক্ষাকৃত হালকা হাওদা ব্যবহার করা হয়, কিন্তু বিয়ের সময় সুন্দর বড় হাওদা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। হাওদা চারজন বাহক দ্বারা বাহিত হয়। শিবকে আসন থেকে হাওদায় তুলে বেহারাগণ হাওদাটি কাঁধে নিয়ে কিছুক্ষণ সেটিকে নাচান। এই নাচান ব্যাপারটি কোন সুনির্দিষ্ট নিয়মে না হলেও মোটামুটি ডাইনে বাঁয়ে হেলেদুলে ঢাক বাজনার সঙ্গে সঙ্গে হয়ে থাকে। এমন কি বিবাহ অনুষ্ঠানের সময়ও বাসন্তী ও শিবকে হাওদা-সমেত নাচান হয়। বাহকেরা 'নাচান'কে কর্তব্য বলে বিশ্বাস করলেও এটি যে পরিশ্রম লাঘব করবার জন্য করা হয়ে থাকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বৃত্তি আদায়ের পর শিবলিঙ্গগুলি পূর্বে নবদ্বীপ শহরের প্রাণকেন্দ্র পোড়ামা-তলায় বিয়ের জন্য সমবেত হতেন, কিন্তু বর্তমানে যে যার নিজস্ব মন্দিরে ফিরে যায়। সকল শিবের বিবাহের অনুষ্ঠান নিজ মন্দির প্রাঙ্গণে নিজ নিজ বাসন্তীর সঙ্গে পালিত হলেও এখনও যোগনাথ শিবের বিবাহ পোড়ামাতলাতেই হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট সময়ে যোগনাথ শিবকে শোভাযাত্রা সহযোগে মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে পোড়ামাতলার বিবাহ উৎসব ক্ষেত্রে আনয়ন করা হয়। নবদ্বীপের পোড়ামার সঙ্গে যোগনাথ শিবের দীর্ঘদিনের একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সেই কারণেই সম্ভবত যোগনাথ শিবকে পোড়ামাতলায় এনে বিবাহ দেবার রীতি প্রচলিত হয়। যোগনাথ শিবের আবির্ভাব সম্পর্কেও লোক মুখে সুন্দর একটি গল্প প্রচলিত আছে। শ্রীজগবন্ধু পাল তাঁর স্বহস্ত লিখিত খাতায় স্মৃতিচারণমূলক রচনায় (৬ই আশ্বিন,

১৩১৭ সন) যোগনাথ শিবের উৎপত্তি, তাঁর গাজন ও বিবাহ উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন—

"নবদ্বীপ পুরাণগঞ্জনিবাসী বহুগোষ্ঠীপূর্ণ নবদ্বীপ বারুজীবি সমাজস্থ মণ্ডল বংশে উৎপন্ন বিহারীলাল মণ্ডল মহাশয়ের ৪র্থ পুরুষ স্বর্গীয় রামকিশোর মণ্ডলের প্রপিতামহ পাড়ের ডেঙ্গা (উত্তরণভূমি) নামক স্থানের নিজ পর্ণ বা পান সংক্রান্ত কৃষিক্ষেত্রে (বরজ) মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে একটি শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হন। এই সময় বারুজীবি মহাশয়গণ কেহ কেহ নূতন নবদ্বীপ চড়ে কৃষ্ণনগর মহারাজ তরফ হইতে জমিজমার রায়ত গ্রহণ করেন। কিংবদন্তী আছে যে, এই রায়তি অন্তর্গত পাড়ের ডেঙ্গায় প্রাপ্ত শিবলিঙ্গ (পাড়াঙ্গা শিব) পূর্ব্বোক্ত মণ্ডল পরিবারস্থ বারুজীবি সন্তানগণকে স্বপ্নে আদেশ করেন যে, 'তুমি অমুক স্থানে খনন করিতে করিতে তিন হস্ত মৃত্তিকাভ্যন্তরে আমায় প্রাপ্ত হইবে, অযত্ন না করিয়া আমায় গৃহে লইয়া যাইও, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে।' অর্থাৎ পাড়াঙ্গা শিব উত্তোলন করত; মস্তকে তুলিয়া গৃহে লইয়া গেলেন, কিন্তু পাছে যথাবিধি পূজার ত্রুটি হয় এই আশঙ্কায় নিজের কাছে না রাখিয়া নবদ্বীপ বারুজীবি সমাজ তত্ত্বাবধানে প্রদান করিলেন। তৎপরে ৩০০ ঘর সহযোগী ঐ সমাজ তখন বিশেষ কোন বন্দোবস্ত না করিয়া প্রাচীন নবদ্বীপস্থ পুরাণগঞ্জ পল্লী অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্তী গ্রামপ্রান্তস্থ দক্ষিণাকালী পোড়ামাতা পার্শ্বে দেব 'পাড়াঙ্গা শিব'নাথকে রাখিয়া দিলেন। পুরাণগঞ্জ হইতে বর্তমান নবদ্বীপে আগমন পর্যন্ত, তান্ত্রিক পণ্ডিত অনুমান পূর্ণানন্দগিরি পরমহংস স্থাপিত এই দেবী পোড়ামাতার আবির্ভাবকাল অনুমান প্রায় ৫০০ বৎসরের কম হইবে না। এই ঘটনার

প্রায় এক বৎসর পরে যোগ সাধনায় নিরত জনৈক যোগী (সন্ন্যাসী) এই 'পাডাঙ্গা শিব' সন্নিধানে ও ভক্ত সমাজ-তত্ত্বাবধানে আর একটি বাণলিঙ্গ শিব রাখিয়া যান। ইহাই আমাদের বর্ণনীয় মহাপ্রভু শ্রীশ্রীযোগনাথ শিব মহাদেব। অতঃপর উহাদিগের পূজা ও দেবাদিকার্য্য ভক্ত সমাজ দ্বারা সাধ্যমত চালিত হইতে লাগিল।

প্রায় উর্দ্ধ ৪৫০ বৎসর অতীত হইল অর্থাৎ খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর কিঞ্চিৎ মধ্যভাগ হইতে ঐরূপভাবে শিবদ্বয়ের সেবা চলিয়া আসিতেছে। কালক্রমে ৩৯০ বৎসরের কিছু পূর্বে যখন বর্তমান নবদ্বীপস্থ বটবৃক্ষতলে বাসুদেব সার্ব্বভৌম সময়ে পুরাণগঞ্জ হইতে অনুমান ১৪৯৬ খৃঃ অব্দে আনীত দেবী পোড়ামাতা বিরাজিতা, তখন পাডাঙ্গা শিবসহ দেব যোগনাথ শিব পুনশ্চ তাঁহার পার্শ্বে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে রক্ষিত হইয়াছিলেন। পরে নবদ্বীপ বারুজীবিগণ পুরাতন নবদ্বীপের পুরাণগঞ্জ হইতে প্রায় ১৫০ বৎসর হইল উঠিয়া আসিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মণমণ্ডলীর পক্ষবল ও অপরাপর ভক্তসহ তাঁহাদের অর্থবল প্রাপ্ত হইয়া তদানীন্তন নব নবদ্বীপস্থ নিত্যানন্দ অঙ্গণের সন্নিকটবর্তী ৺নবোকুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পূর্বপুরুষ প্রদত্ত নিষ্কর বলরাম সিদ্ধান্ত ব্রহ্মত্তর মধ্যে অনুমান ১ কাঠা পরিমিত ভূখণ্ডে শিবালয় বা দেবাসন নির্মাণ করাইয়া তাহার ভিতরে শিবদ্বয়কে রাখিয়া দিলেন। এক্ষণে পুনসংস্কৃত ঐ শিবমন্দিরে পাডাঙ্গা শিব ও যোগনাথ শিব ভিন্ন, গৌরীপট্ট দুর্গামূর্ত্তি, কঙ্কাভরণযুক্ত প্রস্তর মণ্ডমূর্তি প্রভৃতি কয়েকটি বিগ্রহও স্থাপিত হইয়াছেন।"

নবদ্বীপে শিবলিঙ্গগুলি প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক পরে শিবের বিয়ের অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়। জানা যায়, আনুমানিক ইংরাজী সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে কাশীতে শিব

বিবাহের অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নবদ্বীপে প্রথম শিবশিবাহের অনুষ্ঠানের প্রচলন করেন। এই কাজে তিনি উপযুক্ত উৎসাহী ব্যক্তি ও পণ্ডিতবর্গের সহায়তা লাভ করেছিলেন। শোনা যায় নবদ্বীপ মালঞ্চপাড়ায় অবস্থিত বুড়োশিবের বিয়েই প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই অঞ্চল সেই সময় সঠিক ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত ছিল এবং প্রতিদিন এই বুড়োশিবলিঙ্গ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পূজিত হতেন। সম্ভবত সেই কারণেই বিবাহের জন্য বুড়োশিবকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। এই তথ্যের দ্বারা বুড়োশিব লিঙ্গের প্রাচীনত্বও প্রমাণিত হয়। যখন বুড়োশিবের বিয়ের প্রচলন হয়, সেই সময় অন্যান্য শিবের বিবাহ অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল না। আনুমানিক বাংলা ১৩০৫-১৩০৬ সনে বুড়োশিব হারিয়ে যান। মন্দির থেকে তাঁকে অপহরণ করে নিকটবর্তী এক জলাধারে নিক্ষেপ করা হয়। সেই সময় বুড়োশিবের অনুপস্থিতিতে তাঁরই কাছের বাণেশ্বর শিবকে দিয়ে এই বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়েছিল। সেই সময় থেকেই নবদ্বীপে অন্যান্য শিবের বিবাহ অনুষ্ঠান প্রচলিত হয়।

শিবের বিবাহের অনুষ্ঠানসমূহ লৌকিক বিবাহের স্ত্রী আচার অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়। এই বিবাহ অনুষ্ঠানে মন্ত্রের ব্যবহার নেই, কোন বিশেষ পূজাও এই সময়ে শিবের হয় না। শিব তার সমস্ত দেবমহিমাকে পশ্চাতে ফেলে গণদেবতারূপ লাভ করেন; অগণিত মানুষ নিজেদের প্রাত্যহিক জীবন অনুষ্ঠানের আলোকে তাঁর বিবাহ অনুষ্ঠান পালন করে থাকেন। মানব সমাজে যে মনোভাবে আইবর ভোজন, গায়ে হলুদ, জলসাধা, মালাবদল প্রভৃতি আচার পালন করা হয় শিব-বাসন্তীর বিবাহের ক্ষেত্রেও এর

প্রত্যেকটি আচার অবশ্য পালনীয়। শিবের বিয়ের জলসাধা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান। এক সময়ে এটি অত্যন্ত জীবন্ত অনুষ্ঠান ছিল। সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রসহ শিবের বিয়ের জলসাধা বার হত। এই জলসাধার দলটিতে পূর্বে-পুরুষদেরই মহিলা সাজান হত এবং তারাই গান গাইতে গাইতে পথ পরিক্রমা করতেন। শ্রীজগবন্ধু পাল এ সম্পর্কে তাঁর খাতায় (১৩১৭ সন) লিখেছেন –

> "যখন কুলবালাগণ কুমারী উমাকে নববধূসাজে বরণ করিতেছে, তখন বালকভক্তগণ স্ত্রীবেশে বিবিধালঙ্কারে ভূষিত হইয়া, রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিত হরিদ্রাক্ত চাউল-কড়ি, ধান দূর্ব্বা-পান ও সুপারীপূর্ণ অধিবাসডাল মস্তকে এবং শ্রীবক্ষে লইয়া মধুর জলসাধাগীতি গাহিতে গাহিতে গমন করিতেছে।"

বিবাহের দিন বুড়োশিবের মন্দিরে বালক-বালিকাদের চিড়ে, দই খাইয়ে দধিমঙ্গল অনুষ্ঠানও করা হত। বরাসন সাজান শিবের বিয়ের অপর একটি উল্লেখযোগ্য দিক। নবদ্বীপের বড় বড় ব্যবসায়ীগণ নিজ নিজ ব্যবসার বিভিন্ন দ্রব্যের সাহায্যে বরাসন সাজিয়ে থাকেন। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই বরাসনে মোটর সাইকেল, ফ্যান, বিভিন্ন পোষাক, বাসনপত্র, টিভি, আলমারী প্রভৃতিও স্থানলাভ করেছে। তবে এই বরাসন সাজান অনেক পরবর্তীকালের সংযোজন বলে মনে করা হয়। কেউ কেউ মনে করেন, আনুমানিক ১২৯৯ সন অথবা ১৩০১-১৩০২ সন নাগাদ বুড়োশিবের বরাসনই প্রথম প্রচলন হয়। এর পূর্বে বরাসনের অস্তিত্ব ছিল না। শ্রীনলিন চন্দ্র দাসই প্রথম বরাসন চালু করেন বলে জানা যায়। আনুমানিক ১৩০৮ অথবা ১৩০৯ সন নাগাদ অথবা তার পরবর্তী সময়ে এই বরাসন সর্বত্র জনপ্রিয়তা অর্জন করে ও প্রচলিত হয়।

নবদ্বীপের প্রত্যেক শিবকে ঘিরে এক একটি গোষ্ঠী বা অনুরাগী ভক্তবৃন্দের বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। এই সকল ব্যক্তি-বর্গই শিববিবাহ এবং বাসন্তীপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরি-চালনা করেন। উৎসবে যোগদান করে সাধারণ মানুষের দল। শিববিবাহ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে নবদ্বীপ শহরের আশপাশের গ্রাম থেকে যেমন বালক, বৃদ্ধ, মহিলা প্রভৃতি দর্শনার্থীরা আসেন, তেমনই আসেন শহর কৃষ্ণনগর ও দূর-দূরান্ত থেকে বহু মানুষ। রাস্তার দুধারে অগণিত মানুষ জমা হন, নবদ্বীপ শহর সমস্ত রাত্রি প্রাণচঞ্চল ও আনন্দ-মুখর হয়ে ওঠে। বহুবিচিত্র সঙ্গীত রাগিনী, সানাই এর সুর এক মোহময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। সাধারণভাবে এই বিবাহ অনুষ্ঠানে পাত্রপক্ষ বা কন্যাপক্ষের স্বতন্ত্র কোন বিভাগ থাকে না। প্রত্যেক শিবের বিয়ে অনুষ্ঠানের নিজস্ব পরি-চালকবর্গ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। কন্যাপক্ষ এবং পাত্রপক্ষের জন্য নির্দিষ্ট দুই পুরো-হিত থাকেন। তবে পূর্বে পরামাণিক ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে পরামাণিক এর ব্যবহার কর্তাকে বিশেষ কোন ভূমিকা পালন করতে আর দেখা যায় না।

সুদৃশ্য গেট, আলোর মালা, বিভিন্ন কাগজ ও শোলা ইত্যাদি দিয়ে তৈরী ফুলে হাওদা সাজিয়ে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে বেহারাগণ যোগনাথ শিবকে হাওদায় চড়িয়ে মন্দির থেকে বিয়ের জন্য পোড়ামাতলায় নিয়ে আসেন। প্রথমে বরাসনের জন্য নির্মিত মঞ্চে হাওদা সমেত শিব বসান হয়, পরে বাসন্তী এসে পৌঁছলে তাকে সেখান থেকে রাস্তার ফাঁকা জায়গায় হাওদা সমেত এনে উপস্থিত করা হয়। সাধারণতঃ নিম্ন-শ্রেণীর মানুষেরাই পয়সার বিনিময়ে এই হাওদা বহন করে

থাকেন। বুড়োশিবের হাওদা বাহকেরা বাগদী, বুনো ইত্যাদি জাতির হয়ে থাকে। বিবাহস্থলে সুসজ্জিত বররূপী বৃদ্ধ শিব যখন বাসন্তীর সামনে উপস্থিত হলেন, তখন নব যৌবনা সুন্দরী পাত্রী বাসন্তী বৃদ্ধ বরকে পতিত্বে বরণ করবেননা বলে আপত্তি জানিয়ে পরম অভিমানে স্থান ত্যাগ করেন। শুরু হয় বাসন্তীকে অনুনয় বিনয়ের পালা। এই সময় বাসন্তী বাহকদের স্কন্ধে এবং শিব তাঁর বাহকদের স্কন্ধে আরূঢ় থাকেন। কিছু সময় এইভাবে কাটে। অতঃপর পরিণয়ে সম্মত বাসন্তী মানভঙ্গের পর পুনরায় উৎসব প্রাঙ্গণে ফিরে আসেন; শুরু হয় শিববিবাহের মূল অনুষ্ঠান। শিব এবং বাসন্তী পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে পালন করে চলেন একের পর এক লৌকিক আচার। ফুলের মালা, ধূপের ধোঁয়ায় মোহময় পরিবেশে কন্যা বাসন্তী শিবকে সাত পাকের দ্বারা আবদ্ধ করেন। সাত পাকের পর লৌকিক বিবাহের আচার অনুযায়ী সলজ্জা কন্যার সঙ্গে বৃদ্ধ বরের মালাবদল অনুষ্ঠান হয়। এই মালা তিনবার বদল করা হয়। শ্মশানচারী বৃদ্ধ মহেশ্বর নববধূলাভ করে সংসারী হন। আত্মভোলা, ছন্নছাড়া পুরুষের বুকে জেগে ওঠে প্রকৃতির প্রাণলীলা। পুরুষ প্রকৃতির অদ্বয় মিলনে দিকে দিকে বিঘোষিত হয় নবসৃষ্টির আনন্দধ্বনি। উদিত সূর্যের রক্তিম আলোয় শ্মশান-বাসী নীলকণ্ঠ নববধূর রক্তিম অধর প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ হন— সৃষ্টির সাত পাকে আজ তিনি বন্দী। পাখীর কলরবে, নদীর কলতানে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে সেই বন্ধনের বন্দনা-গীতি। পুবের আকাশে জেগে ওঠে ধীরে ধীরে সূর্য্য। চারদিনের শাস্ত্রীয় পূজায় যে দেবী মাতৃরূপে আরাধ্যা ছিলেন, দশমীর এক বিশেষ লগ্নে তিনিই দেখা দিলেন গৃহের কন্যা ও জায়ারূপে। [*আগামী সংখ্যায়*]

ছদ্মনামে কাজী নজরুল ইসলাম

রতন কুমার দাস

"সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝিনা, কেন না, ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীনে থাকবে না। ভারত শাসন-ভার সমস্ত থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করেছেন তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা পুটলি বেঁধে সাগর পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন-নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদের এই প্রার্থনা করার ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে"।

এর আগে 'পূর্ণ স্বাধীনতার কথা' লিখিতভাবে কেউ বলেন নি মৌখিকভাবে কেউ কেউ বলেছেন যেমন— ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেদাবাদে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে উর্দু কবি ফজলুল হাসন হসরৎ মোহানী 'পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন এর ফলে তাঁর বিরুদ্ধে দুটি মামলা করেন বৃটিশ সরকার, একটি রাজদ্রোহের অপরটি রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মামলা। এতে সর্ব নিম্ন সাজা হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ সাজা হয় মৃত্যুদণ্ড। এসব জানা সত্ত্বেও 'ধূমকেতু'তে 'ধূমকেতুর পথে' প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন কোন সাহসে! এর উত্তর এখন আর পাওয়া সম্ভব নয়।

এছাড়া বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম পরাধীন দেশের নাগরিকগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাঁর সুললিত কণ্ঠ সংগীতে। ভারতমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে ফেলতে তাঁর মুক্ত কণ্ঠ বার বার ধ্বনিত হয়েছিল বাঙলার আকাশে বাতাসে।

কবি সমালোচক বুদ্ধদেব বসু 'নজরুল ইসলাম' প্রবন্ধে বলেছেন "গানের ক্ষেত্রে নজরুল নিজেকে সবচেয়ে বেশী ক'রে দিতে পেরেছেন। তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী তাঁর গানের। বীরত্ব ব্যঞ্জক গানে চলতি ভাষায় যাকে স্বদেশী গান বলে—রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের পরেই তাঁর স্থান। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' উৎকর্ষের শিখরস্পর্শী। সাধারণভাবে বলা যায় যে তাঁর গান তাঁর কবিতার চেয়ে বেশী তৃপ্তিকর।"

তিনি আরও বলেছেন—শোনা যায়, নজরুলের গানের সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশী—পৃথিবীতে নাকি কোনো একজন কবি এত বেশী গান লেখেননি। কথাটা অসম্ভব নয়। শেষের দিকে নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানীর ফরমাশে যান্ত্রিক নিপুণতায় অজস্র গান উৎপাদন ক'রে যাচ্ছিলেন—প্রেমের গান, কালীর গান, ইসলামি গান, হাসির গান—সব রকম। সেসব গান বোধ হয় গ্রন্থাকারে এখনো সংগৃহীত হয়নি, তাই তাদের অস্তিত্বের কথাও আমরা জানিনা। নজরুলের সমস্ত গানের মধ্যে যেগুলি ভালো সেগুলি সযত্নে বাছাই ক'রে নিয়ে একটি বই বের করলে সেটাই হবে নজরুল-প্রতিভার শ্রেষ্ঠ পরিচয়—সেখানে আমরা যাঁর দেখা পাবো তিনি সত্যিকার কবি, তাঁর মন সংবেদনশীল, সূক্ষ্ম-কোমল, আবেগপ্রবণ, উদ্দীপনা পূর্ণ। সেকবি শুধুই বীররসের নন, আদিরসের পথে তাঁর স্বচ্ছন্দ আনাগোনা, এমন কি

হাস্যরসের ক্ষেত্রেও প্রবেশ নিষিদ্ধ নয় তাঁর। 'বিদ্রোহী' কবি, 'সাম্যবাদী' কবি কিংবা 'সর্বহারার' কবি হিসেবে মহাকাল তাঁকে মনে রাখবে কিনা জানিনা, কিন্তু কালের কণ্ঠে গানের মালা তিনি পরিয়ে দিয়েছেন, সে মালা ছোট কিন্তু অক্ষয়। আর কবিতাতেও তাঁর আসন নিঃসংশয়, কেননা কবিতায় তাঁর আছে শক্তি, আছে স্বাচ্ছন্দ, আছে সচ্ছলতা আর এগুলিই কবিতার আদিগুণ।"

রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে খুব স্নেহ করতেন। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত 'বসন্তঋতু' নাটকখানি নজরুলকে উৎসর্গ করেন। তখন বিদ্রোহী কবি জেলে অনশন শুরু করেছেন। রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রাম করলেন প্রেসিডেন্সী জেলে— "Give up hunger strike, our literature claims you" এর উত্তর দিলেন জেল কর্তৃপক্ষ—' The addressee not found ' এই প্রসঙ্গে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি মূল্যবান চিঠি এখানে তুলে দিলাম—"কবি নজরুল ইসলাম আমার পূজনীয় পিতৃদেব রবীন্দ্রনাথের পরম স্নেহ ভাজন ছিলেন। ১৯২৩ সালে প্রকাশিত 'বসন্তঋতু' নাট্যখানি পিতৃদেব উৎসর্গ করেছিলেন নজরুলকে—সে সংবাদ আপনাদের অজানা নয় বোধ হয়। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে আর একটি সংবাদ জানাই, যা আপনারা অনেকেই হয়তো ইতিপূর্বে জানবার সুযোগ পাননি। পিতৃদেব কী গভীর স্নেহ ও শ্রদ্ধা করতেন নজরুলকে তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণস্বরূপ আমাকে লেখা পিতৃদেবের একখানি পুরাতন পত্র উদ্ধৃত করলাম, অসহযোগ আন্দোলনের যুগ তখন, নজরুল সরকারী জেলে রাজবন্দী, বাইরে কেমন করে জানিনা খবর বেরিয়ে পড়েছে যে, তিনি সেখানে কঠোরপ্রায়োপবেশন শুরু করেছেন।

'কল্যাণীয়েষু রথী,

নজরুল ইসলামকে প্রেসিডেন্সীজেলের ঠিকানায় টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুন। লিখেছিলুম, Give up hunger strike, Our Literature Claims you, জেল থেকে memo এসেছে, the addressee not found অর্থাৎ ওরা আমার বার্তা ওঁকে দিতে চায় না, কেননা নজরুল প্রেসিডেন্সী জেলে না থাকলেও ওরা নিশ্চয় জানে সে কোথায় আছে। অতএব নজরুল ইসলামের আত্মহত্যায় ওরা বাধা দিতে চায় না। —শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কী অপরিসীম উদ্বেগ ও আগ্রহের মধ্যে বিশ্বকবি সেদিন আহ্বান জানিয়েছিলেন বিদ্রোহী কবি নজরুলকে—"Our Literature Claims you—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহিলা সাহিত্যিক লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে ১৯২৩ সালের ১৭ই মে একটি চিঠিতে বলেছেন—" হুগলী জেলে আমাদের কবি কাজী নজরুল উপোস করিয়া মর মর হইয়াছে। বেলা ১টার গাড়ীতে যাইতেছি দেখি যদি দেখা করিতে দেয় ও দিলে আমার অনুরোধে যদি সে আবার খাইতে রাজী হয়। না হইলে আর কোন আশা দেখি না। একজন সত্যকার কবি। রবিবাবু ছাড়া বোধ হয় এমন কেহ আর এত বড় কবি নাই।" দাদা।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য বাঙলার জনসাধারণ "নজরুল সম্বর্ধনা সমিতি" গঠন করে। ১৯২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর রবিবার এলবার্ট হলে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বিজ্ঞানাচার্য তাঁর ভাষণে নজরুলকে বাংলার

'প্রতিভাবান মৌলিক কবি' বলে স্বীকার করেন। তিনি বলেন—"আজ বাংলার কবিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করবার জন্য আমরা এখানে সমবেত হ'য়েছি। রবীন্দ্রনাথের যাদুকরী প্রতিভায় বাঙলাদেশ সম্মোহিত হ'য়ে আছে। তাই অন্যের প্রতিভা তেমন করে ধরা পড়েছে না। আধুনিক সাহিত্যে মাত্র দু'জন কবির মধ্যে আমরা সত্যিকার মৌলিকতার সন্ধান পেয়েছি। তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল। নজরুল কবি—প্রতিভাবান মৌলিক কবি। নজরুল ইসলাম শুধু মুসলমানের কবি নন, তিনি বাঙলার কবি, বাঙালীর কবি।

আমার বিশ্বাস নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠে আমাদের ভাবী বংশধরেরা এক একটি অতি মানুষে পরিণত হবে।"

সভাপতির ভাষণের পর অন্যতম প্রধান বক্তা নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর স্বভাব সুলভ আনন্দমুখর কণ্ঠে বলেন—"স্বাধীন দেশে জীবনের সাথে সাহিত্যের স্পষ্ট সম্বন্ধ আছে। আমাদের দেশে তা নেই। দেশ পরাধীন বলে এদেশের লোকেরা জীবনের সকল ঘটনা থেকে উপাদান সংগ্রহ করতে পারে না। নজরুল তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। নজরুল জীবনের নানা দিক থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছেন, তার মধ্যে একটা আমি উল্লেখ করব। কবি নজরুল যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন। কবি নিজে বন্দুক ঘাড়ে করে যুদ্ধে গিয়েছিলেন; কাজেই নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সব কথা লিখেছেন। আমাদের দেশে ঐরূপ ঘটনা কম—অন্য স্বাধীন দেশে খুব বেশী। এতেই বুঝা যায় যে নজরুল একটা জীবন্ত মানুষ।

কারাগারে আমরা অনেকে যাই, কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে সেই জেল জীবনের প্রভাব কমই দেখতে পাই। তার কারণ

অনুভূতি কম। কিন্তু নজরুল যে জেলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। এতেও বুঝা যায় যে, তিনি একটা জ্যান্ত মানুষ।

তাঁর লেখার প্রভাব অসাধারণ। তাঁর গান পড়ে আমার মত বেরসিক লোকেরও জেলে বসে গান গাইবার ইচ্ছা হ'ত। আমাদের প্রাণ নেই, তাই আমরা এমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারি না।

নজরুলকে 'বিদ্রোহী' কবি বলা হয় এটা সত্য কথা। তাঁর অন্তরটা যে বিদ্রোহী, তা' স্পষ্টই বোঝা যায়। আমরা যখন যুদ্ধে যাব—তখন সেখানে নজরুলের যুদ্ধের গান গাওয়া হবে। আমরা যখন কারাগারে যাব, তখনও তাঁর গান গাইব।

আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সর্ব্বদাই ঘুরে বেড়াই। বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত শুনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কিন্তু নজরুলের "দুর্গম গিরি কান্তার মরু'র মত প্রাণ মাতানো গান কোথাও শুনেছি বলে মনে হয় না।

কবি নজরুল যে স্বপ্ন দেখেছেন, সেটা শুধু তাঁর নিজের স্বপ্ন নয়—সমগ্র বাঙালী জাতির স্বপ্ন।"

সভা শেষ হবার আগে সভাপতি বিজ্ঞানাচার্য আবার উঠে দাঁড়ান। বলেন—"আমরা আগামী সংগ্রামে কবি নজরুলের সঙ্গীত কণ্ঠে নিয়ে শ্রীমান সুভাষ চন্দ্রের মতো তরুণ নেতাদের অনুসরণ করব। ফরাসী বিপ্লবের সময়কার কথা একখানি বইয়ে সেদিন পড়েছিলাম। তাতে লেখা দেখলাম; সে সময় প্রত্যেক মানুষ অতি মানুষে পরিণত হয়েছিল। আমার বিশ্বাস নজরুল ইসলামের কবিতা পাঠে আমাদের ভাবী বংশধরেরা এক একটি অতি মানুষে পরিণত হবে।"

কাজী নজরুল ইসলামের বন্ধু নলিনী কান্ত সরকার বলেন—"নজরুলের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের যেটুকু জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তা সম্পূর্ণ রূপে লিখতে গেলে একখানি বৃহদাকার গ্রন্থ হয়ে পড়ে। সাহিত্যে, সঙ্গীতে, সভা-সমিতিতে, আড্ডা-মজলিসে, দেশব্যাপী বন্দনায়, দ্বেষ-দুষ্ট লাঞ্ছনায়, দাবা খেলায়, ফুটবল মাঠে, রঙ্গরসে, যোগী, ভোগী, হস্তরেখা পাঠে এবং কলগীতি পাঠে অধ্যবসায়ী নজরুল। কোথায় কিসে নেই নজরুল?"

এখানে দেখতে পাচ্ছি সব কিছুতেই নজরুল, নেই শুধু "ছদ্মনামে নজরুল"। আমি এখন বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের ছদ্মনামের কথাই বলবো।

কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম জীবনে যে কটা সাড়া জাগানো কবিতা লেখেন "শাত-ইল-আরব" কবিতাটি তাদের মধ্যে অন্যতম। 'নজরুল-পরিক্রমা'র লেখক খুব সুন্দর বলেছেন—"প্রথম জীবনে নজরুল যে কটি সাড়া জাগানো কবিতা লেখেন এবং তাঁর নাম নিখিল বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে আলোচ্য কবিতাটি তাদের মধ্যে অন্যতম। মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে লেখা এই কবিতাটির ধ্বনি বৈচিত্র্য ও ছন্দ মাধুর্য সমকালীন বাংলার অসংখ্য পাঠককে মোহিত করেছিল। এমন কী সেযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার অখ্যাত কবির এই কবিতাটি পড়ে এমনই বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।" তিনি কবিকে স্বাগত জানিয়ে 'মোসলেম ভারতে'র সম্পাদককে দীর্ঘ একটি পত্রে লেখেন—"আপনার পত্রিকার দুই সংখ্যা সম্প্রতি পাঠ করিয়া যে আনন্দ আশা ও বিস্ময়ে উৎফুল্ল হইয়াছি তাহাই প্রকাশ করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটি লিখিয়া পাঠাইলাম, যদি আবশ্যক মনে করেন পত্রিকায় মুদ্রিত করবেন।

মুসলমান সমাজের নব জাগরণের অনেক লক্ষণ সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গলাদেশে সেই লক্ষণ নিশ্চয় হইয়া উঠিয়াছে বাঙ্গালী মুসলমানের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সাধনায়।

মুসলমান লেখকের সকল রচনাই চমৎকার। কিন্তু যাহা আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিত ও আশান্বিত করিয়াছে, তাহা আপনার পত্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি লেখক হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের কবিতা। বহুদিন কবিতা পড়িয়া এত আনন্দ পাই নাই, এমন প্রশংসার আবেগ অনুভব করি নাই। —তাঁহাকে বাঙ্গালার সারস্বত—মণ্ডপে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছি। —কাজী সাহেবের যে দুইটি কবিতা (অন্যগুলি পড়িবার সৌভাগ্য এখনও হয় নাই) পড়িলাম, তাহা দ্বারা মোসলেম ভারতের গৌরব রক্ষা হইয়াছে, বাঙ্গলা কবিতার মান বাঁচিয়াছে, লেখক ও পাঠকের চিত্ত বিনিময় হইয়াছে।

কাজী সাহেবের কবিতায় কি দেখিলাম বলিব? বাঙ্গলা কাব্যের যে অধুনাতন ছন্দঝঙ্কার ও ধ্বনিবৈচিত্র্যে এককালে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু অবশেষে নিরতিশয় পীড়িত হইয়া যে সুন্দরী মিথ্যারূপিনীর উপর বিরক্ত হইয়াছি, কাজী সাহেবের কবিতা পড়িয়া সেই ছন্দঝঙ্কারে আবার আস্থা হইয়াছে।—"

এই কবিতাটি রচনারও একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে, এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কাজী নজরুলের নিকট 'মেসোপটেমিয়া' নামে একটি ইংরাজী বই ছিল। খুব সম্ভব এই বইটাও তিনি সেনানিবাসে থাকাকালীন সংগ্রহ করেছিলেন। যা হোক—এ বইয়ের প্রথমে আর্ট পেপারে একটি অপূর্ব চিত্র

মুদ্রিত ছিল। ছবিটি মোহাম্মদ আফজাল্-উল্-হক্ সাহেবের খুব পছন্দ হয়েছিল—তিনি প্রথমে কেবলমাত্র এটিকে 'মোসলেম ভারতে' মুদ্রণের বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু পরিচয় হীন কেবলমাত্র একটি সুন্দর ছবি মুদ্রণের সার্থকতা কোথায়? তাই তিনি নজরুলকে এর একটি পরিচিতি (কবিতা নয়) লিখে দিতে বলেন। নজরুল গদ্যের পরিচয় লিপি লেখার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে সকলকে বিস্মিত করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে লিখে ফেলেন একটি সুদীর্ঘ এবং অনবদ্য কবিতা, ধ্বনির কী দ্যোতনা, ছন্দের কী দুর্লভ ঐশ্বর্য। নাম—'শাত-ইল-আরব'। এই কবিতাটি ছাড়াও 'একজন সৈনিক' ছদ্মনামের আড়ালে নজরুল নিজেই গদ্যের উল্লিখিত ছবিটির এই পরিচয় লিপিটি লিখে দেন: 'টাইগ্রীস' (দিজলা) আর ইউফ্রেটিস (ফোরাত) বসরার অদূরে একজোট হয়ে 'শাত-ইল-আরব' নাম নিয়েছে। তারপর বসরার পাশ দিয়ে বয়ে পারস্য উপসাগরে গিয়ে পড়েছে। এর তীরে দু-তিন মাইল করে চওড়া খর্জুরকুঞ্জ, তাতে ছোট্ট শহর আর তারই কূলে কূলে আঙ্গুরলতার বিতান, বেদনা, নাশপাতির কেয়ারী, এখানে এলেই অনেক পুরনো স্মৃতি জেগে ওঠে আর আপনিই গাইতে ইচ্ছে করে—

শাতিল্-আরব, শাতিল-আরব
পূত যুগে যুগে তোমার তীর,
শহীদের লোহুদিলীরের খুন
ঢেলেছে সেখানে আরব বীর।"

১৩২৭ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'মোসলেম ভারতে' এই পরিচয় লিপি ও 'শাত-ইল-আরব' কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

নারী স্বাধীনতার জন্য 'ধূমকেতু' প্রাণ দিয়ে লড়েছে, অন্ধ ও মূঢ় স্তাবকতা এবং বীর পূজার বিরুদ্ধে 'ধূমকেতু' সদা-সোচ্চার। প্রতিপক্ষকে আক্রমণের সময়ে ক্ষমাহীন কঠোর মনোভাব—কখনো এই আক্রমণ একান্ত ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে গেছে, যার নিদর্শন "শ্রীকাঁধে-বাড়ি-বলরাম" ছদ্ম-নামে লেখা 'মুড়ো খ্যাংড়া'। এই 'মুড়ো খ্যাড়া'য় নজরুল কি বলেছেন—"এ কালপ্যাঁচাকে আর কত প্যাঁচা খ্যাঁচ্‌রা করব? বেহায়ার পেছন দিকে গাছ গজালে, বলে ছায়া হচ্ছে। বুড়ো বামুন যে এত বেহায়া বেল্লিক হয়, তা আমাদের ধারণার অতীত ছিল। আর নাম করব না তার। কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি গঙ্গাযাত্রীর মড়া! এখনো যদি এমন ক'রে জাতি বিদ্বেষ প্রচার কর, পাঁচটা কড়ির লোভে পাঁচ কোটি লোকের সর্ব্বনাশ কর, তবে শঙ্কর মাছের কাঁটার চাবুক দিয়ে তোমার ছাল তুলে নেব। ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। এবার তাই দেখবে। এ তোমার বৈষ্ণব-বাঘের দল নয়। এখনো তোমার মাথায় ঢালা গুয়ের গন্ধ যায়নি, এখনো তোমার মাথার ডাণ্ডার ঘা শুকোয়নি।

'সেদিন নাকি এই বাযাস্তুরে' বুড়ো বলেছে যে, তার পিতামহ বিশালাকার পুরুষ ছিলেন এবং বোধ হয় পাঠান রমণী না হ'লে তাঁর চলতো না! যার পিতামহ বিশালাকার পুরুষ ছিলেন, তাঁর বংশে যদি এই রকম কাপুরুষ ক্লীব জন্মে তবে লোকে তা'কে কী বলে গাল দেয়? তিনি নানা তীর্থ দর্শনের পুণ্যস্বরূপ বুঝি তোমা হেন রগচিলে ক্যাকলেসেকে বংশাবতংস্বরূপে প্রাপ্ত হয়েছেন! তাই বিভীষণ সেজে মায়ের মুখে আমার কাদা ছিটোচ্ছ? এই নিরিমিষ্যির দেশেই এমন ক'রে দেশের শত্রুতা সাধন সম্ভব। পড়তে

আয়র্ল্যাণ্ডে, তা হ'লে এতদিন তোমায় কচু কাঁটা ক'রে ছেড়ে দিত। তোমার এই চেহারা আর প্রবৃত্তি দেখেই বোঝা যায় তোমার পিতামহের পাঠান রমণী না হলে চলত না, না তাঁর নিজের ঘর সামলানোই দায় হ'ত।

এই মাজা-ভাঙা বুড়ো আবার বলেছেন, 'পাঠান-রমণী পেলে আমিই কোন্ ছাড়ি?" ভ্যালারে ভ্যালা মোদ্দা! সিম-টুনটুনির আবার সাধ যায় ডুমুর গিলতে! গঙ্গাঘাটে তো এগিয়ে আছ, অথচ তরুণী ভার্য্যা, কাজেই সারারাত জেগে শুধু গরু খেদাও। তোমার "চামড়া গেছে ঝুলে, চক্ষু গেছে কোটরে, আর কোমর গেছে বেঁকে, বেড়াও লাঠি ধরে," এ বয়সে ক্যাঁচকামাতু তোমার ফোক্‌লা দাঁতের পাটি বের ক'রে এমন ফ্যাচ ফ্যাচ করতে তোমার শরম হয় না? কিছু শৃঙ্গার তিলক ক'রে নাও আগে গোটা কতক বম্বু খুঁটো-টুঁটো দিয়ে 'দ' মার্কা মাজাকে আগে সোজা কর, তারপর পাঠান রমণীকে ঘরে আন্‌বে এবং আর তার দ্বারের খোজা গোলাম হবে। কুঁজোকে সাধ যায় চিৎ হয়ে শুতে!

শেষবার ব'লে রাখি, এমন ক'রে বুড়ো কালে 'ইয়ে' চুলকিয়ে আর আলকুশী নিয়ো না। মোহররমের দিন, খামখা একটা 'দুপুরে' মাতন কাণ্ড বেধে যাবে।

আমরা শুধু ইংরেজদের চুটিয়ে গাল দিতে ওস্তাদ, কিন্তু এমন দেশদ্রোহীকেও লোকে ক্ষমা করে! হিন্দু মুসলমান মিলের অন্তরায় যদি কেউ থাকে, তবে সে এই ল্যাটেণ্ডিস বৃদ্ধ।"

শান্তিপদ সিংহ বলেছেন—কাজী নজরুল ইসলাম নিজে "শ্রীকাঁধে-বাড়ি-বলরাম" ছদ্মনামে এই রচনাটি লেখেন এবং মুড়ো খ্যাঁড়ার আক্রমণের ব্যক্তিটি হলেন বিখ্যাত সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে

আরও অনেকে এই রকম কঠোর সমালোচনা করেছেন এবং তার উত্তরও দিয়েছেন তিনি খুব সুন্দর। 'প্রবাহিনী' পত্রিকায় "আবার আসিলাম" শিরোনামায় সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "যে আজ আমাকে গালাগালি করে, সে কাল আমার হাত ধরিয়া লইয়া যায়। যে আজ আমার নিন্দায় দুন্দুভি বাজায়, সে কাল প্রশংসার সানাইয়ে সুর জমাইবার চেষ্টা করে। তোমাদের নিন্দা স্তুতির মূল্য বুঝিয়া আমার কেবল হাসি পায়। আমাকেও চিনিলে না, চিনিতে পারিবেও না।"

কাজী নজরুল ইসলাম কলিকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে থাকা কালীন চিঠির আকারে একটা গল্প লেখেন "রাজবন্দীর চিঠি" এই পত্রাকারের গল্পটা বেশ রসালো অপূর্ব্ব গল্প, এতে তিনি ছদ্মনাম ব্যবহার করেন 'শ্রীধূমকেতু'।

কাজী নজরুল ইসলাম 'ইংলিসম্যান' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন, বিশেষ করে ম্যাগাজিন সেকশনটা তাঁর খুব ভাল লাগতো কারণ বেশ সুন্দর সুন্দর খবর থাকতো এই ম্যাগাজিন সেকশনে। এই ম্যাগাজিন সেকশন হতে তিনটি প্রবন্ধের অনুবাদ করে ফেলেন এবং সেইগুলি "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায়" প্রকাশের জন্য দেন। এগুলি ১৩২৭ সালের বৈশাখ সংখ্যায় যথাক্রমে—"জননীদের প্রতি" "পশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব" ও "জীবন-বিজ্ঞান" শিরোনামায় প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু মজার ব্যাপার স্বনাম ব্যবহার করেন নি। প্রথম প্রবন্ধ "জননীদের প্রতি" এতে তিনি কিছু উপদেশ দিয়েছেন ছেলেমেয়েদের হাঁটা শেখানোর ব্যাপারে মায়েদের উদ্দেশ্য দ্বিতীয় প্রবন্ধ "পশুর খুঁটিনাটি বিশেষত্ব" এতে তিনি কিছু জীবজন্তুর বিশেষত্বের কথা বলেছেন যথা—ঘোড়া, তিমি, মাছ, কচ্ছপ বা কাছিম, শশক বা খরগোস, হরিণ,

প্যাঁচা, ভেড়া, উট, হাতী, ক্যাঁকড়া, জিরাফ, বিড়াল, লাল খেঁকশিয়ালী ইত্যাদি। তৃতীয় প্রবন্ধ—"জীবন-বিজ্ঞান" এতে তিনি মানুষের দুঃখ-কষ্টের মহত্ত্ব সম্বন্ধে সুন্দর ভাবে বলেছেন। এগুলি প্রত্যেক মানুষ পড়লে নতুন কিছু জানতে পারবে। এই তিনটে প্রবন্ধে তিনি একটি ছোট্ট ছদ্মনাম ব্যবহার করলেন "নজর"। এই ছদ্মনামে তিনি ১৯২০ সালের ১৯শে ডিসেম্বর পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে একটা চিঠি দেন তাতে তিনি এই "নজর নামটা ব্যবহার করেছিলেন।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকার ১৩২৭ সালের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত "প্রিয়ার দেওয়া শরাব" কবিতাটির পাদ-টীকায় তিনি "নজর" এই ছোট্ট নামটি ব্যবহার করেন।

বাঙলা সাহিত্যের গবেষক ও পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সুখবর 'বাঙলাদেশ' স্বাধীন হবার পর বাঙলাদেশ সরকার" বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে 'জাতীয় কবি' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তারপর থেকে তিনি বাঙলা-দেশেই ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে এই আনন্দ উপভোগ করতে পারেন নি।

এখানে দেখতে পাচ্ছি বিদ্রোহী কবি কাজী সজরুল ইসলামের ছদ্মনামের সংখ্যা চার, ১) একজন সৈনিক, ২) নজর ৩) শ্রীকাঁধে-বাড়ি-বলরাম ৪) শ্রীধূমকেতু।

বিখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে ১৯৪৯ সালে বলেছিলেন—

ভুল হয়ে গেছে, বিলকুল
আর সব কিছু, ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো, নজরুল।
এই ভুলটুকু, বেঁচে থাক
বাঙালী বলতে, একজন আছে
দুর্গতি তার, ঘুচে যাক।

রাজীব গান্ধী স্মরণে

কাকলি ভট্টাচার্য

ওই তুমি শুয়ে আছো
ভারতের শিশু,
একা একা নির্জনে
শক্তিস্থল মাঝে
এ মাটির ভালোবাসা
শ্রদ্ধা-প্রীতি-প্রেমে
শেষ শয্যা পাতা হ'ল
স্নেহে সযতনে।
সাজিয়ে চন্দন চিতা
আত্মীয় স্বজন
ঝর ঝর আঁখিজলে
দিয়েছে বিদায়।
তুমি কি রয়েছো জেগে
নিদ্রাহীন চোখে
বিদেহী অমর আত্মা
ফিরে ফিরে চায়!
এই নির্জন রাত্রির
মলয় বাতাস
জুড়াতে ক্ষতের জ্বালা
দোলায় চামর?
যমুনার কুলুধ্বনি
ভোলাতে ব্যথা
শোনায় কি চুপি চুপি

বাঁশরি শ্যামের ?
এমন তো ছিলনা কথা
নির্মম করুণ
নিষ্ঠুর ভাষাহীন
অকাল প্রয়ান !
বার বার চোখে ভাসে
স্মিত সেই হাসি
দৃপ্ত সুরেলা কণ্ঠ
শোনে এই প্রাণ।
তোমার ঠিকানা আজ
যমুনার তীরে
তোমার স্মরণে যাবো
সেই পথে ফিরে।
অবিশ্বাস অসম্মান
সবকিছু ভুলে
আর বার এসো বার
এই পঞ্চ নদী কূলে।

সকালের রোদ্দুর হয়ে যাবো

উজ্জ্বল কুমার মুখোপাধ্যায়

চোখের জলেতে
অলৌকিক অবহেলায়
দুঃখ পুষে রাখলে
মোমের আলো নিভে গেলে
চোখের তারায় অমন করে
শুধু যন্ত্রণা এঁকে নিলে !
অদৃশ্য বাতাস
এখন যদি ছুঁয়ে দেয় শরীর –
আমি উষ্ণতা লোভি
আলোর অপেক্ষায় তাই
সমস্ত রাত জেগে
সকালের রোদ্দুর হয়ে যাবো।

ব্যাত্‌টা কেলাস্‌ না বুইঝলি

গুরুপদ মোহান্ত

ব্যাত্‌টা কেলাস্‌ না বুইঝলি!
দেইখ্‌লে পিত্তি জ্বল্যে যায়।
বক্‌বকাইযে প্যাট্‌ জুবলে
নাই আসবি খুব্‌লাবি নাই।

অ্যাত গেলি কইলকাতাতে
পথ ঘাটটা দেইখলি নাই আর
ছুইট্‌ছে কেমন মানুষ গুল্যান
টুক দাঁড়াবার সময়টা নাই।

গরজ তুর খুবই দেখেচি
মরদ তুই কিছুই লোস্‌
হব্যাক হব্যাক বল্যে কাটাস্‌
অ্যাত কথায় হল্যাটা বঈ।

লেস্বর হইচিস,
ধম্মর মাগ ছিল্যাকে দেইখ্‌ব্যাক ক্যা?
ইদিক মিটিন্‌ উদিক্‌ মিছিল
হাঁড়িটা তুর টাঙা রইল য্যা।

শব্দার্থ

ব্যাতটা — মুখটা, কেলাস্‌না—হাসিস্‌না (দাঁত খুলে)
জুব্‌লে — ভর্তি হলে, গরজ—ইচ্ছা (অভিপ্রায়)
ব্যাতটা কেলাস্‌না—ও মুখে আর হাসিস্‌ না।

● বাঁকুড়া জেলার সুয়াড়া অঞ্চলের কথ্য ভাষায় লেখা।

SAHITYA SAIKAT
Ashar, 1398/15th June 1991 Rs. 2·00
Regd. No. 42112/81 R.N.I.

কৃত্তিবাসের ফুলিয়া জানে সর্বজন
টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের ধন ॥

ফুলিয়া ষ্টেশনের একেবারে লাগোয়া এখন। বাংলার তাঁত শিল্পের ঐতিহ্যমণ্ডিত **"টাঙ্গাইল শাড়ীর"** আমাদের এই প্রতিষ্ঠান।

ফুলিয়ার তৈরী টাঙ্গাইল শাড়ীর হাজারো রকমের ভ্যারাইটি পেতে হলে আসুন আমাদের সমবায় সদনে।

সমবায় সদনের তিনটি শো রুম :

- ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ
- টাঙ্গাইল তন্তুজীবি উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ
- নতুন ফুলিয়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি লিঃ

সমবায় সদন

ফুলিয়া, নদীয়া।

দূরভাষ : ফুলিয়া ২১/৪২

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য ● প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য
সার্কুলেশন ম্যানেজার : গণেশ রায়
প্রকাশ স্থান : সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া, ৭৪১৪০২
মুদ্রণ : মায়া প্রেস, কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা (উঃ)

তরুণ লেখক লেখিকাদের প্রতি :

সাহিত্য সৈকত মাসিক পত্রিকায় লেখা পাঠাতে হলে কপি রেখে পাঠাবেন।

মৌলিক সৃজনধর্মী লেখাই প্রত্যাশিত। নদীয়া জেলার নানা বিষয়ের ওপর তথ্যমূলক প্রবন্ধ/ফিচার অগ্রাধিকার পাবে।

বই ছাপতে আগ্রহী তরুণ লেখক লেখিকারা পাণ্ডুলিপি সহ সরাসরি পত্রিকার প্রকাশন বিভাগে যোগাযোগ করুন।

'সাহিত্য সৈকত' এর বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা পুজো ও বিশেষ সংখ্যা সহ পঁচিশ টাকা।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি –

ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য সৈকত' এখন মাসিক।

'সাহিত্য সৈকত' এ বিজ্ঞাপন দেওয়ার অর্থ আপনার বক্তব্য বা প্রতিষ্ঠানকে শুধুমাত্র বহু মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া নয় ভবিষ্যৎ কালের জন্য সংরক্ষিত করাও। আপনার বক্তব্য নাম মাত্র খরচে আমাদের প্রচার করার সুযোগ দিন।

শিশুদের জন্য

শিশুদের আঁকা এবং লেখালেখি নিয়ে 'সাহিত্য সৈকত' এর একটি বিশেষ সংখ্যা খুব শীগগিরই বেরুবে। ১৪ বছর বয়স অবধি শিশু ও বালক বালিকারা অংশ গ্রহণ করতে পারো। মৌলিক রচনা (গল্প, কবিতা) বা নিজের আঁকা ছবি নাম ঠিকানা ও বয়সের প্রমাণপত্র সহ আমাদের পত্রিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিও তাড়াতাড়ি। ছাপা হলেই পুরস্কার হাতে পৌছে যাবে।

সোনার বাজারে এখন আগুন তবুও প্রিয়জনকে উপহার তো দিতেই হবে। দাম যা-ই হোক না কেন সোনা ছাড়া কি কোন শুভ অনুষ্ঠান চলে? সোনার কোন বিকল্প নেই।

আসুন, আপনার সাধ্যের মধ্যেই পছন্দের গয়নাটি গড়িয়ে দেবো আমরা।

আসুন—

এ, টি, জুয়েলার্সে

এ, টি, জুয়েলার্সের তৈরী গয়না পরুন। আপনার ভবিষ্যৎ সঞ্চয়কে সমৃদ্ধ করুন।

এ. টি. জুয়েলার্স

প্রোঃ শৈলেন্দ্র কুমার কর্মকার

ফুলিয়া রেলবাজার, (মাছ বাজারের সন্নিকট)
ফুলিয়া, নদীয়া।

[বিঃ দ্রঃ প্রতি বুধবার দোকান সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে।]

শুরু হয়ে গেছে

পুজো মরশুম

সুতোর কোয়ালিটি, ডিজাইনে নতুনত্ব, টেকশই ও রঙের গ্যারেন্টি এসব পাবেন আমাদের কাছেই।

দেরী করবেন না, ভিড় লাগার আগেই আপনার পছন্দের শাড়ীটি ঘরে তুলে নিন।

টাঙ্গাইল শাড়ীর ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান—

শাড়ী কুঠির

প্রোঃ ননীগোপাল দাস

ফুলিয়া চটকাতলা, নদীয়া,

ফোন—ফুলিয়া ৩৯

কলকাতা শো-রুম ফোন ঃ ৪০-৭৩৮৭

কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ প্রকাশ

'সাপ্তাহিক দেশ' পত্রিকার অন্যতম সংগঠক, কৃতী সাহিত্যিক কবি বিজয়লালের, রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কিত চারখানি আলোচনা পুস্তক ঃ 'বিদ্রোহী রবীন্দ্রনাথ (বৃটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত)', 'রিয়ালিষ্ট রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রসাহিত্যে পল্লীচিত্র' এবং 'রবিতীর্থে', একত্র করে একটি গ্রন্থ সংকলন প্রকাশিত হ'ল ৩০শে জুন অপরাহ্ণে। পঞ্চাশ টাকা মূল্যের ৪০০ পাতার গ্রন্থখানি সম্পাদনা করেছেন ডঃ সত্যজিৎ চৌধুরী ও ডঃ সুধীর চক্রবর্তী। রাজ্যপুস্তক পর্ষদ-এর আনুকূল্যে কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার এটি প্রকাশ করলেন শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে। প্রকাশন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীঅমৃতেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং গ্রন্থখানি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ-এর মুখ্য প্রশাসক অধ্যাপক শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থ প্রকাশের দীর্ঘ প্রয়াস বর্ণনা করে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের সম্পাদক এই কার্যে সহায়তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। সম্পাদনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করেন ডঃ সত্যজিৎ চৌধুরী এবং সময়োচিত ভাষণ দেন সভাপতি ও প্রধান অতিথি। কবি বিজয়লালের প্রিয় রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করেন শ্রীবতী ভারতী দাস এবং বিজয়লালের একটি চারণ গান করা হয় সমবেত কণ্ঠে। কবির পৌত্রীর হাতে একখানি গ্রন্থ তুলে দেন সভাপতি মহাশয়।

সম্পাদকীয়

সরকারের কাছে প্রত্যাশা

দেশ জুড়ে দশম লোকসভা নির্বাচন এবং এ রাজ্যে একাদশ বিধান সভা নির্বাচনের ফলাফল বেরুনোর পর দীর্ঘদিন কেটে গেছে। কেন্দ্রে, রাজ্যে মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বিলি বন্টনও হয়ে গেছে। কেন্দ্রে, সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন না করেও, লোকসভায় একক বৃহত্তম দল হিসাবে রাষ্ট্রপতির আহ্বানে কংগ্রেস সরকারে বসেছে। প্রবীণ কংগ্রেস নেতা নরসিমহা রাও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন। আস্থা ভোটেও তাঁরই জয় হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে চতুর্থ বারের মত বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে। বামফ্রন্টের এই জয় পশ্চিমবঙ্গের বুকে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।

৮৬ কোটি ভারতবাসীর ভাগ্য জড়িত হল রাজ্য ও কেন্দ্রের এই মন্ত্রীমণ্ডলীর হাতে। বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা রূপায়ণে এঁদের বিচক্ষণতা ও সুচিন্তিত পদক্ষেপের ওপর নির্ভর করছে দেশের ভবিষ্যৎ। নির্বাচনে যাঁরা জয়ী হলেন, সাধারণ মানুষ যাঁদের ক্ষমতার আসনে বসালো তাঁদের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা তাঁরা যেন সাধারণ মানুষগুলোর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকান, তাদের দুঃখ কষ্ট লাঘব করার চেষ্টা করেন। গদিতে বসে তাঁরা যেন সেই সাধারণ মানুষগুলোকে, যারা তাদের ক্ষমতাসীন করতে সাহায্য করেছিল তাদেরকে ভুলে না যান।

আসলে এই প্রতিদানই স্বাধীনতা উত্তর সাধারণ ভারত-বাসীরা তাদের রাষ্ট্র নায়কদের কাছ থেকে পেয়ে এসেছে। কি কেন্দ্রে কি রাজ্যে এই অভিজ্ঞতাই তারা অর্জন করেছে। কি দক্ষিণপন্থী কি বামপন্থী! গদিতে বসার পর সাধারণ মানুষকে অবজ্ঞা করা ও নিজের দায়বদ্ধতার কথা ভুলে যাওয়াই যেন স্বাধীন ভারতের রাজনীতির চিত্র। যদি এই ট্রাডিশনই চলতে থাকে, যদি এই ভাবেই আজও সাধারণ মানুষ বঞ্চনার শিকার হয়, যদি রাজনীতির স্বার্থেই দেশের যুবকদের কর্মহীন করে রাখা হয়, দেশের আপামর জনসাধারণকে কর্ম বিমুখতার দিকে ঠেলে দেওয়া হয় তা হলে দুর্দিন আসন্ন।

দেশকে মজবুত করতে হলে, দেশের মানুষগুলোকেও শক্তি-শালী করে তুলতে হবে। দেশকে সম্পদশালী করে তুলতে হবে দেশের মানুষের শ্রমের ফসলে। সামনে বাজেট। ইঙ্গিত আসছে আত্মত্যাগের। দেশের মঙ্গলের জন্য যদি স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয় তবে সকলকে মিলেই একই সঙ্গে করতে হবে। নিজেরা ভোগের সংসারে থেকে যথেচ্ছ সম্ভোগ করে গদিতে বসে নীচুতলার মানুষদের দিকে তাকিয়ে শুধু আত্মত্যাগের বুলি অউড়ালে চলবে না। নিজেদের-কেও নেমে আসতে হবে সকলের মাঝে।

একটা জিনিস বুঝতে হবে, বঞ্চনারও শেষ আছে। দিনের পর দিন বঞ্চিত হতে হতে বঞ্চিত বোকা মানুষটিও বঞ্চনার রহস্যটি বুঝে যায়। সে তখন যেখানে এসে দাঁড়ায় প্রত্যাশার আর কিছু থাকে না তাই হারাবারও আর কোন ভয় থাকে না তার। যাদের থাকে তারা আর পালাবার পথ পায় না।

আমরা আশা করবো দেশের সরকার দেশের জনগণের দিকে মুখ তুলে চাইবেন। □

রথ রাধারানী মাহেশ

কাকলি ভট্টাচার্য

প্রাচীনকালেও ভারতে রথের উল্লেখ পাওয়া যায় ফা-হিয়েন ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে। চীন থেকে ভারতে আসার পথে খোটান অঞ্চলে তিনি দেখেছিলেন ধ্যানমগ্ন বুদ্ধকে রথের ওপর রথের মেলায় রথ টানা হয়[1]। তার চারটে চাকাই গড়গড়িয়ে চলে অবিশ্রাম। একে মহাকালের রথের চাকার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে অনায়াসে। এই গতির মধ্যেই মঙ্গল বা শুভ সূচনার ইঙ্গিত বহন করছে। প্রাচীনকালে এই শুভ দিনটিকে বর্ষারম্ভের দিন হিসেবে ধরা হত। এই দিনে শারদীয়া দেবী দুর্গার কাঠামো পূজার মধ্য দিয়ে প্রাক বোধন শুরু হয়।

রথের মেলা এলেই এখনও সামনে রাধারানী এসে দাঁড়ায়। রাধারানী ছাড়া যেন রথের মেলা ভাবাই যায়না। বঙ্কিমচন্দ্র ঝড় জলের রাতে মাহেশের রথ ও রাধারানীর সাথে এমনই গাঁটছড়া বেঁধে দিলেন যে তা আর কখনোই খোলবার নয়, ভোলবারও নয়।

রাধারানী তার মায়ের পথ্যের জন্য উপায়ন্তর না পেয়ে বনফুলের মালা গেঁথে নিয়ে মাহেশের রথের মেলায় বেচতে গেল। এক-দু পয়সা পেলে তাই দিয়েই তার মায়ের পথ্যের ব্যবস্থা হবে সে মনে ভাবল। রথের দিন ঝড় জল শুরু হল। মালা আর বেচা হলনা। মায়ের পথ্যও কেনা হলনা। অন্ধকার পথে প্রকৃতির কান্নার সাথে সেই অসহায় মেয়েটিও বুক ভাসিয়ে কেঁদে কেঁদে বাড়ি ফিরতে লাগলো। পথে আচমকা যোগাযোগ হল এক অচেনা দয়ালু মানুষের সাথে। সে ব্যক্তি রাধারানীর সব কথা শুনে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সেই অন্ধকার পথে মালা ছড়া কিনে তার মূল্যের অতিরিক্ত দাম দিলেন এবং রাধারানীর হাত ধরে পরম যত্নে তাকে বাড়ি পৌছিয়ে দিলেন। ঐ দয়ালু ব্যক্তিটির দয়ায় সেই রাত্রে রাধারানীর মায়ের পথ্য, খাদ্য ও বস্ত্রের সংস্থান হয়েছিল। এখানে মাহেশের রথের মেলা ছিল উপলক্ষ্য মাত্র।

এই গল্প হয়তো সবার জানা। তবু আমাদের কিশোর বেলার মনটাকে নাড়া দিয়েছিল মাহেশের রথ, রাধারানী, ঝড়বৃষ্টি আরও অনেক অনেক কৌতূহল। ছোটবেলায় স্কুল পাঠ্য বইতে বঙ্কিমচন্দ্রের রাধারানীর অংশ বিশেষ পড়ে মনটা আকুলি বিকুলি করত জানার জন্য এরপরে রাধারানীর কি হল, সেই রুক্মিনী কুমার রায়ের সুই করা নোটখানি তুলে রেখেই বা সে পরবর্তীকালে কি করল এবং যে মাহেশের রথের মেলায় এমন প্রাণস্পর্শী ঘটনা ঘটেছিল, সে মাহেশই বা কোথায়, কতদূরে ইত্যাদি। এই দুর্দম্য কৌতূহল সম্ভবত আজও সমগ্র স্কুল পড়ুয়া কিশোর মনকে নাড়া দেয় যতক্ষণ না তারা রাধারানীকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পারছে। মাহেশের রথের মেলায় রাধারানীর ফুলের মালা বেচতে যাওয়া এক

বিরাট ঘটনার দ্যোতনা মাত্র। ঝড়কে উপলক্ষ্য করে যে কাহিনীর শুরু তারই পরিপ্রেক্ষিতে রাধারানীর জীবনের মোড় ঘুরে গেছে আরও বৃহত্তর ঘটনার দিকে এবং একসময় তার পরিণতি ঘটেছে মধুর মিলনে। যা কিনা পরবর্তীকালে রাধারানীর জীবনে পরম প্রাপ্তিরূপে ধরা দিয়েছে। সমস্ত মেলার মূল সুরই হচ্ছে মিলন। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা বহু দূর-দূরান্তরে ছুটে যান এই মিলন মেলায় যোগ দিতে। মানুষের সাথে মানুষের কিংবা আরও বিশেষ কিছু প্রাপ্তির আশায়। সম্ভবত এই মিল শব্দ থেকেই ব্যাপক অর্থে মেলা কথাটির প্রচলন।

রথের মেলা এলেই যেমন আসে রাধারানী আর তার ফুলের মালার গন্ধ তেমনি রাধারানীও মাহেশ ছাড়া অসম্পূর্ণ বেমানান। মাহেশের এই আটপৌরে দিকটা ছেড়ে আরও অনেক পেছনে হেঁটে গেলে দেখা যাবে এর একটা ঐতিহাসিক পটভূমিকা রয়েছে। মাহেশের রথের মেলা বেশ প্রাচীন।

পুরীর রথের জনসমাগমের পরেই এর স্থান। ইতিহাস বলে মাহেশের জগন্নাথ মন্দির ষোড়শ শতকে নির্মিত। মাহেশে জগন্নাথদেবের প্রথম পূজা শুরু করেন শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ ভক্ত ধ্রুবানন্দ। ধ্রুবানন্দ অসুস্থ হবার পর শ্রীচৈতন্য-দেবের ইচ্ছায় তাঁর দ্বাদশ পার্ষদের অন্যতম কমলাকর-পিপলাই, যিনি পঞ্চম গোপাল নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি মাহেশে জগন্নাথদেবের পূজা এবং সেখানকার প্রথম রথযাত্রা শুরু করেন। এরপর থেকেই মাহেশের রথের মেলা নিয়মিত হয়ে আসছে। আগে মাহেশের রথ ছিল কাঠের। কয়েকবছর রোদে জলে নষ্ট হয়ে শেষে ১২৯২ সালে তা আগুনে পুড়ে গেলে কৃষ্ণচন্দ্র বসু কুড়ি হাজার টাকা খরচ করে কুড়ি টন ওজনের লোহার রথ তৈরী করে দেন। এরপর থেকেই মাহেশে লোহার রথই টানা হয়।

সারা ভারতবর্ষ জুড়ে কম বেশি রথযাত্রা হলেও দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতেই এই উৎসব ব্যাপকভাবে প্রচলিত। এরমধ্যে পুরীর রথ জগৎ বিখ্যাত। এখানকার রথ সম্পর্কেও কিংবদন্তী শোনা যায়। সমুদ্রে ভেসে আসা বিশেষ একটা কাঠ দিয়ে সেখানকার রাজার নির্দেশে বিশ্বকর্মাই নাকি প্রথম পুরীর জগন্নাথের মূর্তি তৈরী করেন। এখন নির্দিষ্ট কয়েক বছর অন্তর নতুন কাঠ দিয়ে নতুনভাবে জগন্নাথ মূর্তি তৈরী হয়। পুরীর রথের টানে প্রতি বছর আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ার পুণ্য তিথিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ শ্রীক্ষেত্রে ছুটে যান মেলার আকর্ষণে কিংবা জগন্নাথদেবের দর্শনের আশায়। হয়তো বা দুটোই।

ধারে কাছে আর অন্যান্য রথের মেলার মধ্যে মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের রথেরও বেশ নাম ডাক আছে। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মহিষাদলে প্রথম রথের মেলা শুরু হয়। মহিষাদলের রথের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সেখানকার মৃত জমিদারের সহধর্মিণী জানকী দেবী। কাছাকাছি আর কোন রথের মেলা হয়না বলে প্রজাদের অনুরোধে তিনি এই রথের মেলা প্রচলন করেন। পঁচাত্তর ফুট উঁচু দামী কাঠ দিয়ে ঐ রথ তৈরী করতে সে সময় খরচ পড়েছিল চৌষট্টি হাজার টাকা। এই বিশাল রথের চারপাশে পৌরাণিক চিত্র, মুনি-ঋষিদের চিত্র মূর্তি খোদাই করা হয়েছিল অতি সূক্ষ্ম কারুকাজের সাহায্যে। আজও তার কিছু কিছু নিদর্শন অবশিষ্ট রয়েছে। এই মেলাকে ঘিরে বেশ কিছুদিন ধরে সেখানকার স্থানীয় মানুষেরা আনন্দ উৎসব করেন। মেদিনীপুর জেলার বাহিরীতে আজও রয়েছে চারশ বছর আগেকার সেই কারুকাজ করা জগন্নাথ মন্দিরটি। সেখানকার রথের মেলাও বেশ জাকজমকপূর্ণ। মোদনীপুর

শহরের রথের মেলার বৈশিষ্ট্য হল সেখানে নির্দিষ্ট কোন রথ নেই। অজস্র ছোট ছোট রথ সারা মেলা জুড়ে টানা হয়। বাঁকুড়ার রথের জৌলুসও কম নয়। নয়টি চূড়াযুক্ত ত্রিশ ফুট উঁচু ও চৌদ্দ বর্গ ফুটের এই বিশাল পিতলের রথের দুপাশে দুর্গামূর্তি ছাড়াও লক্ষ্মীনারায়ণ, লতাপাতা ও হাঙ্গরের মূর্তি আছে। সামনে আছে গরুড়ের প্রণত ভঙ্গিমায় অপূর্ব মূর্তি। এই অপরূপ রথটি তৈরি করেছিলেন রামধন মিস্ত্রি প্রায় নব্বই বছর আগে। বাঁকুড়া জেলার নড়রা গ্রামের পিতলের রথ প্রায় দেড়শ বছরের প্রাচীন। বিষ্ণুপুরের রথের অভিনবত্ব হল রাত্রি এগারটা থেকে পরের দিন বেলা এগারটা পর্যন্ত চলে এই রথের মেলা। বীরভূম, কোচবিহার ও পশ্চিমদিনাজপুর জেলার কোন কোন জায়গার রথ বেশ প্রাচীনত্বের দাবি রাখে।

একসময় পুরোনো কলকাতায় শোভাবাজারের রথ ছিল বিখ্যাত। পাইকপাড়া ও অন্যান্য জায়গার রথ ছাড়াও শিয়ালদার রথের মেলা প্রসিদ্ধ। চন্দননগরে রথের উৎসব এখনও মহা-সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। ২৪ পরগনা জেলার কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ির রথ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথমে এই রথ তৈরি হয়েছিল পিতলের। তা একসময় চুরি হয়ে যাওয়ায় পরবর্তীকাল থেকে টিনের রথই টানা হচ্ছে। একসময় বঙ্কিমচন্দ্রের মা রথের দিন প্রথম রশিতে টান দিলে সেই রথ চলতে শুরু করত। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র 'রাধারানী'তে মাহেশের রথের মেলার কথা উল্লেখ করলেও এই উপন্যাসের পটভূমিকা ছিল কাঁঠালপাড়ারই রথের মেলা। একবার বঙ্কিমচন্দ্র ছুটিতে বাড়িতে থাকার সময় তাঁদের বাড়ির কাছে কাঁঠালপাড়ার রথের মেলায় প্রচণ্ড ভিড়ে একটি ছোট মেয়ে হারিয়ে যায়। এই ঘটনার কিছুদিনের

মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র 'রাধারানী' উপন্যাসটি লিখেছিলেন। কাঁঠাল-পাড়ার রথের মেলার বদলে তিনি স্থান নির্বাচন করেছিলেন মাহেশকে।

নদীয়া জেলার বিভিন্ন জায়গাও রথের জন্য বিখ্যাত। নবদ্বীপ, শান্তিপুরের রথ বেশ প্রাচীন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আমলে কৃষ্ণনগরে ধুমধাম করে রথ হত। আজ অবশ্য তা স্মৃতিমাত্র মায়াপুরের গৌড়ীয় মঠের রথ উৎসব এখনও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। মায়াপুরে ইস্কনের রথ ইদানীং-কালে সাধারণ মানুষের মন জয় করেছে। কলকাতায় ইস্কনের রথ চলাকালীন সাদা-কালোয় মিলেমিশে সবাই কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে যান।

ভারতবর্ষে রথের বৈচিত্র্য অভিনবত্ব লক্ষ্য করার মত। সাধারণত পুরীর মত কাঠের রথই প্রায় সর্বত্র টানা হলেও এর ব্যতিক্রমও আছে কোন কোন জায়গায়। যেমন বাঁকুড়ার মল্লরাজাদের পাথরের রথ, অবশ্য তা এখন অচল। মাহেশের লোহার রথ, মেদিনীপুরের রামগড় রাজপরিবারের পিতলের রথ, ২৪ পরগনার কাঁঠালপাড়ার টিনের রথ। এছাড়াও রানী রাস-মণির প্রতিষ্ঠিত রূপোর তৈরী রথ। রানী রাসমণি ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এক লক্ষ বাইশ হাজার টাকা ব্যয় করে এই রথ তৈরী করিয়েছিলেন। অপূর্ব কারুকার্যময় এই রথটি যা এখন খণ্ড খণ্ড হয়ে গচ্ছিত রয়েছে দক্ষিণেশ্বরে। মধ্য কলকাতার সুরী লেন থেকে আজও সোনার রথ বেরোয় রথের দিনে। কাঠের ফ্রেমে পাঁচটি সোনার চূড়া বিশিষ্ট রথে থাকেন শালগ্রাম শিলা ও জগন্নাথ দেব। রথের বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে রথের দেবতাও থাকেন ভিন্ন ভিন্ন। রথের মেলায় যে কেবল সর্বত্র জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা বেড়াতে বেরোন তা নয়। কোথাও রঘুনাথজিও কিংবা শালগ্রাম শিলা, কোথাও শ্যাম রায়,

কোথাও মদনমোহন, কোথাও বা রাধাবল্লভ। স্বয়ং বামনদেব বা শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ জগন্নাথদেবেরই সর্বত্র বিভিন্ন রূপের প্রকাশ বিভিন্ন নামে, এই যা তফাৎ।

ভারতের দক্ষিণ ও পূর্ব অঞ্চলে যেমন প্রধানত কৃষ্ণ বা জগন্নাথদেবেরই রথ যাত্রা করা হয় আষাঢ়ের শুক্লা দ্বিতীয়ায় আবার ভারতের অন্যান্য জায়গায়ও এর তফাৎটা লক্ষ্য করার মত। যেখানে যে দেবতার প্রভাব অধিক সেখানে সেই দেবতারই রথযাত্রা করা হয় নির্দিষ্ট সময় অনুসারে। কোথাও সূর্যের রথযাত্রা, কোথাও শ্রীকৃষ্ণের, কোথাও শিবের আবার কোথাও বা দেবী দুর্গার। বৈষ্ণবরা করেন বিষ্ণুর রথযাত্রা। আজও বৌদ্ধরা বুদ্ধের রথযাত্রা করেন ব্যাঙ্ককে। পুরীর কাছে কেন্দ্রপাড়ায় আজও চলে বলরামের রথ যা কিনা পুরীর রথের থেকেও বড়।

ভারতবর্ষের বাইরেও কোন কোন স্থানে রথের প্রচলন দেখা যায়। মেরি ও যীশুকে নিয়ে রথ টানা হয়। নেপালে বার হয় ভৈরব-ভৈরবীর রথ। অষ্টমাতৃকা ও গণেশের প্রতীক হিসেবে জীবন্ত ছেলেমেয়েকে সেখানে রথে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিশেষ বিশেষ কয়েকটি জায়গার রথের নাম করলেও দুর্গোৎসবের ঠিক পরেই রথোৎসবের স্থান। এই মেলা এবং উৎসবকে ঘিরে সর্বস্তরের মানুষ মেতে ওঠেন আনন্দে। রথের মেলা প্রধানত গ্রামভিত্তিক। পুরীর অনুকরণে গ্রাম বাংলার মানুষেরাও রথের মেলা বসান, রথ টানেন। নয় দিন ধরে চলে জগন্নাথদেবের মাসির বাড়িতে তাঁর পুজো অর্চনা শেষে উল্টো রথের মেলা হয়ে এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে সে বছরের মত।

যাত্রা অর্থাৎ শুভ সূচনা এবং রথ হচ্ছে গতির প্রতীক। আমাদের দেশে রথযাত্রা কবে থেকে শুরু হয়েছে তা আজ আর কেউ বলতে পারেন না।

পৌরাণিক যুগে রথকে যুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হত। তবে প্রাচীনকালে রাজা-রাজড়ারা দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করতে গেলে দু-চাকার রথই ব্যবহার করতেন। মন্দিরের দেবতাকেও বাইরে নেওয়ার প্রয়োজন হলে রথে করেই নেওয়া হত। পরবর্তীকালে, রথে দু-চাকার বদলে ব্যবহার করা হল চারটে চাকা। এর ফলে চারটে চাকার উপর মন্দিরের মত আচ্ছাদন দিতে সুবিধে হল।

প্রাচীনকালেও ভারতে রথের উল্লেখ পাওয়া যায় ফা-হিয়েন ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে। চীন থেকে ভারতে আসার পথে খোটান অঞ্চলে তিনি দেখেছিলেন ধ্যানমগ্ন বুদ্ধকে রথের ওপর। রথের মেলায় রথ টানা হয়, তার চারটে চাকাই-গড়গড়িয়ে চলে অবিশ্রাম। একে মহাকালের রথের চাকার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে অনায়াসে। এই গতির মধ্যেই মঙ্গল বা শুভ সূচনার ইঙ্গিত বহন করছে। প্রাচীনকালে এই শুভ দিনটিকে বর্ষারম্ভের দিন হিসেবে ধরা হত। এইদিনে শারদীয়া দেবী দুর্গার কাঠামো পূজার মধ্য দিয়ে প্রাক বোধন শুরু হয়। চাষীরা হল কর্ষণ শুরু করেন এই রথ যাত্রার দিনেই। নববর্ষায় বৃক্ষ রোপণ উৎসব হিসেবেও এই দিনটিকে কেউ কেউ বেছে নেন। তাই সমস্ত দিক থেকেই রথ যাত্রার পুণ্য দিনটি খুবই তাৎপর্য-মণ্ডিত। রথের মেলা ফিরে ফিরে আসে নিয়মমাফিক, নির্দিষ্ট তারিখে। রথের সাথে আসে বৃষ্টি। ঝম ঝম কিংবা ঝিরঝিরে। রথযাত্রার দিন বৃষ্টি হবে এ যেন কিংবদন্তী হয়ে গেছে। তবু রথের প্রতি অদম্য টান মানুষকে এখনও টানে। আবাল বৃদ্ধ-বণিতা ছুটে যান রথের মেলা দেখতে, রথের রশিতে টান দিয়ে জগন্নাথ দর্শন করে পুণ্য অর্জন করতে, ভগবানের সাথে একাত্ম হতে। শুধু কি রথ দেখে পুণ্য অর্জন করতেই মানুষ মেলায় যায়? কথায় আছে রথ দেখা আর কলা বেচা। উভয় শ্রেণীর মানুষই আসেন এই রথের মেলায়। এখানকার মেলা আগেকার মত একদিনেই সাঙ্গ হয়না, তা চলতে থাকে

মাসাধিক কাল। সেই সঙ্গে চলে বেচা-কেনা, আমোদ-আহ্লাদ। ছোট বড় ব্যবসায়ীরা পসরা সাজিয়ে বসেন। মেলার সঙ্গে কেনাকাটার সম্পর্কটা নিবিড়। তাই কেউ মেলায় যান সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতে, কেউ যান গাছপালা, পাখি ইত্যাদি কিনতে। নিদেনপক্ষে মেলায় গিয়ে কেউবা কিনে নিয়ে আসেন পাঁপড় ভাজা আর তেলে ভাজা। নাগরদোলা, সার্কাসের স্বাদ গ্রামের মানুষ অনুভব করে এই রথের মেলার কল্যাণে। এই মিলন মেলার আনন্দে মানুষ মুহূর্তে হয়ে ওঠে আনন্দ-মুখর। রথের মেলায় কি নেই! একদিনের জন্য বাইরের কেনা-বেচার সমগ্র আনন্দটাই এসে ধরা দেয় যেন। তাই গ্রাম হয়ে ওঠে শহর, বৌ-মেয়ে শিশু ও বৃদ্ধরা গ্রামের মেঠো পথ ধরে চলতে থাকেন মেলার আনন্দে যোগ দিতে। ঘোমটা পরা নতুন বউটার ঘোমটা খুলে যায়। দু-হাতে রঙিন কাঁচের চুড়ি পরে আর মাথার বাহারি কাঁটা কিনে সে উচ্ছল হয়ে ওঠে মুহূর্তে। এই রথের মেলা হচ্ছে হারিয়ে যাবার মেলা, আবার নতুন করে ফিরে-পাবার মেলাও বটে।

ছোট ছেলেটা মেলা দেখে তার বাবার হাত ধরে বাড়ি ফেরার সময় এক হাতে পাঁপড় ভাজা আর এক হাতে সযত্নে বুকে চেপে ধরে থাকে একটা কাঠের জগন্নাথ পুতুল। গ্রামের রথের মেলায় ঘুরে তার ছোট্ট মনের আকাঙ্খা মিটে যায় অনেকখানি। সে কিছু পাওয়ার আনন্দে পরম তৃপ্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

আজও মাহেশে যারা রথের মেলা দেখতে যান, তারা কি মনে মনে রাধারানীকে খোঁজ করেন? হয়ত করেন। সেখানে কত কিশোরীই তো আসে ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে। কিন্তু কেউ কি বনফুলের সুবাস ছড়িয়ে কারুর মন কেড়ে নিতে পেরেছে? কি জানি! □

পূর্ব প্রকাশিতের পর (২)

নবদ্বীপের শিবের বিয়ে

পবিত্র চক্রবর্তী

দেবতা আর স্বর্গপারের দূরত্বে নিজেকে সরিয়ে রাখলেন না। দেবতাকে মানুষ প্রিয় করল এবং প্রিয়কে দেবতা করল এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এই বিবাহ অনুষ্ঠান সমাপ্ত হলে শিব লিঙ্গ নিজ মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দেবী বাসন্তীকে জলে বিসর্জন করা হয়। এই বিষয়ে "প্রতিচ্ছবি" পত্রিকার ১৩৯৫ সনের শারদ সংখ্যায় ইন্দিরা দেবী আমার দেশঃ আমার সময়" স্মৃতিচারণমূলক রচনায় বলেছেন—

"আবার আকাশে যখন একটু সোনা রং এর ছায়া পড়েছে তখন চতুর্দোলায় বররা এগোলেন, এদিকের চতুর্দোলায় কনেরা। কিন্তু বর দেখে কনেরা পিছিয়ে গেলেন তিনবার। একজন কথক বলে যাচ্ছে—বর পছন্দ হয়নি, তাঁরা নাকি শ্মশানে মশানে ঘোরেন, সিদ্ধি খেয়ে বুঁদ হয়ে যান। বাসন্তীরা বিবাহ করবেন না। আবার আর এক কণ্ঠে বলা হচ্ছে; না না এমন সুন্দর দেবোপম স্বামী পাওয়া যায় না ইত্যাদি। এই সব তর্কাতর্কির মাঝে কনেরা রাজী হলেন, তখন মালা বদল শুভদৃষ্টি হল; পরামাণিক গালাগালি দিল—সব অনুষ্ঠান শেষ। ভোরের আলো ফুটে উঠল শীতল বাতাসে সারারাত্রির গ্লানি কাটলো। প্রতিমারা গঙ্গায় চলে গেলেন আর মহাদেবরা ফিরলেন তাঁদের ঠাকুর ঘরে।"

শিবের বিবাহ অনুষ্ঠানে মানসা করবার কোন প্রচলন নেই। এই বিয়ের ফুল, বেলপাতা ইত্যাদিও কোন রোগমুক্তির জন্য ব্যবহার করা হয়না। তবে এই বিবাহে ব্যবহৃত শিব বাসন্তীর

মালাবদলের মালা অবিবাহিত পুরুষ ও মহিলাদের সত্বর বিবাহ ঘটানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ মানুষ প্রবলভাবে বিশ্বাস করেন এই বিবাহের মালা গ্রহণ করলে অবিবাহিত পুরুষ বা মহিলার অবশ্যই সত্বর বিবাহ হবে। সেই কারণে এই মালা উচ্চমূল্যে বিক্রয় করা হয়ে থাকে।

শিবের বিবাহ অনুষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ ছিল এই বিবাহের শোভাযাত্রা। বর্তমানে এই শোভাযাত্রা অনেক ক্ষেত্রে অবলুপ্ত, আবার যা অবশিষ্ট আছে তাতেও পূর্বের তুলনায় ঔজ্জ্বল্য অনেক পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু পূর্বে এই শোভাযাত্রা বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং আড়ম্বরপূর্ণ ছিল। এই শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়েই শিল্পীর শিল্পকুশলতা প্রত্যক্ষ করতেন সাধারণ মানুষ। এই সাধারণ মানুষই উপযুক্ত শিল্পের সমাদর করে শিল্পীদের উৎসাহিত করতেন, নিম্নমানের শিল্পকে সমালোচনায় জর্জরিত করতেন। প্রধানদিকে এই শোভাযাত্রায় বিভিন্ন বিষয় থাকত। পূর্বে বুড়োশিব বিবাহের জন্য মন্দির থেকে বহির্গত হলে একটি শোভাযাত্রা তাঁকে অনুসরণ করত। এই শোভাযাত্রার প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করত একটি অতিকায় "ময়ূরপঙ্খী"। একটি গরুর গাড়ীর উপর নৌকাকৃতির এই ময়ূরপঙ্খীর সামনের দিকের মুখটি মকরের এবং পিছনের দিকের মুখটি ময়ূরের মুখ লাভ করত। এই ময়ূরপঙ্খী প্রায় ১৪ থেকে ১৫ হাত লম্বা এবং ৬ থেকে ৮ ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় নির্মিত হত। এর রঙ থাকত নৌকার মত। যাত্রার গহনা, কাগজের ও প্রাকৃতিক ফুলের মালা দিয়ে ময়ূরপঙ্খী সাজান হত। ময়ূরপঙ্খীর দেহ গঠিত হয় খড়, বাঁশ, বাখারী ইত্যাদির দ্বারা। ময়ূরপঙ্খীর ভিতরে মানুষ থাকবার মত জায়গা থাকত। দোরক ও নর্তকদল এর মধ্যে আশ্রয় নিতেন। পথের মধ্যে শোভাযাত্রা থামলে ময়ূরপঙ্খীর ভিতরের শিল্পীরা ময়ূরপঙ্খীবাহী

গরুরগাড়ীর উপর দাঁড়িয়ে নৃত্যগীত পরিবেশন করতেন। এই নৃত্য ছিল বাংলাদেশের বিখ্যাত রায়বেশে নৃত্য। সাধারণতঃ স্থানীয় নিম্নশ্রেণীর তুলে, বাগদীগণ এই রায়বেশে নৃত্য পরিবেশন করতেন এবং তাদেরই নিজস্ব সঙ্গীতলহরীতে মুখর করে তুলতেন শিববিবাহের শোভাযাত্রাকে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, শিবের বিয়ের শোভাযাত্রার প্রথম পর্বে সমাজের ভদ্র সন্তানগণ পয়সার বিনিময়ে তুলে, বাগদী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর মানুষদের দিয়ে তাদের নিজস্ব নৃত্যগীত করিয়ে নিতেন। এই নৃত্যে যে সকল নিম্নশ্রেণীর মানুষ অংশ গ্রহণ করত তার মধ্যে 'ঘোর্না' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী সময়ে এই শোভাযাত্রা ও সঙ্গীত-নৃত্য জনপ্রিয়তা অর্জন করলে ভদ্রসন্তানগণও এতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ক্রমে এটি সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের হাতে চলে যায়।

শোভাযাত্রায় ময়ূরপঙ্খীর পরে এক ব্যক্তি ঢেঁকির উপর নারদ সেজে সকলকে শিবের বিয়ের আমন্ত্রণ জানাতে জানাতে অগ্রসর হতেন। এই নারদের পেছনে থাকত পুতুল নাচের আসর। চারখানি বাঁশ বাঁধা হত এবং তার চারদিকে পর্দা দিয়ে ঘিরে সেটিকে বহন করা হত। এরই ভিতরে মানুষ থাকত এবং পুতুল নাচ প্রদর্শন করত। পুতুল নাচের পিছনে চলমান অবস্থায় যাত্রার মত 'তারকারাক্ষসী বধ' প্রভৃতি পালা অনুষ্ঠিত হত। এই শোভাযাত্রায় 'গাঁজার' দোকানও থাকত। আবার বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরী 'লঞ্চ', 'ট্রাম', 'ষ্টীমারও' শোভাযাত্রায় চালান হয়েছিল বলে জানা গেছে। একবার 'ফুটবল বিয়ের ফুল' নাম দিয়ে শোভাযাত্রায় সুন্দর একটি জিনিষ প্রদর্শিত হয়েছিল, যার শিল্পগুণ ছিল অতি উচ্চমানের। কাগজ, খড়, বাখারী ইত্যাদি দিয়ে তৈরী একটি পদ্মফুলের পাঁপড়ি মোড়া কুঁড়ি— তার মধ্যে গায়ক ও নর্তকের দল আশ্রয়

গ্রহণ করেছিলেন। লোকপরিপূর্ণ স্থানে এই পদ্মের পাপড়ি মেলে যেত এবং পাপড়ির অভ্যন্তরে অবস্থিত শিল্পীগণ নৃত্য গীত পরিবেশন করতে আরম্ভ করতেন, এতে প্রধানতঃ 'বিজয় থিয়েটারের' সদস্যরাই অংশগ্রহণ করতেন। বিষয় নির্বাচন ও শিল্পকুশলতায় প্রতি বৎসরের শোভাযাত্রাতেই অভিনবত্ব থাকত।

এই শোভাযাত্রা ছাড়াও পোড়ামাতলায় নানা বিষয় বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরী করে প্রদর্শিত হত—এর মধ্যে বিশেষভাবে নাম করতে হয়—'গঙ্গাবতরণ' 'বৃষকেতুর মস্তক কাটা' প্রভৃতি। সাধারণ মানুষ এগুলি দেখে অপার আনন্দ লাভ করতেন এবং এগুলি খারাপ হলে মানুষের নিন্দাভাজন হতেন শিল্পীরা। এই শিল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে নাম করতে হয় শ্রীঅবনী কুমার দাস ও শ্রীশচীনন্দন গোস্বামীর। এঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও শিল্পকুশলতায় শিবের বিয়ের শোভা-যাত্রা বিষয় বৈচিত্র্য লাভ করত।

শোভাযাত্রায় 'সঙে'র ব্যাপক ব্যবহার ছিল। শিবের বরযাত্রী রূপে দেবতাগণ, তারপর ভূত-প্রেত ইত্যাদি 'থাকা' বা সঙ থাকত। মানুষ সঙ যখন যাকে পাওয়া যেত তাকেই করা হত। এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে হাস্যরস থাকত। ক্ষেত্র গবেষণায় জানা গেছে যে, বুড়োশিবের শোভাযাত্রায় প্রথমে সঙ বার হত না—ওই শিবের মন্দিরের কাছে নানাধরনের পুতুল সাজান হত। বুড়ো শিব হারিয়ে গেলে যোগনাথের বিয়ের শোভাযাত্রাতেই প্রথম সঙ বার হত। এ বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন শ্রীশচীনন্দন গোস্বামী। বুড়োশিব এবং যোগনাথ শিবের বিয়ের শোভাযাত্রাই খুব জাঁকজমক ও আড়ম্বরপূর্ণ ছিল। অন্যান্য শিবের বিয়ের শোভাযাত্রা সাজিয়ে বার হত না। পরবর্তী সময়ে সঙ এর ব্যবহার লোপ পেলেও সেইস্থান মাটির পুতুল দিয়ে পূরণ করার চেষ্টা হতো যোগনাথ শিবের

শোভাযাত্রায়। ১৯৮৫ সালের বিয়ের শোভাযাত্রায় মাটি দিয়ে তৈরী বিভিন্ন মানুষ, মাছওয়ালা ইত্যাদি দিয়ে শোভাযাত্রা সাজান হয়েছিল। ১৯৮৬ সালে চারচারি পাড়ার শিবের বিয়ের উৎসব স্থলে বিদ্যুতের সাহায্যে একটি রাক্ষসী নির্মাণ করা হয়েছিল, যার মুখ বন্ধ এবং খোলা হচ্ছিল। সঙ ছাড়াও মুখোশ ব্যবহারেরও রেওয়াজ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। রাক্ষস প্রভৃতির মুখোশ শোভাযাত্রায় ব্যবহার করা হতো। বিবাহ উপলক্ষ যোগনাথ, বুড়োশিব, মালোদের শিব, দণ্ডপানী প্রভৃতি শিবলিঙ্গকে মুখোশ এখনও পরিয়ে হাওদায় চড়ান হয়ে থাকে। এই মুখোশ নির্মাণে লোকশিল্পীগণ অসাধারণ দক্ষতা প্রদর্শন করে থাকেন। এই মুখোশগুলি তামা, পিতলের পাতের উপর মাটি লেপে তৈরী করা হয়ে থাকে।

শিবের বিবাহের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এই বিবাহকে উপলক্ষ করে একসময়ে অসংখ্য সঙ্গীত রচিত হতো। ভাব-সম্পদে ও কাব্যসৌন্দর্য্যে মূল্যবান এই সঙ্গীতগুলির রচয়িতা ছিলেন সাধারণ পল্লী কবিগণ। যদিও এই বিবাহ উপলক্ষে এখন আর তেমন সঙ্গীত রচিত হয়না, তবুও ক্ষেত্রবিশেষে কবিগণ এখনও রচনা করেন সামান্য পরিমাণে হলেও উপহার ও সঙ্গীত। বিবাহকে কেন্দ্র করে রচিত সঙ্গীতগুলি সুর সহ-যোগে গাওয়া হতো দর্শনার্থীদের মাঝে। সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন সর্বশ্রী জ্ঞানরঞ্জন রায়, মতিলাল রায়ের পুত্র ভূপেন্দ্র নারায়ণ রায়, জগবন্ধু পাল প্রভৃতি। অধিকাংশ গানের সুরারোপ করতেন শ্রী শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই সঙ্গীতগুলির অধিকাংশই আজ অবলুপ্ত। যে সকল সঙ্গীত একদা মানুষকে মুগ্ধ করত, আজ বহু চেষ্টা করেও তার সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার। অথচ একথা সত্য এই সঙ্গীতগুলি যথাসময়ে সংগৃহীত হয়ে রক্ষা করা হলে রক্ষা

পেত এক অমূল্য সম্পদ। নবদ্বীপের সমাজ ও জীবনের এক বিরাট অংশ হয়ত আবিষ্কার করা সম্ভব হতো এই সঙ্গীতগুলির মধ্য দিয়ে। ক্ষেত্র গবেষণায় এই জাতীয় কিছু সঙ্গীত উদ্ধার করা হয়েছে। নিম্নে সঙ্গীতগুলি উৎকলন করা হলো।

(১)

(যোগনাথ শিবের জলসাধা গীত। রচয়িতা—জগবন্ধু পাল)

"দেখ দেখ সখী সবে, তোদের
কুমারী বিয়ের জাঁক বটে।
জাঁকেতে জাঁকবে বটে, তোদের ঘটে
বর যদি লো এসে জোটে ॥

ভস্মমাখা ফণীন্দ্র পতি, ওমা সে উমাপতি,
সিদ্ধান্ত বাগীশ সে যে, সিদ্ধি তার মতি,
তাইতে মনে ভয় লো পাছে, অঘটন ঘটে ঘটে,
ওলো তাইতে মনে ভয় লো, পাছে
সিদ্ধি যদি নাহি ঘটে।

যা হয় তা হোক লো এখন, দে না এখন,
উমার গায়ে হলুদটুকু, নইলে কখন
দিবি বল ; কাল মিশবে কালের পটে,
ওলো কাল মিশাবে কালের পটে,
সোনা দানা যা আছে তোদের,
সাজিয়ে নে সব মেয়েদের।

সেজেগুজে বেরিয়ে পর, গোলযোগ সব যাক মিটে,
ওলো বাজনা যে সব গেল হেঁটে ॥

দুর্গা নামে যাত্রা কর
কৈলাসপতি কল্যাণ কর।
শক্তিমতি হবে পতি, সিদ্ধিমতি যাবে চটে
ওলো সিদ্ধিমতি উঠবে ফুটে॥

ভরা বসন্তে ফুটলো ফুল
যত মধুপ হল আকুল।

বিয়েতে ব্যাকুল আজ, কি পাহাড়ে হাটে মাঠে
ওলো কি পাহাড়ে হাটে মাঠে॥
শ্রীনাগরী কক্ষে নাও
কুলডালা মাথায়, গাও,
মধুমাসে মধু পাবি, তাড়া নিয়ে চল ছুটে,
ওলো তোরা নায়ে চল হেঁটে॥
যোগনাথ উমার জল
ওলো সাধবি যদি বল।

সাধনায় আসবে বল, সকল জ্বালা যাবে ছুটে,
ওলো সব বাঁধা যাবে ছুটে॥"

(২)

রচনা—জগবন্ধু পাল

"তোমারি ডম্বরু বাজিল সঘনে,
তোমারি ডম্বরু দিতেছে তাল।
বসন্ত চৈত্রে বাসন্তী এসেছে,
ধর করে কর হে মহাকাল।
ত্রিংশো বর্ষ জগবন্ধু পাল,
পালিল উৎসব সভায় বিশাল।

আশীষ মাগে বারুজীবি দল।
দাও দেবাদিদেব দীন দয়াল ॥
আজি নদীয়া নগরে লয়ে মঙ্গল ঝারি,
বাজাও শঙ্খ ধরি শ্রীআঘরি ॥
গৌরী গঙ্গেশ মিলনে জলসাধা।
আনন্দে কর হয়ে কুমকুমে লাল ॥"

(পরবর্ত্তী গান দুটির রচয়িতাও জগবন্ধু পাল। যোগনাথ শিবের বিবাহ অবলম্বনে গান দুটি রচিত।)

(৩)

"পুলকিত জোছনাতে বাসন্তীকার সনে
পাগলা ভোলার আজ বিয়ে,
তুমি ভোলা যোগনাথ
ঘটিবে না পরমাদ;
কৈলাসে যাবে তাকে নিয়ে।
দিগে দিগে (দিকে দিকে ?) শোনা যায়
প্রকৃতিরা গান গায়,
কী মধুর মিলনের সুরে।
আকাশে বাতাসে বায়,
হিল্লোল বহিয়া যায়
গৌরীর মন চলে উড়ে ॥"

(৪)

"গিরিরাজ গৃহে উদিতা গৌরী
বসন্তে হেম বরণী

ঢুলু ঢুলু আঁখি এসেছে ধুর্জটি
তব বর্ণিনী।
অপূর্ব্ব শোভা রজত হিরণে,
হেমগিরি যেন বালার্ক কিরণে,
ডমরু ত্রিশূল বাজে সুশোভনে
পুলকিত করি ধরণী"

(শিবের বিবাহ অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর গীত একটি গীতি)

রচনা— জগবন্ধু পাল

অয়ে—অস্থিমালী অভয় দাও, অধীর অধীনে,
জয় জয় অট্টহাস, সকর্থীরে ত্রাণ হে।
আয়ে—আশুতোষ আতুর আশ্রয়, তুমি অতি পবিত্র হে,
জয় হর আত্মারাম আনন্দ আধার হে।
ইয়ে— ইন্দ্রিয়নাশক ঈশ, ইহকাল অনাথ নাথ,
জয় জয় হে ঈশান, ইজ্যা লও হে।
উয়ে— উমাপতি উমেশচন্দ্র, নিরুপায় উপায়
জয় জয় উর্দ্ধরেতা ঊর্দ্ধস্য বরণ হে।
ঋয়ে— ঋষেশ ঋষভধ্বজ, অগতির গতি
জয় জয়, ঋষপতি সৃষ্টি ঋষ্টি নাশ হে।
কয়ে— কাশীনাথ করুণা কর, এ ক্লিষ্ট ভক্তজনে
জয় জয় কালঞ্জর কুলেশ্বর তুমি হে।
খয়ে— খেচর খর্ব্ব কর এ খচিত রিপু গণে
জয় জয় ক্ষমাশীল, ক্ষৌণীশচন্দ্র তুমি হে।
গয়ে— গঙ্গাধর পতি কর গমনাগমনে
জয় জয় পতিনাথ গর্ব্বিত ভাব নাশ হে।

চয়ে— চন্দ্রাপীড় চণ্ডীপতি, চাহ চঞ্চল চকোরে
চাই চন্দ্র চন্দ্রধর চিরঞ্জীব তুমি হে
জয়ে— জয়ন্ত যজ্ঞেশ্বর
জটাধর 'যোগনাথ'
জয় জয় জীবে দাও হে।
তয়ে— তারাপতি ত্রিলোচন
ত্রিভুবন তারণ।
ত্রাণ কর গো ত্রিশূলী, তাপিত ত্রাসিত জনে হে।
দয়ে— দেব দেব দণ্ডপানী
দিগম্বর দেবমণি
দানিও দেবেশ তুমি, দুর্লভ চরণ হে।
ধয়ে— ধূর্জটী ধুতুরাধারী
ধনধর্ম দানবারী
ধ্যানে জ্ঞানে ধরি যেন ধাতা তোমারে হে।
নায়— নীলকণ্ঠ নন্দীশ্বর
নয়নে নেহারী হর
নরনারী-পাপ-তাপ, যা করে জীবনে হে। □

[আগামী সংখ্যায়]

রাজা ষ্টোর্স

প্রোঃ নিরঞ্জন পাল

ফুলিয়া রেলবাজার, ফুলিয়া, নদীয়া

এখানে সর্বপ্রকার ষ্টেশনারী সামগ্রী প্রসাধনী, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কলকাতার দরে পাওয়া যায়। অফিসের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তাঁতের সামগ্রীও সরবরাহ করে থাকি।

ঠিকে ঝি

নীহার মজুমদার

আজ সোমবার। আপাততঃ আমি দিন কয়েকের জন্য অজ্ঞাতবাসে। ঠিকে ঝি'র তারণায় পালিয়ে বেড়াচ্ছি। লম্বা ছুটি থাকায় গিন্নী ছেলে মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি গেছে। আমি একা। সকালে অফিস ক্যান্টিন, রাতে যা হোক একটা কিছু গিলে শবাসন। বেশ ছিলাম। কিন্তু ঝামেলা পাকালো ঐ কার্ত্তিকের মাটা। ও শনিবার এসে বলল দাদাবাবু, বৌদি কয়েছিলেন ৫০০ টাকা হাওলাত দেবেন, আমার বোনঝি'র বে তে দিতে হবে। আমি তো 'থ'। কোথায় কষ্টে শিষ্টে একা থেকে দু পয়সা মাসিক ধার কমাবো, তা নয় উল্টে গিন্নীর প্রতিশ্রুতির ভূমিকা দিয়ে এত টাকা, পাবো কোথায়?

আমি বললাম, দেখো, এ সব ব্যাপারে আমি থাকি না আর তা ছাড়া আমার যা অবস্থা তাতে কোন টাকাই দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

শুনে বুড়ী তো অক্কা যায়! সে কি গো, তেনা যে বলেছিলেন সোমবার পাবো? না গো বাবু, সেটি হবে না। সোমবার সকালেই দিতে হবে।

মহা মুস্কিল। এমনিতেই দেনার দায়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত, তার উপর গিন্নীর অবর্তমানে কি যে জ্বালা জুটলো। আমি বল্লাম, দেখো আমার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। দেখছো না আমার ফ্রীজ নেই, কালার টিভি, ভিসিপি নেই, টেলিফোন নেই, এমনকি কেউ এলে এক্সট্রা খাটও নেই যে রাত্রিবাস

করতে দেব। তুমি তো ঐ বাড়ির অন্যান্য ফ্ল্যাটেও কাজ কর সকলের ঘরের খবর রাখো। বল তো আমার মত গরীব কেউ আছে কি?

কি যে বলেন বাবু! আপনারা খুউব ভালোলোক এত সাদাসিধেভাবে থাকেন বলেই আপনাদের হৃদয়টা কত বড়, সে আর আমাকে বলতে হবে না গো। ঐ ওদের যে এত পয়সা! কিন্তু দুঃখু বুঝো শুধু তোমরাই। মা লক্ষ্মীর মত তোমার পরিবার গো। দিবে দিবে। শুধু শুধু বাজানো।

এবার আমি বললাম, আচ্ছা দেখো, ঐ যে নীচের ফ্ল্যাট—ওরা তো সামনের মাঠ ঘিরে গত তিনদিন ধরে দীক্ষাগুরুর আগমন উপলক্ষ্যে কি ই না খরচ খরচা করছে। তোমাকেও তো ছেলে—বৌ আর গুড়ি—গুড়িদের নিয়ে দু বেলা আসতে দেখছি। বাবাজীর সামনে ওঁদের কাছেও চাওনা?

না গো বাবু, সে হয় না। লোকটার কি খরচ হচ্ছে তা দেখেও কষ্ট হয়, তারপরেও কি করে চাই? তুমিই দেবে। সোমবার সকালে কিন্তু!

কি করি? ছেলেমেয়েগুলো নতুন ক্লাসে উঠেছে জামা কাপড় বই খাতা কিনতে গিয়ে চাল আর মুদির দেনা শোধ হ'ল না। ভাবলাম পরিবার যখন অন্যত্র, কিছুটা 'হাল্কা' হবে। কিন্তু।

এরকম আর একবার ফাঁপরে পড়েছিল আমার ছোটভাই। ওর বাড়ির ঠিকে ঝি ভাই-এর বৌ নীতা'র কাছে জলের দামে জমি কিনবে বলে এক হাজার টাকা ধার চাইলো। দশমাস বেতন না নিয়ে শোধ দেবে—এই প্রতিশ্রুতিও ছিল। নীতা তো আহ্লাদে আটখানা। পদিঝিকে টাকাটা দিয়ে অন্ততঃ দশমাস তো আটকানো গেল। ও আর নাগা করবে না, মুখও ঝামটাবে না। লুকিয়ে টাকাটা দেওয়া হ'ল।

ব্যাস তারপর কাল এল্লো না, পরশু না, তরশু না সাতদিন এ্যাবসেন্ট। বাসন মেজে ঘর ধুয়ে নীতা'র পালা'র যাওয়ার অভ্যাসে ছাই পড়ল। ভাই-এর বৌ হঠাৎ সেদিন পদ্দিকে অটো'তে দেখে, সঙ্গে স্বামী বাচ্ছা।

সে কি গো পদ্দি, তুমি যে আসছো না বড় ? না গো দিদিমণি একটু অসুবিধেয় আছি যারো এখন।

বা-বা। টাকাটা নিলে আর অসুবিধেয় পড়লে। এভাবে ঠকানোর কি মানে হয় বল তো ?

কি ? ঠগ্ বললেন ? এমন বাড়িতে আমি নেই। তুমি যে এত নীচ আমি জানতাম না। আর যাচ্ছি না বাপু। ঢের হয়েছে। তবে হ্যাঁ সুবিধে মত টাকাটা ওঁর হাত দিয়ে পৌঁছে দেব। আর মুখদর্শন করতে চাই না। নীতা ডুকরে উঠেছিল।

তা আমি এখন কি করি, কোথায় যাই। হ্যাঁ, দি আই-ডিয়া ! ঐ দিনই ফ্ল্যাট ছেড়ে আমার বন্ধুর মেসে চলে এসেছি আর যাবো সোম পেরিয়ে, মঙ্গল পেরিয়ে বুধবার—ঐ দিন গোপাও ছেলেমেয়ে নিয়ে ফিরবে। তারপর দেখা যাক গিন্নীর সঙ্গে ওর লড়াইটা কোথায় গড়ায়। আর যদি কাজ ছেড়ে দেবার হুমকি ছায় তো পোষা যারো। আবার নীতা।

কার্ত্তিকের মাকে কিসসু বললাম না। ও চলে গেলে ঘর লক্ করে পাশের ফ্ল্যাটে মিঃ বড়ুয়াকে চাবিটা দিয়ে বললাম হঠাৎই অফিসের কাজে বাইরে যাচ্ছি, ফিরতে দিন কয়েক সময় লাগবে। গোপা'রা বুধবার সকালে এলে দয়া করে চাবিটা দিয়ে দেবেন। ও ভালো কথা। কার্ত্তিকের মা-কেও এই ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবেন। এ'কদিন ওর ছুটি।

আপাততঃ বন্ধুর মেস-এ। ডাল্টি ছাড়া কাপে কৃষ্ণ-চা আর চারমিনার। এখন একটাই ভাবনা গোপা যদি বুধবার সকালে না আসে আর কার্ত্তিকের মা .... ? ?

টুকরো খবর

নির্বাচনে নদীয়ার ফলাফল

সদ্য সমাপ্ত দশম লোকসভা নির্বাচন ও এ রাজ্যে একাদশ বিধানসভা নির্বাচনে নদীয়া জেলার ফলাফলে পঃ বঙ্গের অন্যান্য জেলার মত বামফ্রন্টেরই উল্লেখযোগ্য জয় হয়েছে।

নদীয়া জেলায় লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রের সংখ্যা দু'টি। (১) কৃষ্ণনগর (২) নবদ্বীপ (তপ)। দুই কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা যথাক্রমে ৯২৮৫৬২ এবং ১০৯৪২১৫। এর মধ্যে কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৭৬৪৫৫৫। বাতিল ভোটের সংখ্যা ১৫৬১৮। প্রার্থী ছিলেন কংগ্রেস, সি, পি, এম, বি, জে, পি, আই, পি, এফ, বি, এস,পি ও জনতা পার্টির সদস্যগণ। কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে নির্বাচিত হয়েছেন সি, পি, এম, এর অজয় মুখার্জী। তাঁর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৩২৪৫০৮। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। তিনি পেয়েছেন ২৬৪৯৩৩ ভোট। সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছেন বি, এস, পি-র শ্রীমন্ত মজুমদার ২৩৩২টি।

নবদ্বীপ (তপ) কেন্দ্রে মোট ভোট পড়েছে ৯১২১৯৯। এরমধ্যে বাতিল হয়ে যাওয়া ভোটের সংখ্যা ১৫৫৮৯। প্রার্থী ছিলেন ৪ জন। কংগ্রেস, সি, পি, এম, বি, জে, পি, ও বি,এস,পি পার্টির। এখানেও নির্বাচিত হয়েছেন সি,পি,এম এর অসীম বালা। প্রাপ্ত ভোট ৪১৮৩৭৪। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেসের অপূর্বলাল মজুমদার। পেয়েছেন ৩৫১৭৯৭। সব থেকে কম ভোট বি,এস,পির সত্যরঞ্জন রায়ের, ৬০৯০টি।

বিধানসভায় এ জেলায় কেন্দ্রের সংখ্যা মোট ১৫টি। কেন্দ্রগুলো হল— (১) করিমপুর, (২) পলাশীপাড়া,

(৩) নাকাশীপাড়া, (৪) কালীগঞ্জ, (৫) চাপড়া, (৬) কৃষ্ণগঞ্জ (তপ), (৭) কৃষ্ণনগর (পূঃ), (৮) কৃষ্ণনগর (পশ্চিম), (৯) নবদ্বীপ, (১০) শান্তিপুর, (১১) হাঁসখালি (তপ), (১২) রাণাঘাট পূর্ব (তপ), (১৩) রাণাঘাট (পশ্চিম), (১৪) চাকদহ ও (১৫) হরিণঘাটা।

এই কেন্দ্রগুলো থেকে যাঁরা নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা হলেন—

কেন্দ্র	নির্বাচিত প্রতিনিধি	প্রাপ্ত ভোট
করিমপুর	চিত্ত বিশ্বাস (সি,পি,এম)	৫৩৩৪৯
পলাশীপাড়া	কমলেন্দু সান্যাল (”)	৫১৮৮০
নাকাশীপাড়া	কবিরুদ্দিন আহমেদ (”)	৪৪২৫৪
কালীগঞ্জ	আবদুস সালাম মুন্সী (কং)	৩৯২৪৫
চাপড়া	মীরকাশেম মণ্ডল (সি,পি,এম)	৫৪১৬২
কৃষ্ণগঞ্জ (তপ)	সুশীল বিশ্বাস (”)	৪৮৮৩৪
কৃষ্ণনগর (পূঃ)	শিবদাস মুখার্জী (কং)	৪৫৪০০
কৃষ্ণনগর (পঃ)	সুনীল কুমার ঘোষ (সি,পি,এম)	৪৭১২৮
নবদ্বীপ	বিশ্বনাথ মিত্র (”)	৫৪২০১
শান্তিপুর	অজয় দে (কং)	৫৬ ০৭
হাঁসখালি (তপ)	নয়ন সরকার (সি,পি,এম)	৬০২২৩
রাণাঘাট পূঃ (তপ)	বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাস (”)	৫৮৯৭৩
রাণাঘাট (পঃ)	সুভাষ বসু (”)	৫৩ ৮২
চাকদহ	সত্যসাধন চক্রবর্তী (”)	৭৭৩৩৩
হরিণঘাটা	ননীগোপাল মালাকার (”)	৬৩৫৮৯

সবচেয়ে বেশি ভোটে জয়লাভ করে এই জেলা থেকে একমাত্র মন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন সত্যসাধন চক্রবর্তী। সত্যসাধন চক্রবর্তী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। □

সমকাল

বর্ষ ১০ ☐ সংখ্যা ৭ ☐ ১৫ আগস্ট ১৯৯১
ভাদ্র ১৩৯৮

সাহিত্য সৈকত

ভাদ্র ১৩৯৮ ১৫ আগষ্ট ১৯৯১

লেখক সূচিতে যাঁরা আছেন

হরপ্রসাদ মিত্র কাকলি ভট্টাচার্য তুষার শুভ্র শর্মা ঈশান চন্দ্র মিশ্র শৈলেন্দ্র হালদার মধুসূদন পাল কাতুকুতুবুড়ো গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায় উজ্জ্বল কুমার মুখোপাধ্যায় প্রাণেশ সরকার সুজিৎ কুমার রায় প্রভাত মুখোপাধ্যায় রাজর্ষি বিশ্বাস সায়ন্তন বসু অভিষেক ভট্টাচার্য পরমা মিশ্র প্রবীর হালদার বিতান ভট্টাচার্য সন্দীপন সরকার দেবাশীষ বিশ্বাস পৌলমী মিত্র সুচিত্রা পাল অভিজিৎ সিকদার মলয় রায়চৌধুরী অরিন্দম বিশ্বাস মৌসুমী সাহা কৌশিক দাস অমল বিশ্বাস মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায় দেবরাজ মুখোপাধ্যায় সাধনা ঘোষ মিঠু পাল

প্রচ্ছদ শিল্পী : রাজেশ্বরী সিনহা (বয়স—৬)
মডার্ণ স্কুল, ব্যারাকপুর

হুকেল !

সিঁধকাঠি দিয়ে যারা চুরি করত তাদের বলা হত সিঁধেল চোর। কংক্রিটের যুগে এরা মাতুঘরের বাসিন্দা এমন ভাবার কারণ নেই। ইদানীং এক নতুন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে সিঁধেল চোরদের আদলে। এরা হুকিং, ট্যাপিং-এর সাহায্যে বিদ্যুৎ চুরি করে। তাছাড়া এক শ্রেণীর চোর বিদ্যুতের তার চুরি করে হাজার হাজার ঘরে, কলকারখানায় একসঙ্গে সিঁধ কাটে। ফলে প্রকৃত গ্রাহক চরম দুর্ভোগে পড়েন।

বিদ্যুৎ পর্ষদ নাস্তানাবুদ হয়। রাজস্বের ভাঁড়ারে টান পড়ে। সর্বস্তরে বানচাল হয়ে যায় নির্দিষ্ট পরিকল্পনা।

সিঁধেল চোরদের নব সংস্করণ 'হুকেল'দের বিরুদ্ধে চলছে আমাদের লাগাতার লড়াই। আপনিও এই লড়াইয়ে সামিল হোন।

জন জীবনে প্রত্যাশার প্রতীক

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

সাহিত্য সৈকত/ভাদ্র ১৩৯৮/১৫ আগষ্ট ১৯৯১

পুজো মরশুম
শুরু হয়ে গেছে
আর দেরী নয়

সুতোর কোয়ালিটি, ডিজাইনে নতুনত্ব, টেকশই ও রঙের গ্যারেন্টি এসব পাবেন আমাদের কাছেই।

দেরী করবেন না, ভিড় লাগার আগেই আপনার পছন্দের শাড়ীটি ঘরে তুলে নিন।

টাঙ্গাইল শাড়ীর ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান—

শাড়ী কুঠির

প্রোঃ নলীগোপাল দাস

চটকাতলা, ফুলিয়া, নদীয়া।

ফোন—ফুলিয়া ৩৯

কলকাতা শো-রুম ফোন ঃ ৪০-৭৩৮৭

রাজা ষ্টোর

প্রোঃ নিরঞ্জন পাল

ফুলিয়া রেলবাজার, ফুলিয়া, নদীয়া

সর্বপ্রকার ষ্টেশনারী সামগ্রী প্রসাধনী, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কলকাতার দরে পাওয়া যায় এখানে। অফিসের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তাঁতের সামগ্রীও সরবরাহ করে থাকি।

দশ বছরের ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য সৈকত'

একত্রে হাফ রেক্সিন বোর্ড বাঁধাই দু'টো ভল্যুমে পাওয়া যাচ্ছে। দাম: সাধারণের জন্যে একশ' কুড়ি টাকা, লাইব্রেরীগুলোর জন্যে একশ' টাকায়।

এতে পাওয়া যাবে নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থান ও বিষয়ের ওপর তথ্যপূর্ণ বহু প্রবন্ধ নিবন্ধ, জেলার এবং জেলার বাইরের বহু খ্যাত অখ্যাত লেখকদের মৌলিক রচনা, শিশু শিক্ষা সম্পর্কে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাবনা চিন্তা, শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিশু পাঠক্রম বিষয়ক নানা আলোচনা ও অন্যান্য মূল্যবান রচনা।

মোট কথা 'সাহিত্য সৈকত' এর এই দশ বছরের পরিবেশনার মধ্যে নদীয়া জেলাটাই ছড়িয়ে রয়েছে ইতস্ততঃ তার বিভিন্ন লেখনীর বিভিন্ন শিরোনামে। আমাদের ধারণা সাম্প্রতিক নদীয়াকে জানতে হলে 'সাহিত্য সৈকত' এর এই দশ বছর অপরিহার্য। আপনিও একটি সেট সংগ্রহ করুন। □

সোনার বাজারে এখন আগুন তবুও প্রিয়জনকে উপহার তো দিতেই হবে। দাম যা-ই হোক না কেন সোনা ছাড়া কি কোন শুভ অনুষ্ঠান চলে? সোনার কোন বিকল্প নেই।

আসুন, আপনার সাধ্যের মধ্যেই পছন্দের গয়নাটি গড়িয়ে দেবো আমরা।

আসুন—

এ, টি, জুয়েলার্সে

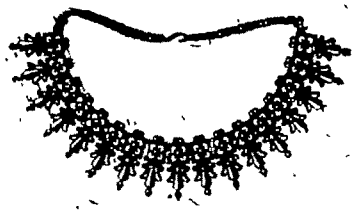

এ, টি, জুয়েলার্সের তৈরী গয়না পরুন। আপনার ভবিষ্যৎ সঞ্চয়কে সমৃদ্ধ করুন।

এ. টি. জুয়েলার্স

প্রোঃ শৈলেন্দ্র কুমার কর্মকার

ফুলিয়া রেলবাজার, (মাছ বাজারের সন্নিকট)

ফুলিয়া, নদীয়া।

[বিঃ দ্রঃ প্রতি বুধবার দোকান সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে।]

বক্কেশ্বর

হরপ্রসাদ মিত্র

যা-খুশি তাই বকেই শালিখ,
ছাতারেরাও তাই।
কাব্য লেখা তেমন তো নয়—
আমরা 'মানে' চাই।

আপনি বলেন,—'বুকের মধ্যে
যা ঢিপ্ ঢিপ্ করে,
তার কি সহজ মানে আছে?
—হাত দিয়ে কেউ ধরে?'

অর্থাৎ যা বোঝার ব্যাপার
সেটাই মানেহারা
অভিধানের-ব্যাকরণের
আইন কানুন ছাড়া।

কিন্তু যদি অং-বং চং
—ইক্‌ড়িমিক্‌ড়ি-ধ্যুৎ
—এই ভাষাতেই হৃদয় হাঁকে
বজ্র বা বিদ্যুৎ—

কী হবে তার পরিণতি
কী হবে তার গতি?
শালিখ-চড়ুই-ছাতারেদের
দল বাড়বেই অতি।

আজব দুনিয়া

কাকলি ভট্টাচার্য

চিংড়িপোতায় চিংড়ি মেলে
কইখালিতে কই,
শিংগিমারীর শিঙি মাগুর
ট্যাংরায় টানে মই।
পায়রাডাঙ্গার পায়রাগুলো
চিড়িয়ামোড়ে ওড়ে,
ময়নাগুড়ির ময়না যত
মুরগী মহল ঘোরে।
বক্‌খালিতে বকের সারি
হাঁসখালিতে হাঁস,
ঘুঘুডাঙ্গার ঘুঘু চরে
কাকদ্বীপে তিন মাস।
ময়ূরভঞ্জে ময়ূর ডাকে
বাদুড়িয়ায় বাদুড়,
ভালুকাতে ভালুক নাচে
ঢোলক বাজে তাক গুড়।
হরিণঘাটায় হরিণ ছোটে
হাতিশালায় হাতি,
কুমীরডাঙায় কুমীর হাঁটে
মাথায় দিয়ে ছাতি।

ঘোড়ালিয়ায় ঘোড়ার মেলা
নাগপুরেতে নাগ,
গাইবান্ধার গাইগুলো সব
গাইছে বসন্ত রাগ।
গরুমারায় গরুর বাথান
মহিষাদলে মোষ,
সিংহগড়ের সিংহ শাবক
চিবোচ্ছে দিলখোস।
বাগআঁচড়ায় বাঘের ঘাঁটি
হুঙ্কারে তার দিনরাত,
শিয়ালদহের শতেক শিয়াল
ডিগবাজি খেয়ে চিৎপাত।

বৃষ্টি

তুষার শুভ্র শর্মা

টুপ টাপ বৃষ্টির কি মজার খেলা
ঝম ঝম বৃষ্টির গম্ভীর গলা,
ঝির ঝির বৃষ্টি কাঁধে নিয়ে ঝোলা
ফির ফিরে বৃষ্টি খায় কোকো-কলা।

টিপ টিপ টুপ্ টাপ্

ঈশানচন্দ্র মিশ্র

বর্ষারাতের গান শুনেছো কখনো
সোনালী সৈকতে বসে
রূপোলী রাতে ফুলফুল তারার আকাশে
আধোছায়া আলোর গুঞ্জন
বিমুগ্ধ ভাবুকতার দ্রুত সঞ্চরণ।
ক্ষ্যাপা বাদলের মাতলামি দেখেছো কখনো
এতোল বেতোল পাতার কাঁপনে
ধূসর বিমর্ষ বালু উড়ু উড়ু
লোভাতুর হৃদয় স্পন্দনে
খোলা জানলায় নাচে উড়ন্ত এলোকেশ
হাওয়া-হাওয়া তোমার দুরন্তপনা বাঃ বেশ!
তবু বলি, পাহাড় জঙ্গলে, বর্ষা দেখে নিও একবার
দু' পাহাড়ের খাঁজে বয়ে যাওয়া ধারা
সম্মিলনের মিলিত ধ্বনি উচ্ছ্বাসে বাঁধন হারা
টিপ টিপ টুপ্ টাপ্ শাল সেগুনের পাতায়
মাদলের দ্রিম দ্রিম মনটাকে নাচায়।

শেয়াল মামার খেয়াল

শৈলেন্দ্র হালদার

মামা গো মামা শেয়ালমামা
দিচ্ছ হামা ওকলাহোমায়,
ফোকলা দাঁতে শেয়াল মামী
খেয়াল মামী সাধছে তোমায়।
মন জুড়ানী মঞ্জুরাণী
মামীর বাড়ি দুলিয়াজান,
গায়ে জড়ানো আলসেমিটা—
নাচনচন্দ্র ভুলিয়া যান!
বুনত তালি মাকড়শাদের
ধুত্তুরি ছাই, কেস-কাছারি!
পাঠশালাতে পণ্ডিতী ও
আটচালাতে স্বেচ্ছাচারী,
শেয়াল মামী কলংকিনী।
কিন্তু মামার একটি ধুয়া—
পদ্য লেখেন কলম কিনি'
ছাপান নিজেই হুক্কা হুয়া!

মাছ-চোর

মধুসূদন পাল

পালারাম পালোয়ান গায়ে দিয়ে আলোয়ান
বলে, 'ভজা, দেখি আলো আন তো !
মাছ-ধরা ঝাঁপ জালে পড়ে গেছে ফাঁকতালে
ইয়া বড় ধেড়ে মাছ—টান তো।'
দুইজনে মিলেজুলে টানাটানি করে তুলে
দেখে এটা মাছ নয়, মাছ-চোর।
ধরে তার কানটা, দেয় জোরে টানটা
পথে-পথে নিয়ে ঘোরে রাতভর।

সাগরের তীরে

কাতুকুতুবুড়ো

নীল নীল ঢেউ ঝিলমিল করে
জোছনায় ধোয়া ভিজে বালুচরে।
ঝাউগুলো ঠায়, মাথা নাড়ে কেউ ;
ভাঙে যেন তারা জোয়ারের ঢেউ।
কলকল মাছ কলতান শোনে
শিশিরের সুতো দূরে জাল বোনে
আলোছায়াময় নিকট ও দূর
শোনায় আমাকে অচেনা কি সুর।
সাগরের তীরে রোজ আসি, তবু
আজ মনে হয় আসিনি তো কভু !

গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছড়া

কলমেতে কালি নেই

জঙ্গলে দুই চোখ জ্বল জ্বলে হায়না,
মুরগীর কচি ঠ্যাং তার পেটে সয়না,
ক্যাথলিক চার্চের ঢং ঢং বাদ্য,
চোখে ঘুম খচ্ খচ্ বাকি প্রতিপাদ্য।
রাত্তির ফুটপাতে কোন্ বুড়ো কাশছে?
ধক্‌ধকে তিন চোখো ট্রাম বুঝি আসছে।
সারাদিন রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ বৃষ্টি,
ডিমভাজা সিম্ দিয়ে ফিষ্টির লিষ্টি।
সাইকেল-মাইকেল-অ্যাঞ্জেলো চড়তেন,
ভিন্‌দেশী কারিগর ভিক্ষি তা গড়তেন।
আরো সব হাঁজি পাঁজি কত কি তো ভেবেছি,
দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাসে নেমেছি।
ঐ দেখ জানালায় রোদ্দুর গন্ধ
কলমেতে কালি নেই তাই লেখা বন্ধ।

ঝরঝরে গাড়ি

ঝরঝরে গাড়ি নিয়ে লঝঝরে সিং,
গাড়ির সিটেতে বসে নাচে ধিন্ ধিন্,
গাড়ি তো চলে না আর,
লোকে বলে, 'কি ব্যাপার'?
লঝঝরে সিং বলে, 'গাড়ি ঠেলে দিন।'

উজ্জ্বল কুমার মুখোপাধ্যায়ের দু'টি ছড়া

(১)

ও পাড়ার গোয়ালা
কিনলো এক তোয়ালা
স্নান করে মুছবে বলে গা,
সারারাত পোয়ালে
গিয়ে ছাখে গোয়ালে
মুরগী তাতে দিচ্ছে বসে তা।

(২)

মুরগী বলে
পাড়বো না ডিম
সিম গাছে—
মোরগ বলে
কোথায় ডিম
নিম গাছে?
মুরগী মোরগ
হন্যে হয়ে
খুঁজছে কোথায়
ডিম আছে।

মনিরুল

প্রাণেশ সরকার

চরে আটকে আছে যে শিশুর মৃতদেহ
সে কে? মনিরুল—আমার শৈশব—না তুমি?
মানুষের সভ্যতায় ক্রমশঃই জমে ওঠে প্রবল সন্দেহ
শূন্য চরাচরে হতাশ্বাস জমে, আঁকড়ে পড়ে থাকি লবণাক্ত জমি।

এই মাটি আমার মা, এই গাছ প্রিয় সহোদর
এই জল আমার জীবন—তবু মনিরুল কেন মরে?
কেন আজ পৃথিবীর অন্ধকার সমস্ত বিবর
আগ্রাসী, উদ্ধত ফণা তোলে—কেন বিষ ঝরে?

এর সঠিক উত্তর আমার জানা নেই, আমি এক মূর্খ পথিক
আলাভোলা, ব্যাকরণহীন, ধূলোবালি যেখানে যা পাই
সযত্নে বুকে ধরে রাখি—প্রসাধনপ্রিয় লোক দেয় শত ধিক্
বলো তুমি—তুমি জানো, তুমি জানো এর উত্তর, ভাই

নিষ্পাপ মনিরুল জ্যোৎস্নায় শুয়ে আছে, পাশে গলিত মহিষ
যাও তাকে দেখে এসো এপারের শিশু, হাতে নিও শুভেচ্ছার শীষ

সুজিৎ কুমার রায়ের ছড়া

(১)

কাকদ্বীপে কাক নেই
সাগরেতে জল,
বক্‌খালি বক কই
এ কি হল বল ?
ছিনপাই যাবি যদি
বাসে উঠে পড়্‌;
তারাপীঠ যেতে গিয়ে
উঠেছে যে ঝড়।
মালদহে আম নেই
জানা নেই তোর ?
কলিকাতা ফিরে যাব
হলে ভাই ভোর।

(২)

শালিক ছানার পাল্লায় পড়ে
মুস্কিলে পড়েছি ;
সকাল দুপুর ধরার জন্যে
ফাঁদটি গড়েছি।
ধরতে পারলে বুঝিয়ে দেব
জ্যান্ত রেখে তাকে ;
এমন ভয় ধরিয়ে দেব
ধারে কাছে না থাকে।

গাছ ও নদী

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

গাছগুলো এক পায়ে
মাঠ পারে দাঁড়িয়ে
নদীটারে ডেকে বলে
শোন তুমি এধারে।

নদী বলে শুনবার
সময় যে নাই রে
চাষীরা যে ওপারেতে
বসে আছে ভাইরে।

এই শুনে গাছ বলে
এত তোর দম্ভ
এইবার শুয়ে তোর
গতি রোধ করবো।

কথা শুনে নদী হেসে
বলে ও বোকারে
জল যদি নাই দি
যাবি তুই কোথারে?

ছোটদের পাতা

রাজর্ষি বিশ্বাসের ছড়া (বয়স ৮)
ই. বি. প্রাথমিক বিদ্যালয়, সল্টলেক

খাওয়া

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে
আসবে একটা অটো
খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি
তুলতে যাব ফটো।

রাত

কী সুন্দর রাত
আজ খাব না ভাত।
করব শুধু গল্প
কথাত নয় অল্প।

যীশু

যীশু নিচ্ছেন বিশ্রাম
তাঁর শিষ্য খ্রীষ্টান।
যীশুর জন্ম বড় দিনে
সবাই মিলে কেক কেনে।

শরৎ

শরৎ কালে পূজার মেলা
ঘুরছে সবাই সারা বেলা।
ডুম্ ডুমা ডুম্ ঢাক বাজে
ব্যস্ত সবাই পূজার কাজে।

আমি চাই

সায়ন্তন বসু (বয়স ৯)
কে, কে, ইন্দু একাদেমি, দম দম ক্যান্টনমেন্ট

শালিক পাখি আনন্দেতে ওড়ে
গুবরে পোকা গান গেয়ে গাছে চড়ে।
ফড়িং ঘুরে বেড়ায় ডালে
জড়িয়ে ডানা মাকড়সারই জালে।
আমি চঞ্চল হয়ে উঠি
সারা বেলা কেবল ছোটাছুটি।
বিকেল হলে খেলার মাঠে যাই
সবার সাথে বল খেলতে চাই।

আনন্দ নিকেতন

অভিষেক ভট্টাচার্য (বয়স ৯)
আনন্দ নিকেতন শিশুবিহার, ফুলিয়া

কি আনন্দ কি আনন্দ
এ আনন্দ নিকেতনে
আনন্দেরই ধারা বহে
পড়ি খেলি এইখানে।
আমরা হাসি নাচি গাই
যাহা পাই তাহা খাই
সুখে মোদের জীবন কাটে
আর তো কোনো দুঃখ নাই।

সংকট

পরমা মিশ্র (বয়স ৯)
প্রোজেক্ট সেন্ট্রাল স্কুল, কিরিবুরু, সিংভূম

বিদ্যুৎ বাবাজী
হ্যাঁ জী না জী
এলো এই, গেল কই
কালো ভূত-পাজী।
হাড়জ্বালা মরকট
পড়াতেও সংকট
টেষ্টের সময়েতে
যত তার লট্‌ঘট্‌।

দুষ্টুমির হদ্দ
কিসে হবে জব্দ?
টিভিও যায় না দেখা
তাই লিখি পদ্য।

আমাদের বিদ্যালয়

প্রবীর হালদার (বয়স ১০)
বিদ্যানিকেতন শিশুবিহার, উমাগ্রাম

আমাদের বিদ্যানিকেতন
আশে পাশে কত গাছপালা,
বৃক্ষ রোপণে পরাই মোরা
তাদের গলায় মালা।
ফুল দিয়ে মালা গাঁথা
তাদেরই তো স্নেহ ছায়া।
এখানেই মন বাঁধা
কত খেলা কত মায়া।

এভারেস্ট

বিতান ভট্টাচার্য (বয়স ১২)
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন, ব্যারাকপুর

ওই যে দূরে, পাহাড় চূড়ে
পতপতিয়ে ঝাণ্ডা ওড়ে,
গেরুয়া সাদা সবুজ মিলে
মধ্যিখানে চক্র দিলে,
ভারত প্রতীক হয়।
সেই ভারত মায়ের আশীষ লয়ে
হিমালয়ের গাত্র বেয়ে,
তুই নির্ভীক উঠল গিয়ে
ভয়কে করে জয়।
এমনি যারা উঠবে গিয়ে
জীবনটাকে হাতে নিয়ে,
জয় যে তাদের হয়।

বিড়াল ছানা

সন্দীপন সরকার (বয়স ৮)
বিদ্যানিকেতন শিশুবিহার, উষাগ্রাম

ছোট্ট মিষ্টি বিড়াল ছানা,
নামটি আমার নেইকো জানা।
বেজায় বুদ্ধি বড়ই মজার,
চুরি করে খায় সে দুধ যে আমার।

হাসির খোরাক

দেবাশীষ বিশ্বাস (বয়স ৮)
বিদ্যানিকেতন শিশুবিহার, উষাগ্রাম

টাকা গোল পয়সা গোল
গোল আলুও গোল,
সবচেয়ে গোল দাদা
মাথার গণ্ডগোল।
গুড় মিষ্টি চিনি মিষ্টি
আরও মিষ্টি মধু
সবচেয়ে মিষ্টি দাদা
মুখের কথা শুধু।
তেঁতুল টক আমড়া টক
জলপাইও টক
সবচেয়ে টক দাদা
বড় মানুষী সখ।

মিল-অমিল

পৌলমী মিত্র (বয়স ৮)
বিদ্যানিকেতন শিশুবিহার, উষাগ্রাম

ড্যাং ড্যাঙা ড্যাং ড্যাং
গরুর আছে চারটে ঠ্যাং।
গরু খায় ঘাস,
ডিম পাড়ে হাঁস।
কুকুর হয় পশু,
মার খায় বিশু।
পাখীর আছে ডানা,
তাই সে হাঁটে না।

রেজাল্ট

সুচিত্রা পাল (বয়স—৯)
বিদ্যানিকেতন শিশু বিহার, উষাগ্রাম

সারাটা দিন ভাবছি শুধু
আজ বাদে কাল রেজাল্ট
কেমন করে করবো আমি
পরীক্ষাতে পাস।
দাদু যখন আসেন ক্লাশে
রেজাল্ট হাতে
ভয়ে মরে যাই।
ফেল করলে কান্না আসে
চোখে আসে জল।
পাস করলে আনন্দেতে মুখ ঝলমল।

গোলাপ

অভিজিৎ সিকদার (বয়স—৯)
বিদ্যানিকেতন শিশু বিহার, উষাগ্রাম

গোলাপ ফুলের পাঁপড়ি দেখে
আসছে ভ্রমর উড়ে—
কিসের খবর দিচ্ছে এনে
গোলাপ রানীর তরে।
গোলাপ রানী খুশি হয়ে
দিল খানা-পিনা
তাইনা দেখে ভ্রমর ভাষা
আনন্দে আটখানা।

পড়াশুনা

মলয় রায়চৌধুরী (বয়স—৯)
বিদ্যানিকেতন শিশু বিহার, উমাগ্রাম

পৃথিবীটা গোল কিনা
কী করে তা জানবো
ভূগোলটা হাতে নিলে
শুধুই তো ঘামবো।
অংকেতে কত কিছু
আছে সেথা সুদকষা
জ্যামিতি আর পাটিগণিত
হাতে নিয়ে শুধু বসা।
বাংলা ও ইংরাজী
পড়তে কি মন চায়।
দাঁতকটা নড়ে ওঠে
কপালটা ঘেমে যায়।
পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে
কি হবে উপায়—
পড়াশুনা বিনে কারও
বড় কভু হওয়া যায়!

তপ্‌সে

অরিন্দম বিশ্বাস (বয়স ৮)
বিদ্যানিকেতন শিশু বিহার, উষাগ্রাম

দাদু ডাকেন তাপসকে
কোথা গেলি তপসে ?
গাইটা দোয়াতে হবে
আয়না ছুটে জোরসে।
ড্যাং গুলিটা হাতে নিয়ে
তাপস পালায় খেলতে,
বলে আমার বয়েই গেছে
তোমার কথা শুনতে।
আজকে বাবা বাড়ি নেই
সারাদিন খেলা তাই,
দাদু কিচ্ছু বোঝে না কো
সব কাজে ডাকা চাই।

ফুটবল

মৌসুমী সাহা (বয়স—১০)
বিদ্যানিকেতন শিশু বিহার, উষাগ্রাম

ফুটবল ফুটবল বাঙালীর খেলা,
আমরা খেলি যে রোজ বৈকালবেলা।
দুই ধারে দুটি দল গোল বার দুটি,
গোলটি দেবার তরে করে ছুটোপুটি,
হার-জিৎ নিয়ে ভাই এই খেলা চলে,
একসাথে খেলি মোরা মিলে দুটি দলে।

মজার ছড়া

কৌশিক দাস (বয়স—৮)
বিদ্যানিকেতন শিশু বিহার, উষাগ্রাম

কোচবিহারে নেইকো কোচ
হচ্ছে কেবল অশান্তি।
থাকার মধ্যে শুধু আছে
শান্তিপুরে শান্তি ॥
রাণাঘাটের নেইকো রাণা
রাধানগরের রাধা।
পায়রাডাঙ্গায় গণ্ডা কয়েক
পায়রা আছে বাঁধা।
বক্‌খালিতে নেইকো বক
বনগাঁয়েতে বন।
আমার ছড়া হল শেষ
শুনতে লাগল কেমন?

দুষ্টু ছেলে

অমল বিশ্বাস (বয়স—৯)
বিদ্যানিকেতন শিশু বিহার, উষাগ্রাম

ননী বড় দুষ্টু ছেলে,
বেড়ায় শুধু খেলে খেলে,
ডাং গুলি আর কাঁচের গুলি—
মাটির ঢেলা হাতে পেলে।
ছোটদের মেরে মেরে,
ফেলেছে যে ঘা করে
হাত নিসপিস কাউকে পেলে
ননী এমনি দুষ্টু ছেলে।

গল্প

দুখীরাম

মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায় (বয়স—৯)
টাইনিটট চিলড্রেন্স মেথড স্কুল, ভাটপাড়া

এক গ্রামে ছিল এক গরীব ব্রাহ্মণ। তার একটি ছেলে ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় হয়েছিল বলে তার নাম রেখেছিল দুখী। একদিন দুখীর মা বাবা মারা গেলেন। দুখীর তখন দশ বছর বয়স। একদিন সে পুকুর ধারে বসে কাঁদছিল। সেই সময় ওখানকার জমিদারের ছোটো ছেলেটা পুকুরে স্নান করছিল। জমিদারের ছেলে রমেন সাঁতার কাটা জানত না। স্নান করতে করতে সে ডুবে যাচ্ছিল। দুখী দেখতে পেয়ে তাকে জল থেকে তুলে আনল। এতে জমিদার দুখীর ওপর খুশী হলেন। তিনি দুখীকে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিলেন। নিজের ছেলের সঙ্গে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। দুখীর খুব বুদ্ধি ছিল। সে রমেনের চেয়ে পড়াশুনায় এগিয়ে যেতে লাগল। এইভাবে সে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করে। এতে জমিদারবাবু খুশি হয়ে তাকে কলেজে ভর্ত্তি করে দিলেন। সে কলেজের সব পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করল।

তারপর চাকরীর পরীক্ষা দিয়ে দুখী খুব উঁচু পদের চাকরি পেল। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সে অনেক গরীব ছেলেমেয়েদের সাহায্য করেছে। জমিদারবাবু মারা গেলে সে জমিদারবাবুর নামে একটা ফ্রি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলো তাদের নারাজোল গ্রামে।

মণ্টু

দেবরাজ মুখার্জী (বয়স—৮)
টাইনিটেট চিলড্রেন্স্ মেথড স্কুল, ভাটপাড়া

কুসুমপুর নামে একটি ছোট গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে একজন গরীব চাষী ছিল। তার একটি ছেলে ছিল। ছেলেটির নাম ছিল মন্টু। মন্টুর যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন তার বাবা মারা যায়। তার কিছুদিন পর মন্টুর মা ও মারা যায়। তারপর থেকে মন্টু একা। মন্টুর আর পৃথিবীতে নিজের ব'লে কেউ রইল না। মন্টু মনের দুঃখে নিজের গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। শহরে গিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে, ভিক্ষে করতে লাগলো। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন গাঁয়েরই একজন প্রতিবেশী মন্টুকে ভিক্ষে করতে দেখে মনে মনে দুঃখ পেল। মন্টুকে নিয়ে সে তার বাড়ী গেল। মন্টুকে লেখাপড়া শেখাল। বড় হয়ে মন্টু ডাক্তার হ'ল। দেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করল।

ভারতবর্ষ

সাধনা ঘোষ (বয়স—১৪)
নিবেদিতা শিক্ষা মন্দির, ফুলিয়া,

ভারত আমার দেশ
ভারত আমার প্রাণ
তারি লাগি জীবন যেন
করতে পারি দান।

ধন্য আমি জীবন মরণ
গাই স্বদেশের গান
জনম জনম আসবো ফিরে
ধন্য হবে প্রাণ।

পরীক্ষা ভাবনা

মিঠু পাল (বয়স—১৪)
নিবেদিতা শিক্ষা মন্দির, ফুলিয়া

পরীক্ষাতো এগিয়ে এল
ভেবে ভেবেই মরি
বাংলাটাকে ভাবছি এখন
কোথায় বসে পড়ি।
হে ভগবান অঙ্কে যদি
পাঁচটা রাইট হয়
একশোতে পঞ্চাশ পেলে
নেইতো কোন ভয়।
ইতিহাসটা দেখলে পরে
বুক ধুক পুক করে
সংস্কৃত জলের মতো
মনে এসে পড়ে।
আর যে আছে ইংরেজী
পড়তে ভালো লাগে
লিখতে গেলেই বানান ভুল
তাইতো ভাবনা জাগে।

টুকরো খবর

শান্তিনিকেতন শিশুতীর্থের শিলান্যাস

বৃষ্টি ধোয়া লাল কাকরের জমিনে সকালের রোদ্দুর লুকো-চুরি খেলছিল। ধু-ধু প্রান্তর। সীমানা খুঁজে পাওয়া যায়না। চোখ মেলে তাকালে শুধু মনে হয় দূরের নীল আকাশ যেন এই কাকুরে লাল মাটির গা ছুঁয়ে আছে। এই মাটিরই এক-কোণে গত ১১ আগষ্ট '৯১ এর সকালে মাথার ওপর সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে অতিথি অভ্যাগত সমাবেশে "শান্তিনিকেতন শিশু-তীর্থে"র শিলান্যাস হল। দুই আদিবাসী বালক বালিকা মাটিতে পাথর পুঁতে শিশুতীর্থের শিলান্যাস করলো শান্তিনিকেতন থেকে ৩ কিঃমিঃ দূরে। ময়ূরাক্ষী সেচ খালের ধার ঘেঁষে ৬ একর ফাঁকা মাটির ওপর এই শিশুতীর্থের বিরাট কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনার কথা শোনালেন শিশুতীর্থের সভাপতি শান্তিনিকেতন পাঠভবনের অধ্যক্ষ সুপ্রিয় ঠাকুর। মা বাবার স্নেহচ্ছায়া থেকে বঞ্চিত নিরাশ্রয় শিশুদের নিশ্চিত আশ্রয় ও ভালবাসার আলোয় বেড়ে ওঠার সুযোগ ও স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যই হল শিশুতীর্থের প্রথম ও প্রধান কাজ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্য সচিব তরুণ দত্ত এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পান্নালাল দাশগুপ্ত। সভা শেষে রুক্ষ লাল মাটির বুকে নিজ হাতে বেশ ক'টি গাছ লাগিয়ে দেন পান্নালাল দাশগুপ্ত ও তরুণ দত্ত।

শিশুতীর্থের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে—

শান্তিনিকেতন শিশুতীর্থ, শোহিনী,
শান্তিনিকেতন ৭৩১২৩৫ বীরভূম

অথবা

৪০ই, পাম এভেনিউ, কলকাতা ৭০০০১৯

সম্পাদকীয়

সৃষ্টিধর্মী শিশুরা

'সাহিত্য সৈকত' এর বর্তমান সংখ্যাটি আমরা শিশুদের ছেড়ে দিয়েছি। ওদেরই লেখা ছড়া কবিতা গল্প ওদেরই আঁকা ছবিতে এ সংখ্যা পূর্ণ হয়েছে। ওদের সঙ্গে বড়রা যাঁরা লিখেছেন তাঁরাও শিশুই। বয়সের মাপকাঠিতে ওরা একটু বেড়ে গেছেন এই যা কিন্তু মনটা শিশুরই মত। তাই শিশুর এই মেলায় তাঁদেরও উপস্থিতি।

শিশুরা ছোট একটাই অর্থে—তা হলো বয়সের মাপ-কাঠিতে। কল্পনার রাজ্যে কি ভাবের রাজ্যে তারা কারো থেকে ছোট, ওরকম ভাববার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলে মনে হয়না। উৎসাহ পেলে তারাও সৃষ্টিধর্মী কাজে বড়দের পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। আসলে বয়সের হিসাবেই সে যা ছোট মানুষ হিসাবে তো ছোট নয়। প্রকাশিত সকলের লেখাই যে খুব মানের হয়েছে, তা নয় তা সত্বেও ছাপা হয়েছে সৃষ্টিধর্মী কাজে তাদের উৎসাহ দেবার জন্যে। আবার অনেকের কাছ থেকে পরিণত মানের লেখাও পেয়েছি।

ছোটদের বলি : যাদের লেখা ও আঁকা ছবি আজ ছাপা গেলনা তারা নিরাশ হয়োনা, আরো লেখ, একদিন ঠিক ছাপা হবে আর যাদের ছাপা হল তারা একবার লিখেই থেমে যেওনা, নিয়মিত লেখার অভ্যাস গড়ে তোল। লেখা হল নিজেকে প্রকাশ করা। তা করতে গেলে যে কাজটি গোড়াতে ভালভাবে করতে হয় তা হল অনেক পড়াশুনা। অনেক না জানলে সামান্যও বলা যায়না। তাই পড়ার অভ্যাসটাও গড়ে তোল। প্রথমেই বেছে নাও বিখ্যাত মানুষদের ছেলেবেলা।

SAHITYA SAIKAT
Bhadra 1398/15th August 1991 Rs. 2·00
Regd. No. 42112/81 R.N.I.

কৃত্তিবাসের ফুলিয়া জানে সর্বজন
টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের ধন।।

এবারের পুজো স্পেশাল
টাঙ্গাইল টেরাকোটা

টাঙ্গাইল টেরাকোটা পরুন,

আসুন—

● ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

● টাঙ্গাইল তন্তুজীবী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

●

ঠিকানা : সমবায় সদন ফুলিয়া, নদীয়া।
দূরভাষ : ফুলিয়া ২২

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য ● প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য
সার্কুলেশন ম্যানেজার : গণেশ রায়
● রেজিষ্টার্ড অফিস ও প্রকাশ স্থান :
সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া। ৭৪১৪০২
মুদ্রণ : মায়া প্রেস, কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা (উঃ)
সদর কার্যালয় : ১২৪/১ এস, এন, ব্যানার্জী রোড, ব্যারাকপুর
উত্তর ২৪ পরগণা।

সমকাল

বর্ষ ১০ □ সংখ্যা ৮ □ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯১
আশ্বিন ১৩৯৮

সাহিত্য সৈকত

আশ্বিন ১৩৯৮ ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯১

এ সংখ্যায় আছে

পবিত্র চক্রবর্তীর লেখা প্রবন্ধ :
নবদ্বীপের শিবের বিয়ে ৯

কাকলি ভট্টাচার্যর গল্প :
ছন্দার স্বস্তি ১৮

নতুন বই (পুস্তক পত্রপত্রিকা সমালোচনা) ২১

টুকরো খবর ২৫
সাক্ষরতা অভিযান (সম্পাদকীয়)

প্রচ্ছদ : রাজেশ্বরী সিনহা (বয়স ৫)

সাহিত্য সৈকত এর আগামী সংখ্যাই শারদীয় সংখ্যা। শারদ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ বাংলায় ভ্রমণ আর বাংলার তাঁত।

নির্মল পরিবেশ
আমাদের জন্মগত অধিকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জোর জুলুম করে আসন্ন দুর্গাপূজার
বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

আসন্ন দুর্গাপূজার চাঁদা আদায় নিয়ে কোনরকম অপ্রী
প্রদর্শন বা কারোর বিরক্তি উৎপাদন করা সরকার কোনমতেই
আদায় করতে এসে অন্যের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন তাঁরা যেমন
আইনের চোখেও সমান অপরাধী। তাই এ ব্যাপারে
হচ্ছে যে যদি কেউ আসন্ন দুর্গাপূজার চাঁদা নিতে এসে কা
বা দুর্ব্যবহার করেন তবে তার প্রতিকারের জন্য যেন সঙ্গে
জানান হয়ঃ

১) জেলা শাসক (২) অতিরিক্ত জেলা শাসক
থানার ও,সি, (৫) সার্কেল ইন্সপেক্টর (সি, আই,) (৬)
ডি, পি,ও) ৭) অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (৮)

চাঁদার সঙ্গে ভোগ খরচ বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ই
কং। আইনতঃ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য করা হবে।

জাতীয় সড়কপথে বা পথে ঘাটে যানবাহন থামিয়ে
ষ্টেশনে যাত্রী, ভেণ্ডার বা হকারদের কাছ থেকে জোর জবরদ
দোকানদার ও ব্যবসায়ীদের উপর চাঁদার জুলুম ও উৎপীড়
দণ্ডনীয় অপরাধ।

আগে থেকে স্থানীয় থানার অনুমতি নিয়ে এবং
কারীদের নামের একটি তালিকা এবং চাঁদা রসিদ বইয়ের
তবে দুর্গাপূজার চাঁদা আদায় করা যেতে পারে।

আসন্ন দুর্গাপূজার চাঁদা আদায় নিয়ে কারও কোনর
পূর্ববর্ণিত পুলিশ বা প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছে ফো
যেতে পারে, চাইলে অভিযোগকারীর নাম ঠিকানাও গো
চাঁদার জুলুমকারীর বিরুদ্ধে পুলিশ ও প্রশাসন থেকে

জেলা

ক্রমিক সংখ্যা ২০/৯১-৯২ আই,এণ্ড,সি,এ,

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের করণ

নদীয়া।

লোকসংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

লোকশ্রুতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্যসংস্কৃতি পর্ষদের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক **'লোকশ্রুতি'** পত্রিকার বর্তমান সংখ্যা অষ্টম, সপ্তম, ষষ্ঠ, পঞ্চম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি করণ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া এই ঠিকানায় পাওয়া যাচ্ছে। প্রতি সংখ্যা পাঁচ টাকা মাত্র।

নারায়ণ চন্দ্র বসু

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক,

নদীয়া।

ক্রমিক সংখ্যা—১৫/৯১-৯২

আই,সি,এ, (নদীয়া), তাং—২৯/৮/৯১

পুজো মরশুম
শুরু হয়ে গেছে
আর দেরী নয়

সুতোর কোয়ালিটি, ডিজাইনে নতুনত্ব, টেকশই ও রঙে গ্যারেন্টি এসব পাবেন আমাদের কাছেই।

দেরী করবেন না, ভিড় লাগার আগেই আপনার পছন্দে শাড়ীটি ঘরে তুলে নিন।

টাঙ্গাইল শাড়ীর ঐতিহ্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান—

শাড়ী কুঠির
প্রোঃ ননীগোপাল দাস
চটকাতলা, ফুলিয়া, নদীয়া।
ফোন—ফুলিয়া ৩৯
কলকাতা শো-রুম ফোন ঃ ৪০-৭৩৮৭

রাজা ষ্টোর
প্রোঃ নিরঞ্জন পাল
ফুলিয়া রেলবাজার, ফুলিয়া, নদীয়া

সর্বপ্রকার ষ্টেশনারী সামগ্রী প্রসাধনী, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য কলকাতার দরে পাওয়া যায় এখানে। অফিসের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তাঁতের সামগ্রীও সরবরাহ করে থাকি।

দশ বছরের ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য সৈকত'

একত্রে হাফ রেক্সিন বোর্ড বাঁধাই দু'টো ভল্যুমে পাওয়া যাচ্ছে। দাম: সাধারণের জন্যে একশ' কুড়ি টাকা, লাইব্রেরীগুলোর জন্যে একশ' টাকায়।

এতে পাওয়া যাবে নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থান ও বিষয়ের ওপর তথ্যপূর্ণ বহু প্রবন্ধ নিবন্ধ, জেলার এবং জেলার বাইরের বহু খ্যাত অখ্যাত লেখকদের মৌলিক রচনা, শিশু শিক্ষা সম্পর্কে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভাবনা চিন্তা, শিক্ষা পদ্ধতি এবং শিশু পাঠক্রম বিষয়ক নানা আলোচনা ও অন্যান্য মূল্যবান রচনা।

মোটি কথা 'সাহিত্য সৈকত' এর এই দশ বছরের পরিবেশনার মধ্যে নদীয়া জেলাটাই ছড়িয়ে রয়েছে ইতস্ততঃ তার বিভিন্ন লেখনীর বিভিন্ন শিরোনামে। আমাদের ধারণা সাম্প্রতিক নদীয়াকে জানতে হলে 'সাহিত্য সৈকত' এর এই দশ বছর অপরিহার্য। আপনিও একটি সেট সংগ্রহ করুন। □

পুজোর আর বেশি
দেরী নেই

না, মৃণ্ময়ীকে সাজাতে নয়, আমরা ব্যস্ত চিন্ময়ীকে সাজাতে।

আসুন আমাদের প্রতিষ্ঠানে—

এ. টি. জুয়েলার্স

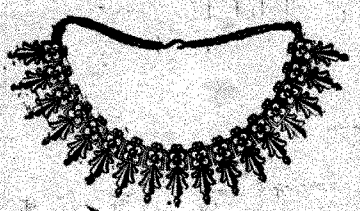

এ, টি, জুয়েলার্সের গয়না মানেই আসল সোনা রূপা।

এ, টি, জুয়েলার্স আপনার বিশ্বাসের প্রতীক।

এ, টি, জুয়েলার্স

প্রোঃ শৈলেন্দ্র কুমার কর্মকার

ফুলিয়া রেলবাজার, (মাছ বাজারের কাছে)

ফুলিয়া, নদীয়া।

বিঃ দ্রঃ প্রতি বুধবার পূর্ণ দিন বন্ধ।

পূর্ব প্রকাশিতের পর (৩)

নবদ্বীপের শিবের বিয়ে

পবিত্র চক্রবর্ত্তী

পয়ে— পঞ্চানন পশুপতি
পিনাকী পিনাকপাণি
পার কর, প্রিয়তম, পতিত পাতকী হে।

ফয়ে— ফণধর ধর তুমি
ভবভীষণ ভগালী
ভবেশ ভূতেশ তুমি, ভোলানাথ ভবপতি হে।

ময়ে— মহানট মহাদেব
মৃত্যুঞ্জয় তুমি দেব,
মহাকাল মহেশ্বর, মায়া তব মহিমা হে।

বয়ে— বিশ্বেশ্বর বৃষধ্বজ
রুদ্রদেব বামদেব
বিনয়ে বিনয় মাগি, বিরূপাক্ষ বরাক হে।

শয়ে— শিবশঙ্কর শ্রীকণ্ঠ
শূলী শম্ভু শিতিকণ্ঠ
সুপ্রসাদ শুভঙ্কর, শক্তিনাথ শক্তি দাও হে।

হয়ে— হর হর হিন্তী-হীর
হরিহর একেশ্বর
হয় যেন হরে ভক্তি, পার্ব্বতী হর তুমি হে।"

(উপরোক্ত সঙ্গীতগুলি আনুমানিক ১৩১৬/১২ সনে রচিত।)

এই সঙ্গীতগুলি ছাড়া দুটি সঙ্গীত বিক্ষিপ্তভাবে সংগৃহীত হয়েছে। রচয়িতার নাম জানা যায়নি।

(১)

শিব চলেছেন বিভার বেশে
নারদ বাজান বীণা,
পাড়াপড়শি ছুটে এল
বিয়ের কথা শুনে।
আপনি যেমন বাহন তেমন
ঘন ঘন ল্যাজ নাড়ে,
কাঁপিয়ে পবন বিশত যোজন
পর্বত ভাঙ্গিয়া পড়ে।
আয় সখী তো, বর দেখি তোর
বরের মাথায় টাক—

(২)

"রজত যিনি ধবল বরণ
ঢুলু ঢুলু আঁখি ভোলা।
মিলিবে সাথে কনক চাঁপা,
বামে মোদের গিরিবালা।"

১৯৮৬ সালের ক্ষেত্রগবেষণায় বারুজীবি শিব কমিটি পক্ষ থেকে শ্রীজীবনবন্ধু পাল প্রকাশিত ও শ্রীসুরেন্দ্র কুমার দাস রচিত "শ্রীশ্রী৺ যোগনাথ শিবের সহিত বাসন্তী দেবীর শুভ পরিণয় উপলক্ষে ভক্তি উপহার" সংগৃহীত হয়েছে, যে উপহারপত্রে তিনটি গীত ও একটি 'প্রার্থনা' প্রকাশিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সুরেন্দ্র কুমার দাস রচিত বলে, "তোমারি ডম্বরু বাজিল সঘনে" সঙ্গীতটি এই পত্রে প্রকাশিত

হলেও এটি প্রকৃতপক্ষে জগদ্বন্ধু পালের রচনা (বর্তমান প্রবন্ধের মধ্যেই সঙ্গীতটি উদ্ধৃত আছে জগদ্বন্ধু পালের নামেই)। সুরেন্দ্র কুমার দাস এর সঙ্গীত ও 'প্রার্থনা' নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

(১)

প্রণমি চরণে তব দেব ত্রিলোচন।
চিন্তামণি পঞ্চানন পতিত পাবন ॥
ব্যাঘ্র চর্ম পরিধানে শ্বেত বরণ।
অপরূপ রূপ তব উজ্জ্বল কিরণ ॥
ডুম্বুর, শিঙ্গার, ত্রিশূল করে দেখিতে সুন্দর।
আজ পুরাও বাসনা মম ওহে হরিহর ॥
শিরে তব জটাজাল তাহে ফণি মেলে।
ভস্মমাখা গায়ে তোমার হাড়ের মালা গলে ॥
রুদ্রাক্ষ মালা দোলে পাগল পশুপতি।
ভাঙ্ ধুতুরা খেয়ে তোমার ঢুলু ঢুলু আঁখি ॥
কামদেব নীলকণ্ঠ তুমি কাম জয়ী।
বীরভদ্র, ভূত-প্রেত, সঙ্গী নন্দী-ভৃঙ্গি ॥
বিশ্বনাথ ত্রিপুরারী বৃষভ বাহন।
মহাকাল ভোলানাথ ত্রিতাপ নাশন ॥

(২)

অনাদির আদি তুমি পরম দয়াল।
বিরুপাক্ষ দিগম্বর প্রেমের কাঙ্গাল ॥
উন্মত্ত ভৈরব তুমি ভ্রুকুটি ভয়াল।

ভক্তের অধীন দেব যতেক ভাগ্যবান ॥
বারুজীবি স্বামী তুমি অনাথের নাথ।
তোমার মহিমা প্রভু অপূর্ব মহান ॥
দুঃস্থ জীবে মুক্তি দাও কৈলাস ঈশ্বর।
শ্মশান শিখার শিব ওহে মহেশ্বর ॥
পাগলা ভোলা আপন হারা শ্মশানে আলয়।
যোগমগ্ন যোগনাথ সর্বজীবময় ॥
লীলাময়ের লীলা বোঝে কাহার শকতি।
নিজ গুণে ক্ষম মোদের দেব সৃষ্টি স্থিতি ॥
এমন দয়াল প্রভু আর কেহ নাই।
শ্রীচরণে স্থান মোদের দিও গো গোঁসাই ॥

প্রার্থনা

শক্তি দাও শক্তিধর তব কর্ম পালনে।
করুণার দাস এই বারুজীবি গণে ॥
যোগনাথ কীর্তিকথা যেই জন শোনে।
শমনে এগয়ে যেই যাই শিব ধামে ॥
ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু ভক্ত প্রাণ ধন।
জয় যোগনাথ জয় দাও সর্বজন ॥
সুরেন্দ্রের মনবাঞ্ছা করহে পূরণ।
অন্তিমেতে পাই যেন ঐ রাজীব চরণ ॥

ক্ষেত্রগবেষণায় শ্রীমতী নির্মলা গোস্বামী রচিত "যোগনাথের বিয়ে" বিষয়ে একটি ছড়া সংগৃহীত হয়েছে। ছড়াটি হল :

"চলরে ঢেঁকি তাড়াতাড়ি
চলরে আমায় নিয়ে
জানিস নে কো আজ যে আমার
মস্ত বাবার বিয়ে
ঢাকের বাদ্যি ড্যাংস ড্যাং
বাজছে কাড়া নাড়া
শুনছিস না নন্দী-ভৃঙ্গীর
গলাটা আজ চড়া
মাথার ওপর ঝুলছে আবার
রেশন কার্ডের খাঁড়া
তাই না দেখে বাবার আমার
গোঁফ হয়েছে খাড়া
মালসাটাকে উপুড় করে
ফুট কড়াই দিয়ে
এক ভাগ চাল তিন ভাগ কাঁকড়
মাল মশলা নিয়ে
বেহ্মদৈত্যি হাঁফ ছেড়েছে
হিসেব বুঝে দিয়ে
ভার পড়েছে আমার ওপর
নেমতন্ন করার
কাকে বলি কি যে করি
কত রকম 'ধরার"
যাই হোক বাবু হেঁকে বলছি
তোমরা সবাই এস

নেমতন্নর নিমন্ত্রণ কার্ড
সঙ্গে করে বসো
লোক খাওয়ানোর ভার পড়েছে
এমন ওপর যার
অবনী দাস নামটা তার
বড্ড ব্যবসাদার
গোঁসাই গিয়ে কিছুটা কাল
ছিলাম আমরা খাসা
কোথা হতে ওটা আবার
জুটে বাঁধলো বাসা
পেটে ঝামা ঘসে তোমরা
এসো মিলে সবাই
বাবার বিয়েয় খাবে এবার
ভাজা ফুট কড়াই ॥"

শিববিবাহের অনুষ্ঠানে প্রথমাবধিই সমাজের সর্বস্তরের মানুষ অংশ গ্রহণ করতেন। সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের সমবেত প্রয়াসে সার্থক রূপ লাভ করত এই অনুষ্ঠান। এখনও পর্য্যন্ত এই অনুষ্ঠান গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও জাতপাতের উর্দ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ লৌকিক অনুষ্ঠান। শ্রীজগদ্বন্ধু পালের বিবরণী থেকে (১৩১৬) জানা যায়—

"শিবচন্দ্র দে, জগদ্বন্ধু পাল — বিকালের চতুর্দ্দোলার সজ্জাকরণও শিব বাহির সম্বন্ধে বাইরেশে, ঢাকি ও ড্যার প্রভৃতি রওনা করণের ভার আবশ্যকমত ঢাকি ও শ্মশানওয়ালা প্রভৃতির বায়না দিবেন।

কোপেল মুসলমান, বাগান ঝাড় প্রভৃতি বাবদ—
ধার্য্য (এবার) ১২,—বাদ বায়না—৪,—পাওনা—৮,"

শিব বিবাহের এই লৌকিক অনুষ্ঠানটির মধ্যে কেউ কেউ প্রাচীন শস্য উৎসব ও উর্বরতাবৃদ্ধি অভিপ্রায়ের পরোক্ষ প্রভাবও অনুমান করে থাকেন। শিব বিবাহের এই অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয় সমাজ মানসের বিচিত্র আশা আকাঙ্খা, উল্লাস আনন্দ, সাধ ও সাধ্যের চিত্রখানি। শিবের বিয়ে তাই সমাজ মানসেরই দর্পণ।

শিবের বিয়ের প্রাণবন্ত এই অনুষ্ঠানটি বর্তমানে পূর্বের তুলনায় অনেক পরিমাণে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক সংকট, যুগ ও রুচির পরিবর্ত্তন, মানসিকতার পরিবর্ত্তন ইত্যাদির ফলে নবদ্বীপের প্রধান সাত শিবের বিয়ের মধ্যে কয়েকটি ইতিমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে। ১৯৮৫ সালে যোগনাথ শিবের বিয়ের শোভাযাত্রায় যে মাটির পুতুল সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, ১৯৮৬ সালের শোভাযাত্রায় তাও বন্ধ করা হয়েছে। নবদ্বীপের শিবের বিয়ের সাম্প্রতিক অবস্থা পর্যালোচনা করতে গিয়ে ১৯৮৬ সালের ১৯শে এপ্রিল বুড়োশিব মন্দির কমিটির পরিচালক সমিতির শ্রীসৌরভ ব্যানার্জী ও উৎসব কমিটির সম্পাদক শ্রীঅমলেন্দু ব্রহ্মচারী এক সাক্ষাৎকারে প্রবন্ধ লেখককে জানান কিছু সময় থেকেই স্পষ্টতঃ ১৯৮৬ সাল থেকেই তিলেশ্বর, দণ্ডপানী, পলেশ্বর এবং এলানে শিবের বিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে; কেবল বুড়োশিব, যোগনাথ, বালকনাথ, মালেশ্বর প্রভৃতি কয় শিবের বিয়েই এখনও প্রচলিত আছে। বাংলার এই বিশিষ্ট লোক উৎসবটিকে রক্ষা করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। □ [শেষ]

* বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই প্রবন্ধের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বহু মানুষের কাছ থেকে। তাঁদের সকলের কাছে বিশেষভাবে শ্রীজগবন্ধু পালের পরিবারবর্গ, স্বর্গত শ্রীরাম গোস্বামী, শ্রীসন্ধুকুমার গোস্বামীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বেকার ভাতা প্রকল্প—১৯৮৫

পশ্চিমবঙ্গের কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রগুলিতে নথীভুক্ত বেকার কর্মপ্রার্থীদের অবগতির জন্য এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১৯৯১-৯২ এবং ১৯৯২-৯৩ সালে মাসিক ৫০·০০ টাকা হারে দুই বছরের জন্য যে বেকার ভাতা দেওয়া হইবে তাহার জন্য নির্দিষ্ট আবেদন পত্রের ফর্ম সংশ্লিষ্ট কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্র হইতে আগামী ১০-১০-৯১ তারিখ পর্যন্ত যোগ্য প্রার্থীগণকে বিতরণ করা হইবে।

যোগ্যতাবলী ঃ—ক) ১-৪-৯১ তারিখে প্রার্থীর বয়স ৩০ বৎসরের উপর কিন্তু ৪০ বৎসরের নীচে হইতে হইবে। তপশিলী জাতি উপজাতি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ৫ বৎসর শিথিলযোগ্য। (খ) প্রার্থীকে ১-৪-৯১ তারিখে কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রে একাদিক্রমে ৬(ছয়) বছরের জন্য নথীভুক্ত হইতে হইবে (তপশিলী উপজাতি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ১(এক) বছরের জন্য, (গ) প্রার্থীর ব্যক্তিগত গড় মাসিক আয় ৫০·০০ টাকা এবং প্রার্থীর পারিবারিক গড় মাসিক আয় ৫০০·০০ টাকার অধিক হইবে না। (ঘ) প্রার্থী ইতিপূর্বে বেকার ভাতা বা সরকারী স্ব-নির্যুক্তি প্রকল্পে (যেমন সেসরু, সিউই, সেপাপ, আই,ইউ,ই,পি, আই,আর,ডি,পি, প্রভৃতি) সাহায্য পান নাই। (ঙ) পরিবারের কেবলমাত্র একজন সদস্যই এই বেকারভাতা প্রকল্পের সহায়তা পাবার যোগ্য।

আই,সি,এ, ২৯৪৬(৪)-৯১
ক্রমিক সংখ্যা—১৮ তথ্য (নঃ) তাং—৫/৯/৯১

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জাতীয় মেধা অনুসন্ধান পরীক্ষা, ১৯৯১-৯২

(রাজ্য পর্যায়)

১৯৯১ বর্ষটির জন্য রাজ্য পর্যায়ে জাতীয় মেধা অনুসন্ধান পরীক্ষা ২২-১২-৯১ তারিখে (রবিবার) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সর্বত্র বিস্তারিত বিভিন্ন কেন্দ্রগুলিতে অনুষ্ঠিত হইবে। স্বীকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের (পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, মাধ্যমিক শিক্ষার কেন্দ্রীয় বোর্ড এবং আই সি এস ই দ্বারা স্বীকৃত) এই বৎসরে (১৯৯১) ১০ম শ্রেণীতে পাঠরত ছাত্রগণ এবং যাহারা গত বার্ষিক পরীক্ষায় (৯ম শ্রেণী) অন্তত ৫০ শতাংশ হারে নম্বর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার যোগ্য হইবে। এই পরীক্ষা সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্যাদি এবং আবেদনপত্র নির্দেশাদি ৫-৯-৯১ তারিখ হইতে জেলা পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা)-র কার্যালয় হইতে প্রাপ্তিসাধ্য হইবে। যথাযথভাবে পূরণ করা আবেদনপত্র নিদর্শ ২৭-৯-৯১ তারিখের মধ্যে যাহার নিকট হইতে নিদর্শগুলি সংগ্রহ করা হইয়াছে সেই বিদ্যালয়সমূহের জিলা পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা)-এর নিকট জমা প্রদান করিতে হইবে। ২৭-৯-৯১ তারিখের পর আবেদনপত্র নিদর্শ গ্রহণ করা হইবে না।

আই.সি.এ, ২৯২৭(৫)৯১
ক্রমিক সংখ্যা—১৯ তথ্য (নঃ) দিনাংক—৫/৯/৯১

গল্প

ছন্দার স্বস্তি

কাকলি ভট্টাচার্য

ছন্দা প্রথম প্রথম বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা কি হচ্ছে। কেমন যেন গোলমেলে ঠেকতো সব কিছুই। তার মনে হতো বাড়িটা ভুতুড়ে নাকি!

ছন্দার স্বামী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। বদলী হয়ে সবে ব্যারাকপুরে এসেছেন। বাসা নিয়েছেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির দোতলার দু'টো ঘরে। পিল্লাই মার্কা ঘর। বিশাল বিশাল দরজা জানলা। টানা বারান্দা। বিরাট বাগান বাড়ি। চারপাশ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। নীচ তলার ঘরগুলোতে বসে অফিস।

ছন্দা তো বাড়ি দেখে খুব খুশি। ছোট্ট ঘরে সে একদন থাকতে পারেনা। তার ওপর দুই চঞ্চল ছেলেকে সামাল দেওয়া!

ক'দিন কেটে গেল। একদিন বিকেলে দুই ছেলেকে নিয়ে ছন্দা বেরুলো গঙ্গার ধারে বেড়াতে। পাশেই গঙ্গা। সন্ধ্যাবেলায় ফিরে এসে দেখে রান্নাঘরের টেবিল থেকে রাত্রি-বেলার জন্য রান্না করে রাখা ইলিশের সবকটা টুকরোই উধাও। বন্ধ ঘরে কি যে ব্যাপার ঘটল ছন্দা কিছুই ভেবে উঠতে পারলনা।

এর ক'দিন পর একদিন দুপুরে বিছানায় শুয়ে সবে চোখে তন্দ্রা এসেছে, রান্না ঘরে কি একটা শব্দ হতেই ছন্দা বিছানা ছেড়ে উঠে গেল। না, কেউ কোথাও নেই। শুধু চারটে কলা দু'টো আপেল টেবিল থেকে উধাও। সঙ্গে সঙ্গে মাছ চুরির কথাটা মনে পড়ে গেল ছন্দার।

পরের দিন দুপুরে সে আর টেবিলের ওপর কোন খাবার রাখলো না। রান্নাঘরের দরজাটা বন্ধ করে কান খাড়া রেখে সে চুপচাপ শুয়ে রইল। হঠাৎ খটাং করে কৌটো খোলার শব্দ হল রান্নাঘরে। ছন্দা পা টিপে টিপে রান্নাঘরে উঁকি দিয়ে দেখে দু'টো কাঠবেড়ালী বিস্কুটের কৌটো খুলে বিস্কুট খাচ্ছে। শব্দ শুনেই মুখে বিস্কুট নিয়ে ছুটে জানলার ফোকর দিয়ে বাইরের কৃষ্ণচূড়া গাছ বেয়ে মুহূর্তে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

ছন্দা গ্রামের মেয়ে। কাঠবেড়ালী সে অনেক দেখেছে। কিন্তু তারা যে মাছ তরকারী আপেল বিস্কুট খায় তা তার জানা ছিলনা। সে জানতো কাঠবেড়ালীরা ধান চাল কলাই এসব খায়।

ছন্দা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল কাল দুপুরে আর ঘুম নয়। কাঠবেড়ালী.ক সে দেখে নেবে। বিকেল হতে না হতেই বাজারে গিয়ে সে কাঠবেড়ালী মারার যাঁতাকল কিনে নিয়ে এল। বাড়ি ফিরতেই কাজের মেয়েটা বারান্দায় রাখা টব-গুলো দেখিয়ে বলল—বৌদি আপনার লাগানো লতানো ফুল গাছটার কি হাল দেখেছেন!

ছন্দা তাকিয়ে দেখে কি সুন্দর লবঙ্গলতিকা গাছটা একে-বারে ন্যাড়া! দেখেই রাগে দুঃখে ছন্দার চোখ ছলছল করে ওঠলো। সমস্ত রাগটাই গিয়ে পড়ল কাঠবেড়ালী দু'টোর ওপর। এও নির্ঘাৎ ওদেরই কাজ।

পরের দিন দুপুরে আর কোন কথা নেই। যাঁতা-কলের মধ্যে দু'টো বিস্কুট পুরে রান্নাঘরের টেবিলে কলটা পেতে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে রইল ছন্দা। যা ভাবা তাই কাজ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ধুন্ধুমার কাণ্ড। হুটো-পাটি আর চি-চ্চিড় চি-চ্চিড় চিড়িং চিড়িং শব্দ। ছন্দা ছুটে গিয়ে দেখে একটা কাঠবেড়ালীর পা আটকে গেছে যাঁতাকলের মধ্যে। সঙ্গী কাঠবেড়ালীটা তার চারপাশে অসহায়

ভাবে ঘুর ঘুর করছে। কান্না শুনে দু'টো ছোট্ট কাঠবেড়ালী জানলার কাছে মুখ বাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে আর ওরাও কচি গলায় চি-চ্চিড় চি-চ্চিড় শব্দ করছে। ছন্দা তাদের ভাষা বুঝেনা কিন্তু এই করুণ দৃশ্য দেখে সে আর স্থির থাকতে পারল না। ছুটে গিয়ে যাঁতাকলটা চেপে ধরতেই কাঠবেড়ালীটা ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে উর্দ্ধশ্বাসে জানলা গলে ছুটে গেল। বাচ্চা দু'টো এবং তার সঙ্গীটাও পেছন পেছন দৌড়লো। ছন্দার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

ক'দিন ধরে ছন্দা লক্ষ্য করছিল কাঠবেড়ালী দু'টো আর আসেনা। রান্নাঘর থেকে আর কিছু চুরিও যায়না। ছন্দা কৃষ্ণচূড়ার গাছটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। একদিন দেখতে পেল বড় কাঠবেড়ালীটা তার বাচ্চা দু'টোকে নিয়ে কৃষ্ণচূড়ার সবুজ পাতার আড়ালে লুকোচুরি খেলছে। কিন্তু তারা রান্নাঘরে কেউ আর ভুলেও পা দেয়না। ছন্দা সামনের বারান্দায় একমুঠো গম ছড়িয়ে দিয়ে লক্ষ্য করলো কাঠবেড়ালী-গুলো আসে কিনা! না, কেউ এলো না। পর দিনও একই রকম ভাবে গম ছড়িয়ে দিয়ে ছন্দা দূর থেকে লক্ষ্য রাখলো। সেদিন ধীর পা ফেলে ফেলে ওরা এলো চারজনে মিলে। সতর্ক দৃষ্টি রেখে পেছন পায়ে ভর দিয়ে দু'হাত তুলে কুট-কুট করে গমগুলো খেয়ে নিয়ে লেজ উঁচিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

এদের দেখে ছন্দার বুক থেকে একটা পাষাণ ভার নেমে গেল। তার ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল সেদিন মা কাঠবেড়ালীটা যদি মারা যেত তা হলে তার মা হারা বাচ্চা দু'টোর কি কষ্টই না হতো! ঠিক তক্ষুণি ছন্দার নিজের দুই শিশুর কথা মনে পড়ে যেতেই তার বুকটা কেমন যেন টনটন করে উঠলো। □

নতুন বই

বাংলাদেশের মধ্যযুগের সমাজ যখন দৈবীমহিমার যূপ-কাষ্ঠে মানব-মহিমার সমস্ত মূল্যবোধকে বলি দিয়ে, মনুষ্যত্ব বিকাশের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে নানা ধর্মীয় কুসংস্কারের সঙ্কীর্ণ জালে আবদ্ধ এক কূপমণ্ডুকের মত অবহেলিত ও সার্বিকভাবে অবক্ষয়িত জীবন যাপন করে চলেছিল, তখন মানুষকে তার সমাজ সংসারের প্রেক্ষাপটে মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে যথার্থ মর্যাদা সহকারে প্রতিষ্ঠা দিতে যে দুজন ঐতিহাসিক পুরুষ সে কালের সম্পূর্ণ বিরোধী 'মানব আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন তাঁদের একজন হলেন শ্রীচৈতন্যদেব, আর অপরজন সংগ্রামী মানবজীবনের কথাকার এবং নিজেও দুরন্ত জীবন সংগ্রামে বিজয়ী কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। চৈতন্যদেব তাঁর রাগমার্গীয় ভক্তিসাধনার জোয়ারে বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান ও নানা কুসংস্কার জর্জরিত অন্ধ ধর্মীয় শৃঙ্খলের মোচন ঘটিয়ে জ্ঞানশূন্য মানুষকে মানুষের মানমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার যে পথ চিনিয়ে দিলেন, আদ্বিজচণ্ডালে আলিঙ্গন করে যে মানবপ্রেমের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন, কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীকাব্য অবলম্বনে সেই মানবমর্যাদার আরো উজ্জ্বল আরো বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটালেন। মনুষ্যত্বের মর্যাদা সম্প্রসারণে এই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালনের জন্য শ্রীচৈতন্যদেবের সঙ্গে কবি মুকুন্দরামকেও বাংলাদেশের সমগ্র মধ্যযুগের প্রাণপুরুষ আখ্যায় ভূষিত করা চলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্তির সুবাদে মুকুন্দরাম ও তাঁর কাব্য নিয়ে সমালোচনা গ্রন্থের প্রকাশ অদ্যাবধি খুব একটা কম হয়নি। কিন্তু কবির জন্মভিটা দামুন্যার 'কবিকঙ্কন মেলা'য় প্রকাশিত প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'মুকুন্দরাম স্মৃতিমালা' গ্রন্থটি আর পাঁচটি গ্রন্থের মত কবির জীবন পর্যালোচনা ও

তাঁর কাব্যের কাহিনী-চরিত্র-সমাজ প্রভৃতি সম্পর্কে গতানুগতিক আলোচনার গ্রন্থ নয়। বরং বলা যায়—মুকুন্দরাম সম্পর্কে যারা গভীরতর কিছু জানতে চান কিংবা নূতনতর কিছু গবেষণা করতে চান—বইটি তাঁদের কাছে একান্ত সমাদর ও সংগ্রহ-যোগ্য। শ্রীমুখোপাধ্যায় একজন স্বেচ্ছাব্রতী নিষ্ঠাবান মুকুন্দ-গবেষক—দীর্ঘকাল ধরে তিনি এ সাধনায় রত থেকে ইতিমধ্যেই 'চণ্ডীমঙ্গল রহস্য' ও 'কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম ও চণ্ডীমঙ্গলের ইতিবৃত্ত' নামক দুখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। সুতরাং মুকুন্দরাম সম্পর্কে ইতিমধ্যেই তিনি যথেষ্ট বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বর্তমান গ্রন্থটিতে লেখক আয়াসসাধ্য বহু ক্ষেত্রানুসন্ধান করে মুকুন্দরাম ও তাঁর কাব্য সম্পর্কে বহুজনের নানা ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের নিরসন ঘটিয়েছেন এবং নির্মোহ নিরপেক্ষ গবেষকের ভূমিকা নিয়ে কবির ও তাঁর কাব্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে যথার্থ সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হয়েছেন। কবির বংশ-লতিকা, কবির জীবনপঞ্জিকায় বর্ণিত ঘটনাবলীর যথার্থ স্থান কাল, গ্রন্থ রচনায় কাল, দামুন্যায় রক্ষিত পুথির মৌলিকত্ব, কাব্যকাহিনীর যথার্থ স্থান-পরিবেশ ইত্যাদি সম্পর্কে লেখক দামুন্যা ও তাঁর পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন অঞ্চলে, কাব্যে বর্ণিত কাল-কেতুর জন্মস্থান গোলাহাট, তাঁর নূতন বসতি গুজরাট ও তার পার্শ্ববর্তী রাজ্য কলিঙ্গ (এই তিনটি অঞ্চলই মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার বড়ঞা থানার অন্তর্গত জনপদ) প্রভৃতি অঞ্চলে বারংবার নানা তথ্যানুসন্ধান, চণ্ডীকাব্যের বিভিন্ন সংস্করণ ও পুথি বিশ্লেষণ, দলিলপত্রাদি বিচার, কবির উত্তরপুরুষ ও অন্যান্য নানাজনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে কবি ও তাঁর কাব্য সম্বন্ধে নানা মতভেদের অবসান ঘটিয়ে গ্রন্থকার প্রকৃত সত্যের উদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথিতযশা সমালোচক ও সাহিত্য ইতিহাসবিদদের

অভিমতকেও ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করেছে। কিন্তু লেখকের সে সিদ্ধান্ত গড়ে উঠেছে মূলতঃ সত্য, যুক্তি নিষ্ঠতা ও যথাযথ ক্ষেত্রানুসন্ধানের বলিষ্ঠ পথে। ফলে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি কবি-কঙ্কন ও তাঁর কাব্য সম্বন্ধে আমাদের নতুনভাবে ভাবতে প্ররোচিত করে।

সমগ্র গ্রন্থ জুড়ে লেখকের যুক্তিধর্মী আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে মধ্যযুগের বাংলার সমাজে কবিকঙ্কনের যে দুর্লভ ও প্রকৃত গৌরব—সেই মানবধর্ম সাধনার ও জীবনরস রসিকতার স্বরূপটিকেও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখা যায়। মুকুন্দরাম ও বৈষ্ণবধর্ম পরিচ্ছেদে শ্রীমুখোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন :

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে এতখানি শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন যে, মানবধর্ম-প্রচারক শ্রীরাম অপেক্ষাও শ্রীচৈতন্যকে অধিকতর গুরুত্ব দিতেন। এমনকি মানব মুক্তির অগ্রদূত ঈশ্বর প্রেরিত অবতার হিসাবে চৈতন্যদেবকে দেবীচণ্ডী অপেক্ষাও বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন।"

১৫টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত সমগ্র গ্রন্থটিতে লেখকের যে উদ্যম নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে, তা প্রশংসার যোগ্য। প্রাঞ্জল ভাষা এ গ্রন্থের আর এক বড় সম্পদ। গ্রন্থের মুদ্রণ, অলঙ্করণও শোভন। বিদগ্ধ মহলে এ গ্রন্থটি সমাদৃত হোক কামনা করি।

মুকুন্দরাম স্মৃতিমাল্য ঃ প্রভাত মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—চতুর্মুখ প্রকাশন, ২৩/১, কলেজ রো, কলকাতা-৭০০০০৯, মূল্য—৩৫'০০ টাকা।

—দিলীপকুমার দত্ত

নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর থেকে সাহিত্যের সংসারে যে নবজাতকের আবির্ভাব ঘটেছে তার নাম 'পথিকৃৎ'। আর এই "পথিকৃৎ" এর কর্ণধার দিবাকর শুকুল। সম্পাদকীয় নিবন্ধে শ্রীশুকুল সবিনয়ে বলেছেন 'পথিকৃৎ এর পঞ্চ প্রদীপের আলো থেকে একজন পাঠকও যদি জীবন গঠনের উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন তো তাঁর শ্রম সফল।

পত্রিকার প্রথম প্রবন্ধটিই সম্পাদক মশাইর। —"সুর-সাধক রবীন্দ্রনাথ"। তথ্য বহুল সুখপাঠ্য রচনা। ত্রুটি যা তা হল স্থানে স্থানে বানানের ভুল। এরকম মুদ্রণ প্রমাদ অবশ্য গোটা বইয়ের অধিকাংশ পাতাতেই অল্প বিস্তর রয়েছে। কয়েকটি ধারাবাহিক রচনা রয়েছে। কবিতাও ছাপা হয়েছে। জয়া মিত্রর কবিতাটি পত্রিকার মান বাড়াতে সাহায্য করেছে। তবে কবিতাটির নীচে সম্পাদকের মন্তব্যের মধ্যে যে বড় ত্রুটিটি লক্ষ্য করা গেল তা হল জয়া মিত্রর কাব্যগ্রন্থ বলে "ন হন্যতে"র উল্লেখ। আসলে তা হওয়া উচিত হ্যনমান। সম্পাদকের এরকম আর একটি মন্তব্য রয়েছে সুশান্ত দাসের প্রবন্ধের নীচে। নিজের কাগজের লেখক সম্পর্কে সম্পাদকের এ ধরনের মন্তব্য দৃষ্টিকটু।

একটা নতুন পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতেই পারে। তা' শুধরে নেবার অবকাশ রইল আগামীতে। ত্রুটিগুলো যেমনি আমাদের চোখে পড়েছে তেমনি আবার চোখে পড়েছে প্রথম প্রকাশেই এর বলিষ্ঠ মনোভাবের দিকটাও। সৃজনে মননে অনেক লেখাই প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। আমরা পত্রিকাটির দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

পথিকৃৎ ঃ সম্পাদক—দিবাকর শুকুল, খোট্টাপাড়া, কৃষ্ণনগর

আর একটি নতুন ত্রৈমাসিকের আবির্ভাব ঘটেছে নদীয়া-রই ফুলিয়া থেকে। এর নাম—"আনন্দধারা"। আনন্দ ধারাতেও মুদ্রণ প্রমাদ দৃষ্টিকটু। আগামী সংখ্যা ত্রুটিমুক্ত দেখতে চাই।

আনন্দধারা ঃ সম্পাদক—পার্থ জোয়ারদার, ফুলিয়া, নদীয়া।

সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "সময়"। মোট ৫০টি কবিতা সংকলিত হয়েছে ছোট্ট ৪০ পৃষ্ঠার বইটিতে। সব কবিতা সমান মানের হয়নি। কবির শেষদিকের কবিতা-গুলো, প্রথম দিকে নির্বাচিত ছাপা কবিতা থেকে অনেকটাই পরিণত মনে হয়েছে। ভাল লেগেছে কবির 'ভাল নেই' কবিতাটি। এছাড়াও 'বিশ্বতপা', 'দেওদার বন', 'নাভি পদ্মের ব্রহ্মা' প্রভৃতি কবিতাগুলো মনকে টানে।

শুধু শব্দের জাল বোনা নয় কবিতায় চাই ছন্দের সুর-ধ্বনিও। সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আগামী দিনে প্রত্যাশা রইল।

সময় ঃ সন্ধ্যা চট্টোপাধ্যায়, লালপুর, চাকদহ, নদীয়া।

—মাঃ ভঃ

টুকরো খবর

কবিতা উৎসব ও লোকসংস্কৃতি মেলা

গত ৭ জুলাই '৯১ উত্তর ২৪ পরগণা জেলার পাঁচপোতা গ্রামে 'বাল্মীকি', 'প্রিয় মেঘদূত' পত্রিকা ও গোপালপুর ফিসারমেন্স কোঃ সোসাইটির উদ্যোক্তারা কবিতা উৎসব ও লোক সংস্কৃতি মেলার আয়োজন করেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে তাঁরা একটি ছোট্ট স্মরণিকা প্রকাশ করেন। স্মরণিকায় অনেক কবির কবিতা স্থান পেয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিনয় মজুমদার, বীথিকা বিশ্বাস, নারায়ণ বসু, মৃণালকান্তি বিশ্বাস ও গণেশ ঘোষের কবিতা।

মাজদিয়ায় গ্রামীণ সাহিত্য সম্মিলন

গত ৭-৮ সেপ্টেম্বর '৯১নদীয়া জেলার মাজদিয়ায় মাজদিয়া হাইস্কুল প্রাঙ্গণে গ্রামীণ সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চদশ বার্ষিক

অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা বোলপুর-মির্জাপুরের গ্রামীণ সাহিত্য সম্মিলন সংস্থা এবং আহ্বায়ক নদীয়া জেলার "কৃষি সাহিত্য পত্রিকা"। সাহিত্যের মেল বন্ধনই গ্রামীণ সাহিত্য সম্মিলনের মূল লক্ষ্য। জেলায় জেলায় বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠান করে তারা এই যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

গত ৭ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সাহিত্যিক পান্নালাল দাশগুপ্ত। উদ্বোধনী ভাষণ দেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সাহিত্যপ্রাণ ডাঃ বাসুদেব মণ্ডল। গ্রামীণ সাহিত্য সম্মিলনের উদ্দেশ্য তাদের ভাবনা চিন্তা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এসব বিস্তৃত ভাবে বলেন সম্মিলনের সহযোগী সম্পাদিকা সন্ধ্যা ঘোষ। কৃষি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক স্বপন ভৌমিক সকলকে আহ্বান জানিয়ে, বক্তব্য রাখেন। ভাষণ দেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক নারায়ণ চন্দ্র বসু ও স্থানীয় বিধায়ক। অনুষ্ঠানে জেলার বহু কবি সাহিত্যিক গবেষক সম্পাদক যেমন উপস্থিত ছিলেন উপস্থিত ছিলেন সুদূর জলপাইগুড়ি, দার্জিলিঙের নকশালবাড়ী থেকে আসা বেশকিছু কবি লেখকও।

প্রথম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে "জাতীয় সংহতি ও লেখকদের দায়বদ্ধতা" শীর্ষক আলোচনায় ভাষণ দেন ডাঃ যাদব চন্দ্র দাস, বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে রামচন্দ্র ধাড়া। "সাক্ষরতা ও সমাজ পরিবর্তন", "সংস্কৃত চর্চায় নদীয়া" "নদীয়া জেলার পত্র পত্রিকা", "নদীয়ার সাম্প্রতিক কালের লেখক ও লেখালেখি" প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে মোহিত রায়, ডঃ হংস নারায়ণ ভট্টাচার্য, সাংবাদিক নির্মল দত্ত ও মাধব ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানে গ্রামীণ সাহিত্য সম্মিলনের পক্ষ থেকে মানপত্র

দিয়ে ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যকে "রবি অর্ঘ্য" সম্মাননা প্রদান করা হয়। পল্লীবান্ধব সম্মাননা জানানো হয় বোলপুর নিবাসী কবি সুজিৎ কুমার রায়কে। আদর্শ পত্রিকা সম্পাদনার সম্মান পত্র দেওয়া হয় নদীয়া জেলার ফুলিয়া থেকে প্রকাশিত 'সাহিত্য সৈকত' পত্রিকার সম্পাদক মাধব ভট্টাচার্য এবং বীরভূমের 'রাণার' পত্রিকার সম্পাদক বিজয় কুমার দাসকে। শিল্পী—সমাজবন্ধু সম্মাননা দেওয়া হয় উত্তর ২৪ পরগণার শিল্পী জগদীশ ঘোষকে।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে গ্রামীণ সাহিত্য সম্মিলনের মুখপত্র "লোকশক্তি"র "নদীয়া" বিষয়ক একটি সংখ্যা প্রকাশ পায়। পত্রপত্রিকা প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং দ্বিতীয় দিনে জেলা এবং জেলার বাইরের কবি সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে কবিতা পাঠের আসর বেশ জমে ওঠে।

টানাপোড়েনের আড্ডা

গত ৩১/৮/৯১ সন্ধ্যে থেকে রাত দুপুর অবধি ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন শিল্প সমবায় সমিতির ঘরে টানাপোড়েনের (তন্তুবায় মুখপত্র) কবিতা পাঠের আসর বসে।

স্থানীয় অনেক লেখক কবির সঙ্গে আসরে উপস্থিত ছিলেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, অভী সেনগুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, শেখর বসু, শিল্পী প্রকাশ কর্মকার, স্বপন রায়, দিলীপ রায় প্রমুখ।

কবি মিলন উৎসব

গত ৪-৫ সেপ্টেম্বর '৯১ নদীয়া জেলার রাণাঘাটে, রাণাঘাট মহকুমা শাসকের বাংলোয় কবি নবীনচন্দ্র সেন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৯৭তম মিলন উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

মূল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন নদীয়ার জেলা শাসক। স্থানীয় এবং বহিরাগত বহু বিশিষ্ট সজ্জন ও বুদ্ধিজীবি সমাবেশে অনুষ্ঠান অত্যন্ত প্রাণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় দিনের প্রভাতী অনুষ্ঠান ছিল মূলতঃ কবি সম্মেলন। কবি সম্মেলনে কলকাতা সহ জেলার খ্যাত অখ্যাত বহু কবি এবং জেলার বাইরে সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকেও বেশ ক'জন কবি উপস্থিত ছিলেন।

তপশিলী আদিবাসী পরিষদ

গত ১৪ই জুলাই ১৯৯১ ঘূর্ণী পুতুলপট্টী দাসপাড়া প্রাইমারী বিদ্যালয়ে তপশিলী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় ২০০০ মানুষের একটি সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ সহ পৌরকমিশনারগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় তপশিলী ও আদিবাসী মানুষের শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সুধীর রঞ্জন দাস, তারাচাঁদ টুডু, জেলা সভাপতি রেবতীভূষণ অধিকারী এবং জেলা কল্যাণ পরিষদ সম্পাদক নবকুমার বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে বাবা সাহেব আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়।

সভায় সর্ব সম্মতি ক্রমে সংস্থার স্থায়ী কমিটি গঠন হয়।

সাংসদ ডঃ অসীম বালার আর্জি

সাংসদ ডঃ অসীম বালা সম্প্রতি কেন্দ্রীয় জল সম্পদ মন্ত্রী ভি, সি, শুক্লার কাছে নদীয়া জেলা সম্পর্কে বক্তব্যে জানান যে ডি. ভি. সির ভুল পরিকল্পনার জন্য জেলা সেচ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ। অবিলম্বে অন্যান্য রাজ্যের মত নদীয়া জেলার সেচ

ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করে একটি সমীক্ষক দলের গঙ্গা নদীর জলসম্পদ সরেজমিনে নিরীক্ষা করতে আসা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী সি, কে, জাফর শরিফের কাছে অনুরোধ করেন যে পূর্বরেলের অন্তর্গত শান্তিপুর নবদ্বীপ ছোট রেল লাইনকে বড় আকারে রূপান্তরিত করে ব্রড গেজে রূপ দিলে অর্থকরী লাভ সহ জনসাধারণের যাতায়াত ও মাল পরিবহন সমস্যার সুরাহা হবে। এছাড়া তিনি আরও দাবী করেন যে, (১) বর্ধমান-কাটোয়া ন্যারো গেজ লাইন (২) বারাসাত-হাসনাবাদ ব্রড গেজ লাইন (৩) বারুইপুর লক্ষ্মীকান্তপুর ব্রড গেজ লাইন (৪) সোনারপুর-ক্যানিং লাইনগুলির যথার্থ গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিয়মিত ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে।

সাংসদ ডঃ বালা এবিষয়ে রেল উন্নয়ন উপদেষ্টা ভি, ডি, চাড্ডা এবং রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান আর, ডি, কীটসনকে রাণাঘাট-গেদে এবং রাণাঘাট-বনগাঁ লাইনকে অবিলম্বে বৈদ্যুতিকরণ করার অনুরোধও করেন।

ফুলিয়ায় প্রফেশন্যাল কোচিং

গত ৭ এপ্রিল ১৯৯১ ফুলিয়া উপনগরীতে (হাউস নং ২৯/এন) ১৭ জন ছাত্র নিয়ে চাকুরী বিষয়ক বিভিন্ন পরীক্ষার যে কোচিং সেন্টার—**"ইনষ্টিটিউট ফর প্রফেশন্যাল কোচিং"** শুরু হয়েছিল তার প্রথম বেচের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। এদের মধ্যে দু'জন ইতিমধ্যেই WBCS এবং PSC পরীক্ষায় প্রাথমিকভাবে উত্তীর্ণ হয়েছে বলে ইনিষ্টিটিউশনের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন। ইনিষ্টিটিউশনে পি,এস,সি, ব্যাঙ্ক, রেল, এস,এস,সি পরীক্ষার সম্যক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। ৬ মাসের কোর্স এর মোট ফিস সাতশ' টাকা। এককালীন ছশ' টাকা

প্রতি শনিবার বিকেল ও রবিবার সকালে ক্লাশ হয়ে থাকে। অক্টোবর '৯১ থেকে নতুন বেচের শিক্ষাক্রম চালু হচ্ছে বলেও মুখপাত্রটি জানিয়েছেন।

প্রতিবন্ধীদের পরিচয়পত্র

রাজ্য সরকারের ত্রাণ ও কল্যাণ বিভাগের কল্যাণ শাখা গত ১৯৮৯-৯০ সাল থেকে প্রতিবন্ধীদের পরিচয়পত্র প্রদানের কর্মসূচী চালু করেছেন। সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পেতে হ'লে প্রতিটি প্রতিবন্ধীর সর্বাগ্রে এই পরিচয়পত্র সংগ্রহ করা দরকার। বৃহত্তর কলকাতার অধিবাসীদের এতদ্দেশ্যে ৪৫নং গণেশচন্দ্র এভেন্যু, কলিকাতা-১ তে অবস্থিত সমাজ কল্যাণ অধিকর্তার দপ্তর এবং জেলাস্তরে নিজ জেলার জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিকের দপ্তরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

কিছু সংখক স্বার্থান্বেষী লোক অর্থের বিনিময়ে প্রতিবন্ধীদের পরিচয়পত্র বিলি করছেন বলেও জানা গেছে। এ জাতীয় পরিচয়পত্র সরকার প্রদত্ত কোন সুযোগ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয় বলে এক সরকারী প্রেস নোটে বলা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী নাগরিকরা পরিচয়পত্র সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগীয় আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

অনুকূল চন্দ্র চক্রবর্তী প্রয়াত

প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী, অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র চক্রবর্তী গত ১০ সেপ্টেম্বর ১১০ বছর বয়সে মারা যান। প্রয়াত অনুকূল চন্দ্র চক্রবর্তীর স্বাধীনতা উত্তর জীবনের একটা দীর্ঘ সময় কাটে ফুলিয়ার সবুজপল্লীতে। □

সম্পাদকীয়

সাক্ষরতা অভিযান

াক্ষরতা অভিযান শুরু হয়েছে। রাজ্য জুড়ে, দেশ
াক্ষরতার বিরুদ্ধে এই অভিযান।

ংখ্যান থেকে জানা যায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গে
সংখ্যা শতকরা ৪২'২৮। গোটা দেশের হিসাব নিলে
াড়াবে ৬০ এর কাছাকাছি। কেরলের মত না হলেও
মেদিনীপুর আর বর্ধমান জেলা দু'টি নাকি সরকারী
অনুযায়ী সম্পূর্ণ সাক্ষর। এটা সুখের কথা।

সুখের মধ্যে বিস্ময়ের কথা হল এই. স্বাধীনতার ৪৪ বছর
দে ঢাক ঢোল বাজিয়ে সাক্ষরতার অভিযান। এটা আমাদের
জ্ঞা। এতদিন বাদে কেন এই অভিযান? এতদিন ধরে
ন এই বঞ্চনা? কেন একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের শিশু অপুষ্টি,
শিক্ষায় ভুগবে-কেনই বা স্বাধীন রাষ্ট্রের একজন শিক্ষিত যুবক
র্মহীন. হয়ে থাকবে? সবকিছু হারানর পর বৃদ্ধকে সখের
পাঠ পড়িয়ে কি লাভ? নিরক্ষরেরও কিছু লাভ হবে না
ক্ষরেরও না। আক্ষরিক অর্থে ঐটুকুই শুধু হবে—যে
শ্লোগান সরকারী মিডিয়ায় সম্প্রচারিত হচ্ছে বারবার—"এসো
পড়াই, কিছু করে দেখাই।"

এটা তো ঠিক এখনও দেশের নিরক্ষর মানুষগুলোর ওপর ভর করেই বেঁচে আছে দেশটা। তাদের বিদ্যা না থাকতে পারে শিক্ষা নেই তা বলি কেমনে! আর একথাও সত্য বিদ্যার চেয়ে শিক্ষা বড়। তা হলে বড়াইটা কিসের? এর অর্থ এই নয় যে নিরক্ষর মানুষরা নিরক্ষরই থাকুক। বলার হল—তাদের কথা যদি আমরা ভাবতে চাই তা হলে একটু দরদ দিয়ে ভাবা উচিত। নিজেদের করে দেখানোর প্রচেষ্টায় ওদের লাভ কিছু হবে বলে মনে হয়না। ওদের চৈতন্যকে জাগাতে হলে যে শিক্ষাটা দরকার, দেশের সার্বিক স্বার্থে তাই করা উচিত।□

SAHITYA SAIKAT
Ashwin 1398/15th Sept. 1991 Rs. 2·00
Regd. No. 42112/81 R.N.I.

কৃত্তিবাসের ফুলিয়া জানে সর্বজ
টাঙ্গাইল শাড়ী তার গরবের

পুজোর কেনাকাটায়
আর দেরী করবেন না
চলে আসুন
আমাদের সমবায় সদনে

● ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন শিল্প সমবায় সমিতি লিঃ

● টাঙ্গাইল তন্তুজীবী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

●

ঠিকানা : সমবায় সদন, ফুলিয়া, নদীয়া।
দূরভাষ ঃ ফুলিয়া ২২

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য ● প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য
সার্কুলেশন ম্যানেজার : গণেশ রায়
● রেজিষ্টার্ড অফিস ও প্রকাশ স্থান :
সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া। ৭৪১৪০২
মুদ্রণ : মায়া প্রেস, কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা (উঃ)
সদর কার্যালয় : ১২৪/১ এস, এন, ব্যানার্জী রোড, ব্যারকপুর
উত্তর ২৪ পরগণা।